নবীনচন্দ্র সাহিত্য ও সাধনা

ড. শান্তি চট্টোপাধ্যায়

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা-৯ ॥ কলিকাতা-২৯

NABIN CHANDRA : SAHITYA 0 SADHANA

By SANTI CHATTERJI, M. A. Ph. D.

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭ ফাল্গুন

প্রকাশক

শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড

জিজ্ঞাসা

১এ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

মুদ্রাকর

সাধনা সিংহ রায়

কালী প্রেস

৬৭ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মাকে

কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক।

—নবীনচন্দ্র

বিষয়ক্রম

পরিচায়িকা

বহু বৎসর পূর্বে শ্রীমতী শান্তি চট্টোপাধ্যায় যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম. এ. উপাধি নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন তখনই তাঁর শান্ত প্রকৃতি এবং বুদ্ধিদীপ্ত ঋজুভাষিতায় তাঁর প্রতি আমার সস্নেহ মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। তারপরে যতদিন তিনি এখানে তাঁর গবেষণা কার্যে নিরত ছিলেন তত দিনই দেখেছি তাঁর শান্ত আচরণসৌন্দর্যে, প্রসন্ন আলাপ-আলোচনায় এবং সাগ্রহ কর্তব্যনিষ্ঠায় কখনও কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। ফলে তাঁর এই চারিত্রিক মাধুর্য আমাদের স্নেহসম্পর্ককে ক্রমে নিবিড়তরই করেছে। তারপরে দীর্ঘকালের ব্যবধানেও সে স্নেহসম্পর্কে কিছুমাত্র ক্ষীণতা দেখা দেয়নি। কিন্তু শুধু এই স্নেহের আকর্ষণেই আমি তাঁর এই বইটির পরিচায়িকা লিখতে প্রণোদিত হইনি। প্রণোদিত হয়েছি এই স্বল্পায়তন গ্রন্থে তাঁর বিশিষ্ট মনন-প্রকৃতির যে প্রতিফলন ঘটেছে তারই আকর্ষণে। তিনি যখন গবেষণা-ছাত্রী হিসাবে এখানে এসেছিলেন তখনই লক্ষ করেছিলাম আসলে তাঁর জন্মলব্ধ মনন-প্রকৃতিই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর স্বভাবমাধুর্যে ও আচরণ বৈশিষ্ট্যে। তাঁর এই মনন-প্রকৃতি প্রত্যক্ষভাবে লক্ষিত হয় তাঁর রচনায়। প্রথমাবধি তাঁর সংযত বিচারপরায়ণতা, বুদ্ধি-সমুজ্জ্বল প্রকাশভঙ্গি, তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠতা এবং সর্বোপরি স্বাধীন চিন্তন-ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে আমি তাঁর সম্বন্ধে বিশেষভাবে আশান্বিত হই। কালক্রমে তাঁর শ্রমনিষ্ঠা ও সন্ধিৎসাবৃত্তিরও পরিচয় পাওয়া গেল। দেখা গেল বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে তাঁর গবেষণার সব উপাদান না মেলাতে তিনি বার বার কলকাতায় সাহিত্য পরিষদ-গ্রন্থাগার ও জাতীয় মহাগ্রন্থালয় থেকে তাঁর অভীষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন। অবশেষে তাঁর গবেষণার কাজ শেষ হবার পরে তাঁর স্বচ্ছ ও সংযত ভাষার সৌন্দর্য, মনোভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য এবং তথ্য ও যুক্তির ব্যূহবিন্যাস-প্রণালীর বিশিষ্টতা দেখে আমি বিশেষ তৃপ্তি লাভ করি। তাঁর গবেষণাগ্রন্থের অপর দুজন পরীক্ষক ছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রের দুই মহারথী, স্বনামখ্যাত প্রমথনাথ বিশী ও রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। তাঁরাও এই অনতিবৃহৎ মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থটি সম্পর্কে সপ্রশংস অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। মনে

আছে মৌখিক পরীক্ষায় প্রমথবাবু প্রশ্ন করেছিলেন, নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোনটি? শ্রীমতী শান্তি বিনা দ্বিধায় উত্তর দিলেন—'আমার জীবন'; ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠতার কথা বাদ দিলে শুধু ভাষার সরসতায় ও রচনা-সৌন্দর্যের বিচারে 'আমার জীবন'-এর সমকক্ষ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে বিরল। তাঁর এই উত্তরে প্রমথনাথ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই গ্রন্থরচনার আশু উদ্দেশ্য বিশ্বভারতীর পিএইচ. ডি. উপাধি এবং পরীক্ষকদের অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ সত্ত্বেও লেখিকা এই গ্রন্থের আশু প্রকাশে উৎসাহী হলেন না। তাঁর গ্রন্থের দুর্বলতা ও অপূর্ণতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। ফলে তিনি তাঁর গ্রন্থের পরিমার্জনায় এবং ত্রুটিমোচনেই (তা সে যত সামান্যই হক) যত্নপর হলেন। গ্রন্থ-প্রকাশে তাঁর এই ত্বরাহীনতায় আমি বিস্মিত হইনি। তাতেই তাঁর প্রকৃতিগত স্থৈর্য ও আদর্শনিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়েছে। যে গ্রন্থ লিখে লেখক নিজে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হতে পারেন নি, সাহিত্যজগতে তা প্রকাশের অধিকার তাঁর নেই। অবশেষে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হল। আমার বিশ্বাস এই ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থখানি সাহিত্য-বিচারকদের দৃষ্টিতে উপেক্ষণীয় বলে গণ্য হবে না। কিন্তু লেখিকা নিজে এখনও অবিমিশ্র তৃপ্তিলাভ করতে পারেননি। এখনও তিনি তাঁর গ্রন্থের পুনঃপরিমার্জনায় এবং কোনো কোনো বিষয়ে ত্রুটির পূর্ণতাসাধনে ও উন্নতি-বিধানে আগ্রহী। তাঁর এই অতৃপ্তি অক্ষয় হক, এই কামনা করি। কেননা, নিত্য তৃপ্তিহীনতা এবং আরো-ভালোর ক্ষুধা যথার্থ সাহিত্যসেবকের চিরসঙ্গী।

আমার দীর্ঘ অধ্যাপক-জীবনে যে কয়জন একনিষ্ঠ গবেষক ছাত্র-ছাত্রীর সান্নিধ্যে এসেছি তাঁদের প্রথম সারিতেই শ্রীমতী শান্তির স্থান। ছাত্রের কৃতিত্বেই শিক্ষকের গৌরব। আশীর্বাদ করি তাঁর কৃতিত্বে আমার এই গৌরব ভাবীকালে যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

'রুচিরা'
শান্তিনিকেতন

প্রবোধচন্দ্র সেন

নিবেদন

নবীনচন্দ্র সেন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাসাহিত্যের খ্যাতনামা কবিদের অন্যতম ; রঙ্গলাল-মধুসূদনের ঐতিহ্য-অনুসারী মহাকবিরূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সে যুগের সমালোচক-সম্প্রদায় অনেক সময় নবীনচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। নবসংস্কৃত হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতা, 'ত্রয়ী' কাব্যের রচয়িতা নবীনচন্দ্র সেদিন সমগ্র জাতির চিত্তে একটি শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। নবীনচন্দ্রের গুণগ্রাহী সমালোচকরা জাতীয়জাগরণে নবীনচন্দ্রের দানের কথা স্মরণ করে যে সমালোচনা তাঁর কাব্যের করেছিলেন, তাতে অতিভাষণের অভাব ছিল না। সে যুগের পাঠকসমাজ কাব্যগুণের উৎকর্ষ বিচার করেই সব সময় কাব্যের মূল্যায়ন করতেন না। কাব্য জাতির সামাজিক, আধ্যাত্মিক উন্নয়নে কি পরিমাণ সহায়তা করেছে, সে কথা স্মরণ করেই তার নিন্দা বা প্রশংসা করেছেন।

এ যুগে আমাদের সাহিত্যাদর্শ পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান যুগের সাহিত্যরসিক রসোত্তীর্ণতার বিচারে সাহিত্যের মূল্য নির্ণয় করেন। অবশ্য এ বিচারেও সর্বজনগ্রাহ্য কোন পদ্ধতি নেই। অনেক সময়ই কাব্যমূল্য নির্ধারণে যে মান গ্রহণ করা হয়, অতি অল্প কবিই তা প্রদর্শনে সক্ষম হন। এই শ্রেণীর কিছু সমালোচকের মতে নবীনচন্দ্রের কাব্যরচনার প্রয়াস প্রাংশুলভ্য ফলের লোভে উর্ধ্ববাহু বামনের মত হাস্যকর না হলেও, বিপথে পরিচালিত।

আমাদের মনে হয়, কোনো কবির কাব্যবিচারেই অনমনীয়, তাত্ত্বিক বিচারপদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। উৎকৃষ্ট কাব্য 'নবরসরুচিরা' ও নূতনসৃষ্টি হয়ে থাকে। কোন্ সমালোচককে সবযুগের সব সাহিত্যের উপযুক্ত একমাত্র বিচারক বলে মানবো? কোনো সাহিত্যবিচারেরই কোনো বাঁধাধরা রীতিপদ্ধতি থাকতে পারে না। যথার্থ সমালোচক যেমন কাব্যের রসাস্বাদনে এবং গুণগ্রহণে পটুতার পরিচয় দেবেন, তেমনি তার দোষ-ত্রুটি-অসঙ্গতিও তিনি প্রদর্শন করবেন। নবীনচন্দ্রের কাব্য-সমালোচকরা প্রায়শই একদেশদর্শী হয়ে পড়েছেন। একশ্রেণীর সমালোচক যেমন অতিমাত্রায় প্রশংসা করেছেন, তেমনি আর এক শ্রেণীর সমালোচক নিন্দাও করেছেন

মাত্রাতিরিক্তভাবে। নিরপেক্ষ সমালোচনায় এ সিদ্ধান্তই করা যায় যে, নবীনচন্দ্র একজন প্রথমশ্রেণীর কবি না হলেও প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। নবীনচন্দ্রের কাব্য শুধু ব্যাবহারিক মূল্য অথবা আধ্যাত্মিক আদর্শের জন্যেই প্রশংসিত হয় নি। 'অবকাশরঞ্জিনী'র খণ্ড কবিতায়, 'পলাশির যুদ্ধে' 'রঙ্গমতী'তে, 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসে' : এমনকি জীবনী-কাব্য 'অমিতাভ', 'অমৃতাভ'তেও যথার্থ কবিত্বশক্তির স্ফুরণ দেখা যায়। একান্তই তত্ত্বগ্রন্থ বা তথ্যসংগ্রহরূপে নয়, কাব্যরূপেও এগুলি উপভোগ্য সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। তবে, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রতিভায় তারতম্য আছে। প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠার বিচারে নবীনচন্দ্র তাঁদের সমকক্ষ না হলেও, তিনি যথার্থ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন, তাতে সন্দেহ করা চলে না।

স্ব-কালে নবীনচন্দ্র 'মহাকবি'রূপে খ্যাতিমান ছিলেন, অথচ পরবর্তীকালে তিনি প্রায় সর্বজনবিস্মৃত একজন সাধারণ কবিযশঃপ্রার্থী মানুষরূপে চিহ্নিত হলেন। এ বিচারে কোথাও অসঙ্গতি আছে। নবীনচন্দ্র ও নবীন-সাহিত্যের পুনর্মূল্যায়ন ও পূর্ণমূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল পূর্বে গবেষণায় ব্রতী হয়েছিলাম। পথনির্দেশ করেছিলেন বিশ্বভারতীর তৎকালীন রবীন্দ্র-অধ্যাপক ও বাংলাবিভাগের প্রধান অধ্যাপক, বর্তমানে এমেরিটাস অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। নিষ্প্রয়োজন হলেও বলা কর্তব্য যে, গবেষণায় সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে পিএইচ. ডি. উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন

বহুদিন আগে যে বিষয়ে গবেষণা করেছি, আজ তা গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রয়োজন হল কেন? সে বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে। প্রথম কারণ, তৎকালীন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে মুদ্রিত গ্রন্থ পেশ করার মত যথেষ্ট সময় ছিল না। একটি গ্রন্থ-প্রকাশ কত সময়সাপেক্ষ, তা বর্তমানে উপলব্ধি করছি। দ্বিতীয় কারণ, আমার অভিপ্রায় ছিল, পরবর্তী ও সম-সাময়িক গবেষণা ও সমালোচনার পুনর্বিচার করে গ্রন্থ প্রকাশ করা হবে। তৃতীয় ও প্রধান কারণ হল, এত দীর্ঘকাল অপেক্ষার পরেও দেখা যাচ্ছে, নবীনচন্দ্র সম্পর্কে যথোপযুক্ত আলোচনা এখনও হয় নি। যে নবীনচন্দ্র মধুসূদন-প্রবর্তিত কাব্যধারার উত্তরসাধক, যিনি মহৎ আদর্শের প্রচারক 'মহাকবি', যে নবীনচন্দ্র রচনা করেছেন উৎকৃষ্ট গদ্যসাহিত্য, যে

নবীনচন্দ্র আত্মজীবনীর সাহিত্যমঞ্জুষায় রক্ষা করেছেন সমসাময়িক কালের অজ্ঞাত, বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য, তাঁর সম্বন্ধে আজও বাংলাসাহিত্যের অধিকাংশ সমালোচক বিস্ময়করভাবে উদাসীন। যে গ্রন্থ রচনা করেছিলাম কিছুকাল আগে, আজও তার আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আছে।

নবীনচন্দ্র সম্পর্কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, মহাকবি নবীনচন্দ্র বিশ্বমন্দির এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আগ্রহ দেখিয়েছেন। নবীনচন্দ্রের রচনা-সংগ্রহ পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছেন। এ ছাড়া নবীনচন্দ্র সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়। তিনি নবীনচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করলেও নবীনচন্দ্রের গদ্যগ্রন্থগুলি তদনুপাতে স্বীকৃতি পায় নি। অধ্যাপক শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক যে নবীন-সাহিত্য সমালোচনা করেছেন, তাতে যে কারণেই হোক, নবীনচন্দ্রের সৃষ্ট সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর সহানুভূতির অভাব লক্ষ করা যায়। এ কালের সমালোচকদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীজীবেন্দ্র সিংহ রায় নবীনচন্দ্রের সাহিত্যকৃতির সমালোচনায় নূতন পথ দেখিয়েছেন। নবযুগের ইতিহাসে নবীনচন্দ্রের স্থান নির্ণয়ে তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এ সব গ্রন্থ ও আলোচনাগুলির কথা স্মরণ রেখেই জানাই, আমার নবীন-সাহিত্য বিচারের প্রয়াস ভিন্ন অভিপ্রায়ে, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। নবীনচন্দ্রের গদ্যরচনাগুলিও এ গ্রন্থে প্রাধান্য পেয়েছে। নবীন-সাহিত্য আলোচনা করার সময় আমি অনাবশ্যক প্রসঙ্গ বিস্তারে যথাসম্ভব বিরত থেকেছি। পূর্ববর্তী গবেষক শ্রীসুবোধরঞ্জন রায় যে-সব প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সে সম্পর্কে অপ্রয়োজনে বাগ্‌বিস্তার করে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করি নি।

এই গ্রন্থে আমার আলোচনার লক্ষ্য ও তার পরিধি সম্পর্কে এখানে দু-একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নবযুগের পটভূমিতে নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব। এই বহুপরিজ্ঞাত বিষয়ে আমি যথাসাধ্য বাক্‌সংযমে সচেষ্ট হয়েছি। নবযুগের যে সব ধ্যানধারণা ও কর্মপ্রচেষ্টা নবীনচন্দ্রের মনোজীবনকে স্পর্শ করেছিল, আমার আলোচনাকে শুধু তার সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রাখাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। পরবর্তী অধ্যায়ে জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে কবির কাব্যসাধনা কিভাবে জীবনসাধনায়

পর্যবসিত হয়েছে, তাই দেখাতে চেষ্টিত হয়েছি। যে সব ব্যক্তি ও চরিত্রের সংস্পর্শে এসে নবীনচন্দ্রের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছিল তাঁদের কথাও উপেক্ষিত হয় নি। তারপরে আছে নবীনচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থের আলোচনা। পূর্ববর্তী গবেষক শ্রীসুবোধরঞ্জন রায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর সঙ্গে কোথাও কোথাও আমার যে সামান্য মতভেদ, তার উল্লেখমাত্র করেছি। তবে বলা প্রয়োজন যে, এক্ষেত্রে আমার আলোচনার পদ্ধতিই ভিন্ন রকমের। আশা করি পাঠকরা এই স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা বুঝতে পারবেন। নবীনচন্দ্রের কাব্যের হিন্দী ও ইংরেজি অনুবাদের প্রসঙ্গও এই আলোচনায় উপেক্ষিত হয় নি।

নবীনচন্দ্রের কাব্যজীবনের প্রথম পর্বের মূল প্রেরণা ছিল—নারীপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, স্বদেশপ্রেম। তার পরে এক অধ্যায়ে এ সব প্রেরণার প্রকৃতি ও প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য নিরূপণে চেষ্টিত হয়েছি।

নবীনচন্দ্রের কাব্যের বহিরঙ্গ অর্থাৎ তাঁর ছন্দ, ভাষা ও অলঙ্কার প্রয়োগের বিশদতর আলোচনা এবং প্রয়োজনমত পূর্বাগত মতামতের পুনর্বিচার করতে হয়েছে—একটি স্বতন্ত্র (পঞ্চম) অধ্যায়ে।

কবিরূপে নবীনচন্দ্রের সমধিক পরিচিতি থাকলেও তিনি গদ্যসাহিত্যের একজন সুলেখক ছিলেন—তা আজ পর্যন্ত প্রায় অজ্ঞাতই থেকে গেছে। বস্তুতঃ তাঁর গদ্যভাষা ও রচনাসম্পদের মূল্য তাঁর কাব্যকৃতির তুলনায় বেশি বই কম নয়। নবীন-প্রতিভার এই উজ্জ্বল দিকটাকে যথাযথভাবে পরিস্ফুট করে আধুনিক কালের কাছে উপস্থাপিত করা আমার এই প্রচেষ্টার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। কেননা নবীনচন্দ্রের গদ্যরচনাগুলিকে বাদ দিয়ে তাঁকে শুধুই কাব্যকার হিসাবে দেখলে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়।

সবশেষে, সমকালীন কবি ও সাহিত্যিকদের তুলনায় সামগ্রিকভাবে নবীনচন্দ্রের প্রতিভা ও সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর দানের আপেক্ষিক মূল্যনিরূপণে প্রয়াসী হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরীরূপে বাংলাসাহিত্যে নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব। নবীনচন্দ্রের কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো স্থলে কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। নবীনচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। তবে যুগধর্মের বিচারে তাঁরা ছিলেন সমকালীন।

তাই, উভয়ের চিন্তাধারায় এবং কর্মযোগের প্রবর্তনায় যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। যদিও যুগপ্রতিনিধি কবি হিসাবে বাংলাসাহিত্যে নবীনচন্দ্রের স্থান, তবু তাঁর রচনায় ভাবী কালের ছায়াপাত হয়েছে। উপসংহারে এই দুটি বিষয়ের উপরে যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপণে প্রয়াসী হয়েছি।

গ্রন্থশেষে নবীনচন্দ্রের গ্রন্থভুক্ত ও অগ্রন্থভুক্ত রচনার একটি পূর্ণতর তালিকা দেওয়া গেল। নবীনচন্দ্রের কর্মজীবনের একটি সংক্ষিপ্ত কালক্রম এবং তথ্য নির্দেশিকা গ্রন্থশেষে যুক্ত করা হল। আশা করি তাতে এই গ্রন্থ অনুধাবনের পক্ষে সহায়তা হবে।

প্রথমাবধি এই গ্রন্থের নাম ছিল 'নবীনচন্দ্র : সাহিত্য ও সাধনা'। কিন্তু মুদ্রণকালে অনবধানতা বশতঃ পৃষ্ঠা শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছে—'নবীনচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য'। দীর্ঘকাল এই ভুল সংশোধনের সুযোগ হয় নি। অবশেষে সুযোগ পেয়ে এই গ্রন্থের শেষরক্ষা ও মুখরক্ষা করা গেল। কেননা নবীনচন্দ্রের 'জীবন' এতে আলোচিত হয়েছে ততটুকুই, যতটুকু তাঁর কাব্যসাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয়। বিরাট আত্মজীবনী গ্রন্থের রচয়িতা নবীনচন্দ্রের 'জীবন' আমার আলোচনার বিষয় নয়। এই অনবধানতার ত্রুটি মার্জনীয়।

শ্রদ্ধেয় আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন থেকে, দীর্ঘকাল পরে নির্দেশিকা ও বিষয়ক্রম প্রস্তুত পর্যন্ত এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের প্রত্যেক পর্যায়ে সস্নেহে, ধৈর্যসহকারে যেভাবে আমাকে পরিচালিত করেছেন, তার তুলনা নেই। শরীরের অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে ও তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করে তিনি যেভাবে আমাকে উপদেশ নির্দেশ দিয়েছেন, হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছেন, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। কিন্তু আমি জানি, তিনি কারো কাছেই কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশী নন। তাই তিনি পরম স্নেহবশেই এই সামান্য পুস্তকের একটি পরিচায়িকা লিখে দিতে সাগ্রহে সম্মত হয়েছেন। এ পরিচায়িকার দ্বারা এই গ্রন্থের যে মর্যাদা বৃদ্ধি হল তা আমার আশাতীত। তিনি আমার গুরু, এই আমার একমাত্র গৌরব। শুধু কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর স্নেহের মূল্যহানি ঘটাতে চাই না। তাঁকে প্রণাম নিবেদন করেই ধন্য হলাম। প্রণাম জানাই তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীমতী রুচিরা সেনকে। তাঁরই স্নেহাঞ্চলছায়াতেই এই গবেষণা

ও গ্রন্থপ্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হল। 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশনসংস্থার শ্রীযুক্ত শ্রীশকুমার কুণ্ডের সস্নেহ আনুকূল্যে আমার এই গ্রন্থপ্রকাশ সম্ভব হল। অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্য কতভাবে যে আমাকে সাহায্য করেছেন তার হিসেব নেই। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জনাচ্ছি। শ্রীমতী মুক্তি চক্রবর্তী, শ্রীমান্ শ্যামলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী মীরা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী রুচি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কতজনের কাছে আমার কত ঋণই না অপরিশোধ্য হয়ে থাকল। তাঁরা আমার স্নেহাস্পদ। তাঁদের কল্যাণ কামনা করছি। সবশেষে বলি, যদি এই গ্রন্থের দ্বারা বাংলাসাহিত্যের আলোচক ও পাঠক সমাজে নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু পরিমাণেও নূতন আগ্রহ সঞ্চারিত হয় তা হলেই আমার এই প্রচেষ্টাকে সার্থক মনে করবো।

দুর্গাপুর-৫

শান্তি চট্টোপাধ্যায়

নবীনচন্দ্র : সাহিত্য ও সাধনা

প্রথম অধ্যায়

১. উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ

'আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। এখন আর কেহই ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে, ইনি আর নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইঁহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না, কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।'[১]

নবচেতনা-প্রবুদ্ধ জাতির এই গভীর আত্মবিশ্বাসের বাণী উচ্চারিত হয়েছিল উনবিংশ শতকের শেষ দশকে। যদিও সমগ্র জাতির কর্মে ও চিন্তায় আধুনিকতার প্রকাশ একান্তভাবেই এই শতাব্দীর ঘটনা, তথাপি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে নবযুগের সঞ্চার ঘটেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর এক নির্দিষ্ট দিনে। 'On June 23rd., 1757 the middle age of India ended and her modern age began.'[২]

সামান্য এক রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন, সমগ্র জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার দ্বার অবারিত করেছিল। ইতিহাসে সূচিত হল এক নব অধ্যায়। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর Literature of Bengal গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 'The British conquest of Bengal was not merely a political revolution, but brought in a greater revolution in thought and ideas, in religion and social progress. The Hindu intellect came in contact with all that is noblest and most healthy in European history and literature, and profited by it.'

ইউরোপীয় ইতিহাসের অনুকরণে আমরা মধ্যযুগীয়তা থেকে আধুনিক ভাব ও চিন্তাধারায় এই উত্তরণকেই অভিহিত করি Renaissance বা নবজাগৃতি নামে। পাশ্চাত্ত্য জীবন-সংযোগে ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনই

১. রামনাদ অভিনন্দনের উত্তর, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড: পৃ ৩৮
স্বামী বিবেকানন্দ

২. History of Bengal, Vol. II, (D. U.) P 497 : Sir J. N. Sarker

হল এই নবজাগরণের স্বরূপ। প্রতীচ্য দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য থেকে নব নব প্রাণরস আহরণ করে, ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পের উন্নতি ও নব মূল্যমানকে আয়ত্ত করে আত্মপ্রতিষ্ঠাই হল নবযুগের প্রধান ঘটনা। একদিকে জাতিত্বের চেতনা, অন্যদিকে বিশ্বের সঙ্গে এক সৌহার্দ্যের বন্ধন রচনার প্রয়াসে শিক্ষিত, নাগরিক বাঙালীসমাজের আধুনিকতার স্বীকৃতি।

ইংরেজ শাসনের অন্যতম প্রত্যক্ষ ফল এদেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার। ইংরেজের চরিত্র ও জীবনাদর্শ তার ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এদেশীয় নাগরিকসম্প্রদায়ের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনে একদিকে যেমন তার সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানে অবাধ প্রবেশাধিকারে শিক্ষিত বাঙালীসমাজের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, অন্যদিকে গ্রীক-ল্যাটীন-ফরাসী প্রভৃতি বিদেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সান্নিধ্যে এসে চিন্তা ও ভাবের ক্ষেত্রে নব নব দিগন্তের অনুসন্ধানের ব্যাকুলতা লক্ষ্য করি তদানীন্তন নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে। তারই ফলে ধূলিসাৎ হয়ে পড়েছে সেই বিভেদের প্রাচীর, যা তাকে এতদিন বিশাল বিশ্ব থেকে পৃথক করে রেখেছিল। পৃথিবীর সকল মানুষের মাঝখানে বাঙালী আপনাকে অবিষ্কার করেছে— একই সম্পদ ও সম্মানের অধিকারীরূপে। আপন সীমাবদ্ধ গৃহাঙ্গনে নয়, বিশ্বের প্রসারিত প্রাঙ্গণে নবযুগের মানুষ আপন কর্মক্ষেত্র রচনা করল। সকল সাহিত্যের সঙ্গে, সকল ধর্মের সঙ্গে রচনা করল এক যোগসূত্র।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সমগ্র পৃথিবীতে এক যুগান্তরের ঘোষণা শোনা গিয়েছিল। তখন যে একটি মাত্র কামনায় বিশ্বের অন্তরাত্মা বিক্ষুব্ধ, তা হল মানবের মুক্তিকামনা। ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শৃঙ্খল থেকে মানুষকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে, দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদে এবং ফরাসী বিপ্লবে।

বিদেশী শিক্ষক ও সাহিত্যের মাধ্যমে ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়ের মর্মে এসে আঘাত করল, তার দৃষ্টিভঙ্গীতে ও জীবনাদর্শে আমূল পরিবর্তনের হল সূত্রপাত। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর জীবনে ও সাহিত্যে যে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা, তা বহুলাংশে এই সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শের প্রেরণা-সঞ্জাত ; মানবতার, জাতীয়তার আদর্শেও নব্যসমাজ উদ্বুদ্ধ, নূতন জীবনাদর্শ ও নবমূল্যমানকে

আয়ত্ত করে সমাজ-জীবন, জাতীয় জীবনকে নূতন করে গঠন করতে অগ্রসর হল। নবজীবনের বাণীকে বহন করেই সৃষ্ট হয় নূতন যুগের সাহিত্য।

শুধু বিদেশী সাহিত্য ও সংস্কৃতির সান্নিধ্যই নয়, ভারতীয় সাহিত্য-দর্শন-পুরাণ-স্মৃতিশাস্ত্রের পুনরুদ্ধারও ইংরেজ-সংসর্গেরই পরিণাম।

শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনের ধর্মপ্রচারমূলক কর্মসূচী, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনবোধ, এসিয়াটিক সোসাইটির বিদেশী সদস্যবৃন্দের বিশুদ্ধ জ্ঞানসাধনায় ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির বহু অমূল্য সম্পদ উদ্ধার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা হল। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর একদিকে সমাজ-সংস্কার কর্মে শাস্ত্রবাণীরই শরণাপন্ন। স্মৃতিশাস্ত্রের অর্থহীন অনুশাসন থেকে জনসাধারণকে অব্যাহতি দেবার উদ্দেশ্যে তাঁরা শাস্ত্রীয় যুক্তির শাণিত কৃপাণই ব্যবহার করে সিদ্ধমনোরথ হলেন। তেমনি বিপক্ষদলেও মধ্যযুগীয় প্রথা ও কুসংস্কারের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য একই অস্ত্র ব্যবহৃত হল, ফলে বিতর্ক-বিক্ষোভের সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত ভারতীয় পুরাণ-দর্শন-সাহিত্যের অমৃতভাণ্ড মৃতপ্রায় জাতির জীবনে প্রাণসঞ্চার করেছিল। প্রতীচ্য ভাব ও ভাবনার আলোক-বিচ্ছুরণে বেদ-উপনিষদ-পুরাণ-তন্ত্রগুলি নূতন অর্থে উদ্ভাসিত হল। প্রাচ্য সংস্কৃতির এই নবমূল্যায়ন-প্রচেষ্টারই পরিণাম ভারতীয় ঐতিহ্যের বনিয়াদে জাতীয়তার সৌধনির্মাণ।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখা যায় দুটি বিপরীত সভ্যতার, দুই ভিন্ন ভাবধারা ও জীবনাদর্শের দ্বন্দ্বে জাতীয় চেতনায় 'নবীন উৎকণ্ঠা' সৃষ্টি হয়। একদিকে প্রতীচ্য ভাব ও চিন্তাধারাকে গ্রহণ, অন্যদিকে জাতির সনাতন ঐতিহ্যকেও রক্ষা, এই দুটি আপাত-বিসদৃশ কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলই হল উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জাগরণ।

পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় ভাব ও আদর্শের সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের প্রয়াসের তিনটি স্তর। প্রথম পর্যায়ে, প্রাচীন ও নব্যপন্থী উভয় সম্প্রদায়ই চরম পন্থাবলম্বনে আগ্রহী। সম্পূর্ণরূপে প্রতীচ্যাদর্শ-প্রভাবিত নূতন সমাজগঠনই নব্যবঙ্গ ও প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় ছিল। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার আত্যন্তিক গ্রহণই হল এই সম্প্রদায়ের নীতি। বহু স্থলে কোন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করেই তাঁরা শুধু ভারতীয়ত্বের অজুহাতে ধর্ম-রীতি-নীতি ও আচার-

অনুশীলন বর্জন করেছেন। নব্যবঙ্গের সদস্যের সরব ঘোষণা—'If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism.'৩

অন্যদিকে যুগপ্রভাবকে অস্বীকার করে, জাতীয় কল্যাণের কথা বিস্মৃত হয়ে মনে মনে যাঁরা মনুসংহিতার যুগ থেকে আর একপা-ও এগিয়ে আসেন নি, সেই রক্ষণশীল সমাজ ছিলেন প্রাচীন আদর্শের অনুগামী। সতীদাহ, বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা-হীনতা প্রভৃতি সকল কুপ্রথা ও অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা কুণ্ঠিত ছিলেন না। এখানেও যুক্তিবিচার নয়, অন্ধ প্রথানুগত্যের শাসনে প্রাচীনপন্থী দল পরিচালিত। বিদেশী ভাবধারা ও আদর্শের সংঘাতে তখন জাতির চিত্ত আবিল হয়ে উঠেছিল। তাই শুধুই 'গ্রহণ অথবা পরিত্যাগ' নীতির অনুসরণই এই পর্বের বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় আত্মস্থ হয়েছেন। জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি, সমাজ ও ধর্মের সংস্কার-প্রয়াসে দেখি স্বদেশ ও স্ব-সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের মনোযোগ আকৃষ্ট। অন্যদিকে রক্ষণশীল সম্প্রদায় সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করলেও শিক্ষাবিস্তার ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে একই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের আপোষ-মীমাংসার অভিপ্রায় লক্ষ্য করি। তারই জন্যে শিক্ষার বিস্তারে, সাহিত্য-সংস্কৃতির উৎকর্ষবিধানে নবচেতনার প্রকাশ হয়েছে নির্বাধ। শিবনাথ শাস্ত্রী যে 'বিংশতি বর্ষকে ১৮২৫-১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত নবযুগের জন্মকাল বলিয়া' গণনা করেছেন, তাকেই সাধারণত নবজাগরণের দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সামঞ্জস্য-বিধানের প্রচেষ্টা সার্থক হল তৃতীয় পর্বে, শতাব্দীর শেষভাগে। স্বজাতীয় ও বিজাতীয়, নূতন ও পুরাতন ভাব ও আদর্শ এক যুগোপযোগী সমন্বয়ের সাধনায় নির্দ্বন্দ্ব হতে উৎসুক। ভারতীয় জাতীয় জীবনপ্রবাহ এতদিনে তার বাঞ্ছিত বিধিনির্দিষ্ট গতিপথটি খুঁজে পেল। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা বহিরাগত, বিচ্ছিন্ন, যত্নলব্ধ বৈশিষ্ট্যের আকারে নয়, জাতীয় প্রকৃতির অঙ্গীভূত এবং চিরাগত ঐতিহ্যের অনুকূল হয়েই গৃহীত। উনবিংশ শতাব্দীর

৩. Studies in the Bengal Renaissance, P 19, Ed. by Atulchandra Gupta : Derozio and Young Bengal, Sushobhan Sarkar

শেষ পাদে বাঙালীর ধ্যানে ও কর্মে, সাহিত্যে ও সংস্কারের মধ্যে সমন্বয়ের সুরই প্রধান হয়ে উঠেছে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—'যে কুঠার সেই ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ অশ্বত্থের মূলদেশ কাটিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা বাস্তবিক অস্ত্রচিকিৎসকের শল্যের কার্যই করিয়াছে।'[৪] জাতির জীবনে দীর্ঘকাল যে গতানুগতিকতা, যে জড়তা অচলপ্রতিষ্ঠ হয়েছিল, তারই পীড়নে এবং নবাগত জীবনাদর্শের প্রচণ্ড আঘাতে সমগ্র জাতির মানসিক ভারসাম্য ছিল বিচলিত। তৃতীয় পর্বে তার অবসানে আত্মপ্রতিষ্ঠ জাতির আপন সাহিত্যের উন্মেষ।

নবজাগ্রত জাতির আত্মোপলব্ধি, আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রসারের ব্যাকুলতার ইতিহাস বিধৃত আছে তার সাহিত্যে। যে ভাবসংঘর্ষ ও সম্মিলনের কাহিনী সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মকোলাহলে প্রকীর্ণ, সাহিত্যের মধ্যে তার ধারাবাহিক, ক্রম-প্রকাশমান রূপটি আবিষ্কার করা সহজ। ঈশ্বর গুপ্তের ঐহিকতাবোধে, সমাজসচেতনতায় এবং দেশপ্রেমের প্রকাশে আধুনিক চেতনার প্রতিফলন লক্ষ্য করি। আবার তাঁরই মধ্যে আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কারের বিরুদ্ধতায়, নারীপ্রগতির প্রতি বিদ্রূপাত্মক মনোভাবে রক্ষণশীল সমাজের আত্মরক্ষার ও প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস ধরা পড়েছে। রঙ্গলাল-মধুসূদনের পূর্ববর্তী যুগের গদ্যসাহিত্যের প্রাচুর্যে, বাঙালী সাহিত্যিকের অতীতাভিমুখী দৃষ্টিতে, বৈজ্ঞানিক কৌতূহলে এবং মনন-ধর্মিতায় নবচেতনাপ্রবুদ্ধ জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসই অভিব্যক্ত। তথাপি দেখি, বাঙালী তখনও আপন হৃদয়ের উত্তাপে লালিত সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি। তৃতীয় পর্বে, নবজীবনের সাধনায় সিদ্ধকাম বাঙালী কবি ও সাহিত্যিক কাব্য-নাটক ও উপন্যাসে যথার্থ সাহিত্যের স্রষ্টা রূপে আবির্ভূত হয়েছেন মধুসূদন-দীনবন্ধু-বঙ্কিমচন্দ্র। মধুসূদন সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার যে উক্তি করেছেন, এ পর্যায়ের সকল কবি ও সাহিত্যিক সম্পর্কেই তা প্রযোজ্য। 'নবযুগের উৎকণ্ঠা, একজন কবির চিত্তগহন হইতে কাব্যচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিল—জ্ঞানেও নয়, কর্মেও নয়, এবার তাহা প্রাণের অতিগূঢ় আকৃতিরূপে বাণী হইয়া উঠিল, জাগ্রত চিত্তের যতকিছু উদ্বেগ, ভয়-ভাবনা অগ্রাহ্য করিয়া

৪. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃ ১৭৩

এবার তাহা মগ্নচৈতন্যে ব্যক্তির স্বাধীন, স্বতন্ত্র আনন্দময় সত্তায় পৌঁছিয়াছে – তাহাকে স্রষ্টা কবি করিয়া তুলিয়াছে।'[৫]

বিজাতীয় সাহিত্য ও ভাবাদর্শের সান্নিধ্যে এসে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে যে সাহিত্যের জন্ম হল, প্রাচীনের অনুস্মৃতি তার মধ্যে লক্ষিত হলেও আঙ্গিকে ও অন্তঃপ্রকৃতিতে, বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনায় তা একান্তই অভিনব, এই নবসাহিত্যের একটি বিশেষ ক্ষণে নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব।

২. নবজাগৃতির প্রধান গুণাবলী

নবযুগের প্রধান লক্ষণ হল ঐহিকতাবোধ, মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা, জাতীয়তার উপলব্ধি, যুক্তিবাদে নিষ্ঠা এবং নারীজাগৃতি। নগরমুখীনতা ও প্রাচীন-সাহিত্যের ও সংস্কৃতির নবমূল্যায়ন-চেষ্টা এর আনুষঙ্গিক লক্ষণ।

ঐহিকতার চেতনার সুপরিণত প্রকাশে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ বিচ্ছিন্ন ও বিশিষ্ট। এতকাল পর্যন্ত সুদূর স্বর্গলোকের প্রলোভনে বাঙালীর সকল কর্মেই ছিল পারমার্থিক কল্যাণের প্রেরণা। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার ঐহিকতাবোধই তাঁকে আধুনিক কালক্রমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ঐহিক চেতনার অল্পবিস্তর প্রকাশ সকল যুগের সাহিত্যেই দেখা যায়; কারণ তারই নামান্তর Human interest-এর উপস্থিতিটিতেই রচনা 'সাহিত্য' পদবাচ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মানুষের মর্ত্য চেতনার ইহকালই সর্বস্ব বলে গৃহীত। এই শতকে কোঁৎ, বেন্থাম, মিল ও স্পেনসারের দার্শনিক মতবাদসমূহ ধর্মপ্রবণ জাতির চিত্তকে করেছিল ঐহিকতায় বিশ্বাসী। মধুসূদন, হেমচন্দ্রের কবিকল্পনা যখন দ্যুলোক-অভিমুখী তখনও এই পৃথিবীর মৃত্তিকার বন্ধন অস্বীকৃত হয় নি। মর্ত্য-জীবনরস নবীনচন্দ্রের কাব্যে এক বিশেষ সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে।

ঐহিকতাবোধের সূত্রেই বিধৃত মানবতাবাদ নবযুগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানবজীবনের বহু বিচিত্ররূপে এযুগের কবি ও সাহিত্যিকের কৌতূহল উদ্রিক্ত। এই মানবতার চেতনাই সংস্কারক ও কর্মীকে দিয়েছে মানুষের দুঃখমোচনের, কল্যাণসাধনের প্রেরণা। এমন কি ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসীও 'বহুজন-

৫. মোহিতলাল মজুমদার, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, পৃ ৬

হিতায় বহুজনসুখায়' জীবন উৎসর্গকেই সাধ্য বলে মেনেছেন। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতেই যেন চলেছে মানবদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এক কর্ম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের আজীবন সকল কর্মে মানব-দেবতাই উপাস্য। এই দেবতারই আহ্বানে ধ্যানযোগী দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ের নিভৃত সাধনপীঠ ত্যাগ করে রাজধানীর কর্মকোলাহলে অবতীর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতেও নির্বিকল্প সমাধির মধ্যে নয়, 'যত্র জীব তত্র শিব' এই উপলব্ধির মধ্যেই মানবজীবনের চরিতার্থতা নিহিত। মধু, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের সাহিত্যে মানবদেবের বন্দনাগাথা রচিত হয়েছে। সমগ্র জাতির হৃদয়সিংহাসনে ছিল এই দেবতারই একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নবযুগেরই সামান্য লক্ষণ। মানবতাবাদের সঙ্গে এর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এযুগে মানুষ কোন শ্রেণীপ্রতিনিধি নয়, সকলেই স্বতন্ত্র সুখ-দুঃখ, কামনা-বাসনা, ভালমন্দের উপলব্ধিতে বিশেষ এবং বিচ্ছিন্ন। ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয়ের প্রতি সাহিত্যিক ও পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট। এমন কি মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকাও বহু সময় কতগুলি সাধারণ গুণাবলীর অধিকারী ও শ্রেণীবিশেষের প্রতিনিধি না হয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এতে মহাকাব্যের গাম্ভীর্য রক্ষিত হয়েছে কি না তা নিয়ে সন্দেহ এসেছে। কিন্তু ব্যক্তিত্বের আত্যন্তিক সাধনা উনবিংশ শতাব্দীতে পরিলক্ষিত হয় না। এযুগে লোকশ্রেয়ের আদর্শ, সমষ্টি-কল্যাণকামনা অবদমিত করে রেখেছিল ব্যক্তির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা আগ্রহকে। উনবিংশ শতাব্দীর ধ্যান ও কর্মে ছিল সমষ্টি-কল্যাণেরই প্রেরণা। 'Greatest good of the greatest number,' এই ছিল শতাব্দীর সাধ্য।

নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী একান্তভাবে আধুনিক যুগেরই আকাঙ্ক্ষা, এদেশে রামমোহনের কণ্ঠে প্রথম এই দাবীর ঘোষণা শুনি। শুধু জীবনধারণে নয়, সম্মানে ও সম্পদে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আজীবন তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। তারই উত্তরসাধনার দায়িত্ব বিদ্যাসাগরে ন্যস্ত হয়েছিল। এ যুগের সাহিত্যেও নারী মহিমার আসনে অধিষ্ঠিতা। রঙ্গলাল-মধুসূদনে প্রেমময়ী ও বীর্যবতী নারীর আত্মপ্রকাশ যুগদৃষ্টিরই প্রেরণাজাত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নারীই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী নিয়তি। নবীনচন্দ্রের কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের মহাভারত প্রতিষ্ঠার ব্রত উদ্‌যাপিত

হয়েছিল কল্যাণশক্তির প্রতীকরূপিণী নারী-সহায়তায়। নারীবন্দনা এই যুগের সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। গীতিকাব্যের মধ্যেও নিখিল সৌন্দর্যরূপিণী নারীরই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

নবজাগরণের এবং আধুনিক সাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্যের বিচার আমরা এপর্যন্ত করেছি, সকল যুগের সাহিত্যেরই মধ্যে প্রথম দিকের উপাদানগুলি অল্প-বিস্তর বর্তমান ছিল। স্বদেশচেতনা ও জাতীয়তাবোধের বৈশিষ্ট্যেই আধুনিক যুগ প্রাচীন ও মধ্য যুগ থেকে একান্তভাবে পৃথক। এক নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় অখণ্ড জাতিত্বের চেতনা ইংরেজ সংস্পর্শে আসার আগে সুসম্বদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে নি। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত রামমোহনই জাতীয়তা-বোধের পথিকৃৎ। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর জনমানসে এক-জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। হিন্দু মেলা, ভারতবর্ষীয় সংস্কারসভা, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ইত্যাদি সংস্থার প্রতিষ্ঠায়, জাতীয়তা-বোধের প্রেরণায় সৃষ্ট কাব্য-নাটক-উপন্যাসে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষের ঐক্যস্থাপনায় অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ লক্ষনীয়। জাতীয়তাবোধের ঐকান্তিক অভিব্যক্তি উনবিংশ শতকের শেষার্ধের ঘটনা। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, 'It may be said that if rationalism was the watch word of the first generation of English educated Bengalis, that of the second genaration was nationalism.'৬

আর এই nationalism একান্তভাবেই নানা জাতিধর্ম, সম্প্রদায়ভেদে ভারতে একটি মাত্র জাতিত্বের প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের সময় পর্যন্ত ঐক্যের সাধনাই স্বদেশপ্রেমের সাধনায় প্রাধান্য পেয়েছিল।

নবযুগের কবি নবীনচন্দ্রের কাব্যে এই যুগচেতনার প্রকাশ তাঁকে স্ব-কালের প্রতিনিধি-কবির মর্যাদায় ভূষিত করেছে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কালসীমায় মহামানবের সাগরতীরের যে ভারতবর্ষ আত্ম-বিস্মৃতির অতল জলধি থেকে দ্বীপের মত মাথা তুলেছে, প্রকাশিত এবং পরিচিত হয়েছে, নবীনচন্দ্র সেই ভারতবর্ষের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি। একালেও তিনি স্মরণীয় এ কারণেই।

৬. Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century, P. 73 : R. C. Mazumdar

৩. নবযুগ ও নবীনচন্দ্র

নবযুগের সংগঠন-যজ্ঞে নবীনচন্দ্র একজন চারণকবি মাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ঋত্বিকও। বঙ্গ সাহিত্যের আসরে তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গসমাজে মাহেন্দ্রক্ষণের সঞ্চার হয়েছে বলে শিবনাথ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন। কারণ, 'এই কালের মধ্যে ১৮৫৬-১৮৬১ বিধবা-বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবিভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল, প্রত্যেকটিরই ইতিবৃত্ত গভীর অভিনিবেশ সহকারে আলোচনার যোগ্য।'[৭]

সমাজসেবা ও লোককল্যাণ-ব্রতে রামমোহন-বিদ্যাসাগরকে, ধর্মসমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-কেশবচন্দ্রকে, সাহিত্যসাধনায় মধুসূদনকে অনুসরণ করে কর্মী, ধর্মোপদেষ্টা ও সাহিত্যিকরূপে নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক দিকে তিনি যেমন মধুসূদনের প্রবর্তিত মহাকাব্যধারার অনুবর্তন করেছেন, অন্য দিকে নবসংস্কৃত পৌরাণিক হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠার ব্রতে তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগী।

একদিকে তাঁর সাহিত্যে দেখি ফরাসী বিপ্লবে ঘোষিত সেই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীর অনুপ্রেরণার প্রকাশ। 'Men are born and remain free and equal in rights ; social distinction may be based only upon general usefulness.'[৮]

নবীন-কাব্যে একই উপলব্ধ সত্য ভিন্ন ভঙ্গী ও ভাষায় উচ্চারিত।—

এক জাতি মানবসকল,
একবেদ মহাবিশ্ব, অনন্ত অসীম,
একই ব্রাহ্মণতার—মানবহৃদয়,
একমাত্র মহাযজ্ঞ স্বধর্ম সাধন।

—রৈবতক, সপ্তম সর্গ

৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ ২০২, নিউ এজ সংস্করণ
৮. Declaration of the Rights of Man

আবার মহাভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্যস্থাপনায় কবির অতীতাভিমুখী দৃষ্টি গীতার নিষ্কাম কর্মযোগকেই আশ্রয় করেছে। কবি উপলব্ধি করেছেন শ্রীকৃষ্ণনির্দেশিত পন্থার অনুবর্তনেই ভারতের কল্যাণ, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হ্যয়নায়।'—

অভ্যাস ও জ্ঞানবলে ইন্দ্রিয় করি সংযত
জগতের হিতে করি নিজ স্বার্থ পরিণত,
স্বপ্রকৃতি অনুসারে স্বধর্ম কর পালন,
এইরূপে কর্মফল ব্রহ্মে করি সমর্পণ।

—কুরুক্ষেত্র, চতুর্থ সর্গ,

কাব্যত্রয়ীর মূল বক্তব্য এই কর্মযোগের প্রবর্তনা। একদিকে প্রতীচ্যাদর্শের প্রভাব, অপরদিকে সনাতন আদর্শের অনুসরণ।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মানবতাবাদ, হিতবাদে উদ্বুদ্ধ নবীনচন্দ্র অনুভব করেছেন—

নহে বেদ পূর্ণ ধর্ম, যজ্ঞ নহে পূর্ণ কর্ম
ধর্ম কৃষ্ণ সর্বভূত-হিত।

—কুরুক্ষেত্র, দ্বাদশ সর্গ

'Greatest good of the greatest number,' হিতবাদীর এই অভীষ্টের সঙ্গে নিষ্কাম কর্মযোগী বিনা দ্বিধায় শাশ্বত ভারতীয় আদর্শের মিলন ঘটিয়েছেন। পরবর্তী পংক্তিতে তাই তাঁর নির্দেশ—

তাহার সাধন কর্ম, নারায়ণে কর্মফল
ভক্তিভরে করি সমর্পিত।

এখানে বেন্থামের দার্শনিক মতবাদ আত্মগোপন করেছে গীতার ফল-কামনাহীন কর্মানুষ্ঠানে।—

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥[৯]

সমন্বয়ের কবি নবীনচন্দ্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনার প্রয়াস সার্থক হয়েছে।

৯, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩/২০, উদ্বোধন সংস্করণ

নবীনচন্দ্রের জীবন-জিজ্ঞাসায় সে যুগের বিচিত্র ভাবধারা প্রতিভাসিত। কাব্যের ক্ষেত্রেও তিনি গীতিকবিতা ও মহাকাব্য-রচনায় সমান প্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যশৈলীতে একদিকে মধুসূদন প্রমুখ মহাকবির অনুবৃত্তি এবং অন্যদিকে বিহারীলাল, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি গীতিকবির সমধর্মিতা তাঁর কাব্যে পরিলক্ষিত। গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর একটি মর্মগত যোগ ছিল। সমকালীন সারস্বত সাধনার ক্ষেত্রে নবীনচন্দ্রের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। নবীনচন্দ্র আপন দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েই একনিষ্ঠ সেবায় তৎকালীন সাহিত্যকে শ্রীসম্পন্ন করে গেছেন, জাতির জন্য রেখে গেছেন এক বিশেষ আদর্শের প্রেরণা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবিজীবন

'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে' কবির এই উক্তি সমর্থন করেও আমরা জীবনকাহিনীর পৃষ্ঠায়ই তাঁকে খুঁজে ফিরি। তাঁর, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশায় কাব্যজীবনের সূত্র অনুসন্ধান করি। কি গুণে কবির কাব্য রসের আধার উঠেছে, চিত্তের জাগরণ হল কোন্ রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের সান্নিধ্যে, সে সংবাদ হয়ত জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায় না, তথাপি কবিচিত্তের মৌল প্রবণতা কি এবং কিভাবে নানা ঘটনার সংঘাতে তাঁর সারস্বত সাধনার ধারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে জীবনকাহিনীর অনুবর্তনেই তা জানতে পারি। কাব্যপাঠের ভূমিকারূপে কবির জীবন পরিবেশের পরিচয় মূল্যবান।

নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে শশাঙ্কমোহন সেন বলেন, 'উহা জীবন যাপনের ইতিবৃত্ত মাত্র, জীবন গঠনের নহে।'[১] নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে'র প্রারম্ভে গ্রন্থরচনার যে কারণ নির্দেশ করেছেন, সেখানেও কাব্যসাধনার ইতিবৃত্ত বা একান্তরূপে কবিজীবনী রচনার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নি। তাঁর অভিপ্রায় ছিল এক বিরাট, বিশদ আত্মজীবনেতিহাস রচনা করা। এখানে কবি নবীনচন্দ্র ব্যক্তি-নবীনচন্দ্রেরই অখণ্ড ব্যক্তিত্বের খণ্ড অভিব্যক্তি। নবীনচন্দ্রের সাহিত্যসাধনা ও জীবনসাধনা অভিন্ন। সাহিত্যকর্ম, যা ছিল তাঁর জীবনযাপনের অঙ্গ, তার জন্য পৃথক ইতিবৃত্ত রচনার প্রয়োজন অনুভব করেন নি কবি। আত্মাদরপরায়ণ নবীনচন্দ্র আপন জীবনের প্রতিটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে পরম মমতায় বিগলিত। সেই ঘটনাপুঞ্জের অজস্রতায় তাঁর কাব্যজীবনের পরিচয় ও পটভূমি আবিষ্কার করা আপাতদৃষ্টিতে কষ্টসাধ্য মনে হয়। কিন্তু এখানে কবিচরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য—তাঁর আত্মসম্পর্কিত বিষয়ে কৌতূহল, পরিস্ফুট। আবার তারই মধ্যে থেকে তাঁর সৃষ্টিধর্মের পশ্চাতে যে অনুপ্রেরণা কবি লাভ করেছিলেন, তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় পাওয়া যায়। কেমন ভাবে সুপ্ত প্রতিভা অনুকূল পরিবেশে উন্মেষিত হয়েছে, কেমন করে গীতিমুখরতা অস্ফুটবাক্ হয়ে এল মহাকাব্যের ভাবগম্ভীর পরিবেশে, কোন্ আহ্বানে কবি

১. বঙ্গবাণী, শশাঙ্কমোহন সেন

সর্বকর্মভার শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করে কৃষ্ণপদতরীর ধ্যানই সর্বসাধ্যসার করেছেন, তা না জানলে নবীনচন্দ্রের কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র যে, যুগপ্রবণতার প্রেরণায় নয়—অন্তরের এক বিশেষ উপলব্ধিতেই তিনি 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস', 'অমিতাভ', 'অমৃতাভ' কাব্য সৃষ্টি করেছেন, তাঁর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কাব্যকে স্থাপন না করলে এই সত্য অজ্ঞাতই থেকে যাবে।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বংশে নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম হয়। বিত্তবান ও প্রতিষ্ঠাবান পিতার সন্তান নবীনচন্দ্রের বাল্য-জীবন অতিবাহিত হয়েছিল প্রাচুর্য ও সমাদরের মধ্যে। নবীনচন্দ্র পিতা গোপীমোহন রায়ের ও মাতার সদাশয়তা ও পরদুঃখকাতরতা ও অকপটতার উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন। যুগপৎ এই পিতৃধন ও মাতৃধনের অধিকার এক দিকে তাঁকে লোকপ্রিয় করেছে, অন্য দিকে সারাজীবনে কবি যত দুঃখ পেয়েছেন তার প্রধান অংশই তাঁর পরোপচিকীর্ষা ও সরলতার পরিণাম। পিতামাতার অপরিমিত স্নেহ ও প্রশ্রয়ে বাল্যে তাঁর কোন ইচ্ছাই অচরিতার্থ থাকে নি। পরবর্তী জীবনেও তাই আপন প্রকৃতির ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির বেগকে ধারণ করতে তিনি বহু সময়ই সক্ষম হন নি। প্রবল হৃদয়াবেগই তাঁকে আপন কর্তব্যে অবিচলিত থাকতে, জীবনের সর্ববিধ দুঃখ বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করতে শক্তি দিয়েছে। আবার সাহিত্যেও এই দুর্বার প্রাণশক্তি একটি বিশেষ গতিশীলতার, স্পন্দনময়তার সৃষ্টির হেতু।

নবীনচন্দ্র আজীবন শৈশব-সুখস্মৃতি হৃদয়ে লালন করেছিলেন। তাঁর 'অবকাশরঞ্জিনী' দুই ভাগ, 'রঙ্গমতী', 'রৈবতক 'কুরুক্ষেত্র' 'প্রভাস' কাব্যেও কবি বাল্যস্মৃতির রোমন্থনে আবিষ্টচিত্ত।

কবিতানুরাগ নবীনচন্দ্রের উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ সম্পদ। তাঁর পিতা এবং পিতৃব্যেরা অনেকেই এবং অত্যুক্তিপ্রিয় কবির ভাষায়—'চট্টগ্রামবাসী মাত্রই কবিতা-প্রিয় ছিলেন'। তাঁর কবিতানুরাগও ছিল কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মতই সহজাত। 'আমার জীবন' প্রথমখণ্ডে নবীনচন্দ্র নিজেই মন্তব্য করেছেন—'পাখীর যেমন গীত, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, কবিতানুরাগ তেমনি আমার প্রকৃতিগত ছিল। কবিতানুরাগ আমার রক্তেমাংসে, অস্থিমজ্জায়, নিশ্বাসেপ্রশ্বাসে আজন্ম সঞ্চালিত হইয়া

অতিশৈশবেই আমার জীবন চঞ্চল, অস্থির, ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল।"

আত্মগৌরব-কীর্তন নবীনচন্দ্রের চরিত্রের একটি ত্রুটি। তথাপি তাঁর কবিত্বশক্তির মধ্যে, তাঁর কবিকল্পনার মধ্যে একটি সাবলীল, সহজ, স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তি ছিল-অস্বীকার করা যায় না। যত্নলব্ধ কাব্যকলার অনুসরণ তিনি করেন নি, কিন্তু অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত তাঁর কাব্য-স্রোতস্বিনী বাংলা সাহিতের ইতিহাসে তাঁকে এক সম্মানের স্থান দিয়েছে। শশাঙ্কমোহন সেনের উক্তি উল্লেখ করে বলতে পারি, প্রকৃতির পরম আনুগুণ্যে নবীনচন্দ্রকে হৃদয়ে এবং কার্য্যে কবি করিয়া তুলিয়াছিল।"

'আমার জীবনে' নবীনচন্দ্র 'মাতৃভূমি প্রাকৃতিক কবিত্বময়ী'—'Stern and wild mute nurse for a Poetic Child' চট্টগ্রামের কাছে আপন কবিত্বশক্তির বিকাশের জন্য ঋণ স্বীকার করেছেন। 'বাংলার বায়রণ' নবীনচন্দ্রের প্রসঙ্গে শশিভূষণ দাশগুপ্তের অভিমত, 'যদি তাঁহাকে কাহারও মন্ত্রশিষ্য বলা যায় তবে তিনি সমুদ্রমেখলা পর্বতবাসিনী চট্টলেশ্বরী।' কবির জন্মভূমি তাঁর কাব্যে শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনাংশেই নয়, সূক্ষ্মভাবময় রূপেও প্রকাশিত।—

"নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভাকে একটু গভীর করিয়া বুঝিতে গেলে দেখিতে পাইব, তাঁহার প্রতিভার দিব্যশিশু তাহার শৈশব কাটাইয়াছে স্নেহময়ী চট্টলেশ্বরীর মাতৃক্রোড়ে, তাঁহার কৈশোর এবং যৌবন কাটিয়াছে চট্টলেশ্বরীর গৃহ-আঙ্গিনায়। কবি চোখ মেলিয়া একদিকে দেখিয়াছেন শুধু উচ্চশির পাহাড়-পর্বতের লীলা, অন্যদিকে দেখিয়াছেন সীমাহীন সাগর, অন্তরাবেগে সে শুধু উচ্ছ্বসিয়া উঠিতেছে।......এই পর্বতের মহত্ত্ব ও বিরাটত্ব এবং সমুদ্রের বিশালতা এবং দুর্বারতা দিয়াই গঠিত হইয়াছে নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভা।"

'আমার জীবন' প্রথম ভাগে 'কবিতানুরাগ' অধ্যায়ে নবীনচন্দ্রের আপন উক্তিতেই এই সত্য সমর্থিত।

বিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় ১০।১১ বৎসর বয়স থেকে নবীনচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের অনুকরণে কবিতা লিখতেন। অথচ পরবর্তী যুগে নবীমচন্দ্রের কবিতায়

ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব দুর্লক্ষ্য। প্রেসিডেন্সি কলেজে কবি যখন এফ. এ. ক্লাসের ছাত্র তখন 'এডুকেশন গেজেটে' তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়. 'বিধবা কামিনী'। নিতান্ত পরিহাস-প্রিয়তার বশে রচিত হলেও কবিত্বের স্পর্শ এখানে দুর্লভ নয়। 'আমার জীবনে' দেখি মধুসূদন কবিতাটি পাঠ করে লেখককে তাঁর একজন 'চেলা'র সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। নবীনচন্দ্র আজীবন সেই সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। এ পুরস্কার তিনি বিস্মৃত হন নি জীবনের শেষ পর্বেও। মধুসূদনের তিরোধানে নবীনচন্দ্রের রচিত 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত' কবিতায় নবীনচন্দ্রের শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ের অকৃত্রিম আত্মপ্রকাশ ঘটেছে কাব্যাদর্শেও অগ্রজ কবির অনুসরণের মধ্যে।

বি. এ পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্বে নবীনচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়। সেই পারিবারিক দুর্যোগের দিনেও তাঁর অটুট মনোবল বিস্ময়জনক। গভীর দুঃখের মধ্যে তখন যে অক্ষয় সম্পদ তিনি লাভ করেছিলেন তা হল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহৃদয় সান্নিধ্য। যে শ্রেয়োমুখী সমাজবুদ্ধি নবীনচন্দ্রের সকল কর্মে, সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রেরণা দিয়েছিল, তার উন্মেষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরোক্ষ প্রভাব অনুমান করা যায়। 'আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগৃহীত ছিলাম বলিয়া তাঁহার জীবনের ছায়াও বুঝি আমার জীবনে পড়িয়াছে।' 'আমার জীবন' পঞ্চম খণ্ডে নবীনচন্দ্র নিজেই এই মন্তব্যে উপরোক্ত মতটিকে সমর্থন জানিয়েছেন। বিদ্যাসাগর নবীন-চিত্তে নরনারায়ণ রূপেই প্রতিষ্ঠিত।

নবীনচন্দ্র ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেছিলেন। কর্মসূত্রে যশোহরে অবস্থানকালে যে পরিবেশ লব্ধ হয়, সেটি তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। একটি রসজ্ঞ পৃষ্ঠপোষক সম্প্রদায়ের উৎসাহে যশোহরেই তাঁর 'অবকাশ-রঞ্জিনী'র অধিকাংশ কবিতাই রচিত। 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যেরও সূত্রপাত এখানে।

যশোহরে অবস্থিতির সময়ই নবীনচন্দ্রের সঙ্গে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের পরিচয় এবং পরে বিশেষ সৌহার্দ্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'আমার জীবনে' নবীনচন্দ্র তাঁর স্বদেশপ্রেমের উন্মেষে শিশিরকুমারের প্রভাব স্বীকার করেছেন। 'যশোহরে লিখিত আমার খণ্ড কবিতায় ও "পলাশির যুদ্ধে" স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রুবিসর্জন আছে, তাহা কথঞ্চিৎ শিশিরকুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ফল।'

'রৈবতক,' 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসে'র কৃষ্ণভক্তি-বিহ্বলতা ও গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নামাশ্রয়ী প্রেমবিহ্বলতা এবং 'অমৃতাভে'র শ্রীচৈতন্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার প্রকাশে শিশিরকুমারের প্রভাব যথেষ্ট। নবীনচন্দ্র 'আমার জীবন' দ্বিতীয় ভাগে, 'শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ' শীর্ষক অধ্যায়ে আপন ঋণ স্বীকার করেছেন।

'অবকাশ-রঞ্জিনী'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ যথাক্রমে ১৮৭১ ও ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'পলাশির যুদ্ধ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, রঙ্গমতী কাব্য ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ খণ্ড-কাব্য 'অবকাশ-রঞ্জিনী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নবীনচন্দ্র সুকবির মর্যাদায় ভূষিত হলেন—'বঙ্গদর্শনে' স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনায়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবি তাঁকে প্রতিভাশালী কবির স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ-পাঠেই।

ভাগ্যদেবতার প্রসন্ন আনন নবীনচন্দ্র-জীবনে অল্পই প্রত্যক্ষীভূত। বারবার তিনি সুখের কোমল শয্যা থেকে দুঃখের কণ্টক-সিংহাসনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। আবার সেখানেই তিনি রাজসম্মানের অধিকারী; শ্রেয়ঃ লাভ হয়েছে তাঁর। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আত্মীয়-বন্ধু-উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্রে ঘোরতর বিপদগ্রস্ত হয়ে স্বদেশ চট্টগ্রাম ত্যাগ করে তিনি শ্রীক্ষেত্র পুরীতে উপনীত হলেন। এখানে নবীনচন্দ্রের জীবনে এক নব-অধ্যায়ের সূচনা। গীতিকবির নির্মোক মোচন করে মহাকবির আবির্ভাব আভাসিত হল শ্রীক্ষেত্রেই। 'শ্রীভগবানের লীলা দুর্জ্জেয়। তিনি আমাদের ঘোরতর অমঙ্গলের মধ্য দিয়াও মঙ্গল বিধান করেন, আমি ঘোরতর বিপন্ন হইয়া···· চট্টগ্রাম হইতে শ্রীক্ষেত্রে বদলি না হইলে আমার সেই যৌবনসুলভ বিলাসবাসনাপূর্ণ হৃদয়ে ভক্তির পবিত্র ছায়া পতিত হইত না, আমি 'রৈবতক,' 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' রচনা করিতে পারিতাম না।'

শ্রীক্ষেত্রে নবীনচন্দ্রের চিত্তে কৃষ্ণভক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ-হীনতার আদর্শও তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারত তখনও বর্ণবৈষম্যকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিয়ে চলেছিল। হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের কবি নবীনচন্দ্র অনুভব করলেন বহুধা বিভক্ত, বহু সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মণ-শূদ্র, আর্য-অনার্যের মধ্যে

আত্যন্তিক ভেদ দূরীভূত করা প্রয়োজন। একজাতি প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে, সকল ভারতবাসীকে যদি ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা যায় তবেই ভারতের মঙ্গল। অন্যথায় সকল সংস্কার, স্বাধিকার-অর্জনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে। নবীনচন্দ্র অনুভব করেছিলেন, ধর্মের ভিত্তিতে, সহিষ্ণুতার পথেই একজাতীয়তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। শ্রীক্ষেত্রের ধর্মগত সাম্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কবি বুদ্ধ-খ্রীষ্ট-মহম্মদ—সকলকেই শ্রীভগবানের অবতার রূপে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা, 'কাব্যত্রয়ী'তে মহাভারত স্থাপনার অন্যতম প্রধান সহায়ক। শ্রীক্ষেত্রের প্রভাব কাব্যত্রয়ীর চরিত্র-নির্বাচনেও দৃষ্ট হয়। ব্যাস-কৃত মহাভারতের সঙ্গে আধুনিক কবির মহাভারতের এই বৈসাদৃশ্য একান্ত কৌতূহলজনক। এখানে অনার্য-চরিত্রগুলির উপস্থাপনায় শ্রীক্ষেত্রে প্রচলিত কিংবদন্তীর অনুবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়।

পুরীতে অবস্থানকালে নবীনচন্দ্রের জীবনে এক নব অধ্যায়ের সূচনা হল। এখানেই তিনি এক ও অখণ্ড ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করলেন অত্যন্ত বাস্তবরূপে।—'চক্ষের সম্মুখ দিয়া দর্শন-মন্দির হইতে মানবস্রোতঃ বহিয়া যাইতেছে। তাহাদের কত ভাষা, কত পরিচ্ছদ, কত বিচিত্র রূপ, হিমাদ্রি হইতে কুমারিকাবাসী এবং চট্টগ্রাম হইতে গান্ধারবাসী সমস্ত ভারতবর্ষের হিন্দু জাতি এক স্রোতে বহিয়া যাইতেছে।"

এই সব অনুভবের, পরিবর্তিত জীবনাদর্শের ভিত্তিতেই আমরা তাঁর কাব্য-জীবনকে দুই পৃথক পর্বে বিন্যস্ত করেছি। শ্রীক্ষেত্রে তাঁর মনোভঙ্গীতে ও চিন্তায় যে পরিবর্তনের সূচনা হয়, নবীনচন্দ্রের অবশিষ্ট জীবনও ঐ আদর্শের রূপায়ণের প্রচেষ্টায় অতিবাহিত।

কর্মসূত্রে নবীনচন্দ্র যখন বিহারে ছিলেন তখন হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের প্রখ্যাত তীর্থস্থানগুলি দর্শন করে ,একদিকে যেমন তিনি শ্রীকৃষ্ণের জীবন-লীলা বর্ণনায় অনুপ্রেরিত হলেন, অপর দিকে তেমনই বুদ্ধদেবের জীবন ও ধর্ম তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। ১৮৮৭, ১৮৯৩ এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক,' 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' কাব্য প্রকাশিত হল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে 'খ্রীষ্ট', ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 'অমিতাভ' এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পর অসমাপ্ত রচনা 'অমৃতাভ' মুদ্রিত হয়েছে। এখানে সমন্বয় যুগের কবি নবীনচন্দ্র 'যত মত তত পথ'-এর আদর্শের উদ্‌গাতারূপে যথার্থ যুগপ্রতিনিধি। সহজিয়া বৈষ্ণব,

কর্তাভজা—যে কোন ক্ষুদ্র-বৃহৎ ধর্মমতে এই ধর্ম ও সমাজগত সাম্যাদর্শের অনুস্মৃতি দৃষ্টিগোচর হয়েছে, সেখানেই তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদিত।

কর্মসূত্রে রাণাঘাটে অবস্থান কালে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। পূর্বে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুমেলার অধিবেশনে যে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি ছিলেন 'ঠাকুরবাড়ীর কাঁচামিঠা আঁব'। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি'তে 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়েও এই ঘটনার উল্লেখ আছে। দীর্ঘকালের ব্যবধানে যখন পুনরায় তাঁদের সাক্ষাৎ হল তখন নবীনচন্দ্রের ভাষায়—'রবীন্দ্রনাথের গৌরবে সৌরভে বঙ্গবাসী ও বঙ্গসাহিত্য গৌরবান্বিত। মহাকাব্য-ধারার শেষ কবি নবীনচন্দ্র ও আধুনিক গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্র-নাথ দুই পৃথক যুগাধ্যায়ের প্রতিনিধি।' নবীনচন্দ্র এই পরিচয়পর্বের বর্ণনা প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনদৃশ্যের তুলনা করেছেন। নবীনচন্দ্রের আত্মশ্লাঘার পরিচয় হয়ত কেউ কেউ সেখানে দেখে থাকেন। তবু নবীনচন্দ্র যেখানে কবি, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বা Prophet সেখানে তিনি এক যুগ-সংক্রমণের বার্তাই ঘোষণা করেছেন। রবীন্দ্রপূর্ব ও রবীন্দ্রযুগের মিলন—নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মিলনের বর্ণনায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের উপমা অযথার্থ হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে নবীনচন্দ্রকে লিখেছিলেন "আপনার নামের নিম্নে নাম স্বাক্ষর করিবার অধিকার আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, আশা করি ইতিহাসের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত এই অধিকারটি রক্ষা করিতে পারিব।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পরিচালনায়, কৃত্তিবাস প্রমুখ প্রাচীন কবির স্মৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থায় নবীনচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল। সর্বত্রই দেখি এই ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রম অটুট—কখনও মতৈক্যে, কখনও মতভেদে।

মহাকবিরূপে সম্মানিত নবীনচন্দ্রের গদ্যশৈলী ছিল হৃদয়গ্রাহী। পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত 'আমার জীবন' ১৯০৮ থেকে কবির তিরোধানের পর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। নবীনচন্দ্রের অন্য দুটি গদ্য সাহিত্যের নিদর্শন 'প্রবাসের পত্র' (১৮৯২) এবং 'ভানুমতী' (১৯০০)।

নবীনচন্দ্র শুধুমাত্র কাব্য বা সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেই আপনার সারস্বত সাধনাকে চরিতার্থ মনে করেন নি; আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন ফুলিয়া, হালিসহর, নৈহাটি প্রভৃতি সাহিত্যতীর্থগুলি সংরক্ষণের জন্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উন্নতিবিধান, পরিভাষা-সংকলন তার অন্যতম দান।

শাসনকর্তারূপেও নবীনচন্দ্র তাঁর স্বদেশহিতৈষণার নীতিকেই আশ্রয় করেছেন। পদমর্যাদার বিচারে তিনি মধ্যম শ্রেণীর হলেও শাসকরূপে তিনি যে কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। বিস্তালয়, পথঘাট ও জলাশয়ের সংস্কার, গ্রাম্য ও নাগরিক স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার উন্নতিবিধান ব্যতীত নবীনচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কীর্তি বিহার এবং ফেনী রেলপথের সুবন্দোবস্তের প্রবর্তন।, কবি নবীনচন্দ্রের কালজয়ী কীর্তি সম্পর্কে কারও কারও সন্দেহ থাকলেও শাসক নবীনচন্দ্র এখনও পর্যন্ত, তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসর পরেও, সেখানকার সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। নবীনচন্দ্রের জনৈক বন্ধু তাঁকে এক পত্রে জানিয়েছিলেন,—"আশ্চর্য তোমার শক্তি, তুমি এখানে অমর নাম রাখিয়া গিয়াছ। যাহাকে দেখি, জিজ্ঞাসা করিলে বলে 'নবীন বাবুকা কিয়া হুয়া'।"

উপরোক্ত অংশটি নবীনচন্দ্রের আত্মজীবনী থেকে উদ্ধৃত; অতএব অতিভাষণের আশঙ্কা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উক্ত বিহার অঞ্চলের অধিবাসী বিশ্বভারতীর হিন্দীভবনের অধ্যাপক শ্রীনন্দকিশোর-জীর মুখে যখন 'নবীন বাবুকা কিয়া হুয়া' ও বহু কীর্তির কথা শুনি, তখন শাসকরূপে নবীনচন্দ্রের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। নবীনচন্দ্র ছিলেন কর্মযোগী, তাঁর সাহিত্যে ও জীবনে কর্মযোগই অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট Headstrong and Stubborn উপাধিতে ভূষিত নবীনচন্দ্র আজীবন লোকহিতের আদর্শ অনুসরণ করেছেন। যে স্বদেশপ্রেম তাঁর কাব্যে অকপটে প্রকাশিত, কর্মেও তারই অবারিত প্রকাশ। রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাজকর্মচারী হয়েও তিনি শিশিরকুমার ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ইংরেজবিরোধী ব্যক্তি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তদানীন্তন নেতৃবর্গের বহু আভ্যন্তরীণ বিরোধের অবসান হয়েছিল নবীনচন্দ্রেরই আগ্রহাতিশয্যে। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রাচীন ও নব্য নেতাদের সম্মিলন যে প্রয়োজনীয়—ভারত-বর্ষের জাতীয়তাবোধের নেপথ্য নেতা নবীনচন্দ্রের এই উপলব্ধি সে যুগে বহু সংকটের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করেছিল, তাঁর আত্মজীবনী পাঠ করে তা অনুমান করা যায়।

আজীবন কর্মকোলাহলের মধ্যে থেকেও নবীনচন্দ্র একটি শান্তিপূর্ণ

নীড়ের স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু কখনও দীর্ঘদিন তিনি নিভৃত শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় পান নি। কবি পুত্রশোক, ভ্রাতৃশোক, বন্ধুবিয়োগের ব্যথার সঙ্গে অকৃতজ্ঞ পরিজনবর্গের দুর্ব্যবহারে পীড়িত হন। পরসুখ-অসহিষ্ণু সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রে বার বার তিনি আহতও হয়েছেন। তথাপি স্বদেশের মঙ্গলসাধনার ব্রতে সমগ্র জীবন তিনি নানা কর্মে আপনাকে লিপ্ত রেখেছিলেন। তবু মনের মধ্যে ছিল তাঁর একটি নির্ঝঞ্ঝাট, নিভৃত, নির্জন* পরিবেশ-রচিত গৃহের বাসনা। সমগ্র জীবনের প্রতি নবীনচন্দ্রের এক কবিসুলভ দৃষ্টি ছিল। তাই আপন গৃহকে মনোরম ভাবে সজ্জিত করে এবং প্রাচীন ভারতীয় তপোবন-জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতায় আবিষ্ট হয়ে তার নাম দিয়েছিলেন 'আশ্রম'। মাতৃভূমি চট্টগ্রামে স্বহস্তরচিত গৃহে অবসর যাপনই ছিল কবির দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। তাঁর গার্হস্থ্য রস-পিপাসু চিত্ত তাঁর কাব্যে ও অন্যত্র প্রসঙ্গে-অপ্রসঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছে। অথচ জন্মভূমিতে বাস কবির অদৃষ্টে অল্পই ঘটেছিল।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পর পুত্রের কর্মস্থল রেঙ্গুনে প্রবাসজীবন অতিবাহিত করেছেন। বিগত জীবনের স্মৃতিচারণে আত্মকাহিনী রচনার অবকাশের দিনগুলি অতিক্রম করে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর অন্তিম উক্তি – 'আজ আমার বিজয়া'।

যে শান্ত রসাস্পদ আশ্রম চিরজীবন তাঁকে হাতছানি দিয়েছিল, অন্তিম বাসনায়ও নবীনচন্দ্র সেই ত্যাগব্রতী ঋষির জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেলেন। গৈরিকে সজ্জিত বিভূতিভূষিত দেহে এই মহাযাত্রীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হল।

মানবজীবন তাঁর কাছে পরম শ্রদ্ধেয়, একান্ত সত্যরূপে গৃহীত হয়েছিল। জীবনযজ্ঞের পূর্ণাহুতির সময়ও তিনি অশ্রুত কণ্ঠে যে মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তা হল তাঁর বহুবার উচ্চারিত Longfellow-র সেই পংক্তিটি—Life is real, life is earnest.

তৃতীয় অধ্যায়

কাব্যপ্রবাহ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে অধ্যায়ের নাম নব্য-ক্লাসিক যুগ বা বীরযুগ, বা মহাকাব্যরচনার যুগ, নবীনচন্দ্র সেই যুগের অন্যতম জনপ্রিয় কবি। এ যুগের ক্ষমতাশালী কবিরা সকলেই মহাকাব্যসংরচনে ব্রতী হলেও গীতিকবিতাও প্রচুর রচিত হয়েছে। তবু পাঠকচিত্তে মহাকাব্যের যে আবেদন ছিল, গীতিকাব্যের সমাদর ছিল অপেক্ষাকৃত কম।

নব্য-ক্লাসিক যুগের প্রথম কবি রঙ্গলাল মহাকাব্য রচনা করেন নি। তাঁর সবগুলিই উপাখ্যান-কাব্য—ঐতিহাসিক, স্বদেশপ্রেমমূলক রোমান্স। মধুসূদনের মেঘনাদবধ মহাকাব্য বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং বহু সমালোচকের মতে এক ও অদ্বিতীয় সাহিত্যিক মহাকাব্য বা Literary Epic। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার এবং নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস' মহাকাব্যরূপে গৃহীত এবং আজ পর্যন্ত মহাকাব্যের মানদণ্ডেই কাব্যগুলির উৎকর্ষ বিচার হয়ে থাকে। নবীনচন্দ্রের কবিখ্যাতি বহু পরিমাণে এই কাব্য তিনটির উপর নির্ভরশীল। বর্তমানেও অনেক সময় মহাকাব্যিক ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ণয় করেই নবীনচন্দ্রের কাব্যসমালোচনার কর্তব্য সম্পন্ন হয়।

নবীনচন্দ্রের কবিপ্রাণ ছিল মূলত গীতিকবি সুলভ। মহাকবিরূপে তাঁর যে ত্রুটিই ঘটুক, গীতিকবিরূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ অনিন্দনীয়—বহু সমালোচক এ মত পোষণ করে থাকেন। পূর্বগামী বাঙালী কবিদের উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ সম্পদ গীতিকবিতায় তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

নবীনচন্দ্রের কাব্য-জীবনকে আমরা দুই পৃথক পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। প্রথম পর্বে কবির রচিত খণ্ডকবিতা বা গীতিকবিতা—'অবকাশরঞ্জিনী,' দুই খণ্ডে 'পলাশির যুদ্ধ' ও পরে 'রঙ্গমতী' এই পর্বেরই সন্ধিক্ষণের সৃষ্টি। দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্ভুক্ত 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস,' জীবনী-কাব্য 'অমিতাভ' 'খৃষ্ট' 'অমৃতাভ' এবং পদ্যানুবাদ 'শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌গীতা' এবং 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'।

নবীনচন্দ্র যে যুগে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন সে যুগে Art for Art's Sake বা কলাকৈবল্যবাদ আদর্শের অনুসরণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন সমস্যারই অস্তিত্ব ছিল না। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের প্রথম যুগে মধুসূদনই যথার্থ

কাব্যসৃষ্টিকে লক্ষ্য করেছিলেন। রঙ্গলাল থেকে নবীনচন্দ্র পর্যন্ত সকল কবিই এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকেরা জাতীয় জীবনে সাহিত্য ও কাব্যের প্রভাব সম্বন্ধে ছিলেন সচেতন। এখানে সাহিত্যাচার্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাংলার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন', থেকে প্রাথমিক হিসেবে কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল,—

"যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।"

এই দেশের বা মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধনের বাসনা ছিল তৎকালীন কবি ও সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। নবীনচন্দ্রেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। তথাপি প্রথম পর্বে সংস্কারক, শিক্ষক বা ধর্ম-প্রবর্তক নবীনচন্দ্র নয়, কবি নবীনচন্দ্রের আত্মপ্রকাশই হয়েছে।

তখন তিনি যে একজন কবি এই প্রত্যয় ছিল তাঁর গভীর। এ কারণ অবকাশরঞ্জিনী প্রকাশের পর ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের জন্য কবিতা রচনায় অস্বীকৃত হয়েছিলেন।

"এত বড়লোক হইয়া ও কবি হইয়া কি কাক বিড়ালের উপর কবিতা লিখিব ?"

আপন প্রত্যয়ে তিনি যথার্থ কবি, কবিরূপেই তিনি আত্মপ্রচারিত। এ পর্যায়ে নবীনচন্দ্র আপন মানসিকতার প্রবর্তনায় গীতিকবিতাই সৃষ্টি করেছিলেন। আর এখানেই তিনি যথার্থ শিল্পরীতিসম্মতভাবে ও অকপটে আপন কবিহৃদয়টি পাঠকের সামনে বিস্তারিত করে দিয়েছেন। যদিও নিছক কাব্যরচনার জন্যই কবিতা লেখা সে যুগে অজ্ঞাত ও অবিশ্বাস্য ছিল।

দ্বিতীয় পর্বে কাব্যরচনার পশ্চাতে সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রেরণা ব্যতীত আরও বহু অভিপ্রায় তাঁকে পরিচালিত করেছে। দ্বিতীয় পর্বে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে কবি যে কাব্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে "Product of pure poetic energy unassociated with other energies"[১] বলে কোন মতেই অভিহিত করা চলে না। উপরন্তু, এখানে কবি আপন ইচ্ছাধীন হয়ে নয়, দৈব প্রেরণার বশবর্তী হয়েই কাব্যসৃষ্টিতে অবতীর্ণ।

"কি যেন এক অপরিজ্ঞাত শক্তির আবির্ভাবে আমার হৃদয় ও মস্তিষ্ক

১. Drinkwater, The Lyric, P 86

ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। কি যেন এক অচিন্তনীয় শক্তির হস্তে আমি ক্রীড়ার পুতুলের মত এই চৌদ্দ বৎসর পরিচালিত হইয়াছিলাম।"

আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষে ঐক্যের বাণী বহন করে, ঈশ্বরাদিষ্ট হয়ে, এখানে কবি মহাভারতের প্রতিষ্ঠাব্রতে আত্মনিবেদিত। অবশেষে কৃষ্ণনামামৃতপানে মুগ্ধ কবি-চিত্ত মহাভারত স্থাপনার ব্রতও বিস্মৃত হয়ে কৃষ্ণপদতরীর ধ্যানে আবিষ্ট চিত্তে কাব্য-জীবনে যবনিকা টেনেছেন। দ্বিতীয় পর্বে গীতিকবি আত্মগোপন করেছেন প্রথমে মহাকবির রাজকীয় পরিচ্ছদের অন্তরালে, পরে ভক্তকবির নির্মল-শুভ্র বহিরাবরণে। এখানে কবিকে প্রত্যাদিষ্ট-ভক্তের তিলক-নামাবলীর প্রাচুর্যের মধ্য থেকে আবিষ্কার করা কষ্টসাধ্য।

নবীনচন্দ্রের কাব্যজীবনের দুই পর্বের সন্ধিক্ষণে রচিত হয়েছে 'রঙ্গমতী' কাব্য। কবির নিসর্গবর্ণনার চমৎকারিত্বে, ভাষা ও ছন্দের সৌষ্ঠবে এই আখ্যায়িকা-কাব্যটি প্রথম পর্বের অন্তর্ভুক্ত। আবার কাব্যত্রয়ীতে যে 'ধর্মরাজ্য মহাভারত' স্থাপনার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে 'রঙ্গমতী'তে তারই অঙ্কুরিত রূপটি প্রত্যক্ষ করি।

অন্তর-বিগ্রহে, বৎস! ডুবেছে ভারত।
ইতিহাসে প্রতি ছত্রে এই বহ্নিশিখা
জ্বলিতেছে ধক্ ধক্। এই বহ্নিশিখা
দেবচক্ষে নারায়ণ দেখিলা প্রথমে।

মহাজ্ঞানী, নিবাইতে ক্ষুদ্র বহ্নিচয়
ভস্মি উপরাজ্য গ্রাম, বিচিত্র কৌশলে
জ্বালাইলা কুরুক্ষেত্রে সেই মহানল।

প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতির শোণিত-প্রবাহে
নিবিল সে মহাবহ্নি, ভারতে প্রথম
কৌরবের একছত্র হইল স্থাপন।

এই মহা অভিনয় না হইতে শেষ,
সেই দেব অভিনেতৃ, সম্বরিলা লীলা
সিন্ধু-প্রান্তে, গুপ্ত অস্ত্রে, আততায়ি-করে।

'রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস' প্রণয়নের পূর্বেই নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র ভারতে এক সাম্রাজ্য-স্থাপনার, ঐক্যপ্রতিষ্ঠার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অন্তত শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের এই অধ্যায়ের প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন

সন্দেহ নেই। 'রঙ্গমতী'-র এই অংশে তার সূত্রপাত। আর সেখানেই 'রঙ্গমতী' কাব্যে দুই পর্বের সন্ধি রচিত।

দ্বিতীয় পর্বে নবীনচন্দ্র কাব্যসৃষ্টিতে যত না আগ্রহী ছিলেন তার অধিক আকাঙ্ক্ষা ছিল আদর্শ চরিত্রসৃষ্টির। কাব্যত্রয়ীর রচনার পশ্চাতে নবীনচন্দ্রের প্রথম উদ্দেশ্য হল হিন্দুধর্মের একটি দার্শনিক ইতিহাস প্রণয়ন। 'আমার জীবন' চতুর্থ খণ্ডে দেখি, বঙ্কিমচন্দ্র একাজে নবীনচন্দ্র কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে আপন অক্ষমতা জ্ঞাপন করলে নবীনচন্দ্র নিজেই এই কার্যে ব্রতী হয়েছেন। 'শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে খণ্ডভারতে মহাভারত স্থাপন করিয়াছিলেন'—তাহা কাব্যাকারে দেখাইতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিনখানি কাব্যের প্রস্তাবনা প্রণয়ন করেছেন। ১৮৮২ থেকে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চৌদ্দ বৎসরে রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই তিনটি কাব্যই প্রধান সৃষ্টি। 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা', 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী', 'খৃষ্ট' এবং 'অমিতাভ' কাব্যত্রয়ী-রচনার অবকাশে প্রণীত।

'আমার জীবন' পঞ্চম খণ্ডে দেখি, নবীনচন্দ্র রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী-রচনায় অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন। হজরত মহম্মদের জীবনী-কাব্য প্রণয়নের অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল। এই কাব্যগুলি সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য "সকল ধর্মের মূলের অভিন্নতা প্রতিপাদন করা।"

প্রভাসের পর নবীনচন্দ্রের একমাত্র কাব্য অসম্পূর্ণ গ্রন্থ 'অমৃতাভ'। এটি শ্রীচৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে রচিত। সুতরাং 'প্রভাস' কাব্য সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি যে অনুমান করেছিলেন 'আমার কাব্যজীবন ফুরাইল,' তা যথার্থ প্রতিপন্ন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর নবীনচন্দ্রের সাহিত্যদৃষ্টিতে যে পরিবর্তনের চিহ্ন ধরা পড়েছিল, ক্রমশ তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে তা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে। অবশেষে এই মনোবিবর্তনের পথে এমন একটি স্তরে তিনি উপনীত হলেন যে, শুধু কাব্যজগৎই নয় বিশ্বজগৎ তাঁর দৃষ্টির সীমানা অতিক্রম করে গেল। তখন,—

গীত শেষ অপরাহ্লে, সন্ধ্যা আসিতেছে ধীরে!
বসি ধ্যানমগ্ন এই জীবন-প্রভাস-তীরে।
সম্মুখে অজ্ঞাত সিন্ধু, ভাসে কৃষ্ণ-পদতরী!
এই তীরে সন্ধ্যা; উষা অন্য তীরে মুগ্ধকরী!

—প্রভাস, ১৩ সর্গ

—এই উপলব্ধিতেই বিমুগ্ধচিত্ত কবি অন্য তীরের উষার প্রত্যাশায় কালক্ষেপ করেছেন।

নবীনচন্দ্রের কাব্যের প্রথম পর্বে স্বদেশপ্রেম, নারীপ্রেম কাব্যের বিষয়বস্তু। যে কোন বিষয়াশ্রিত কবিতায়ই যৌবনোচ্ছ্বাস কবিতার আশ্রয়। তাই এ পর্বে রচিত কবিতার মেজাজ ভিন্ন। সেখানে জীবনবোধে অচপল অতলতা, প্রকাশ-রীতিতে আত্মস্থ অনুশীলনের চেষ্টা দেখা যায় না। 'স্বদেশ' বলতে কখনও স্বগ্রাম ও চট্টগ্রাম, এবং বহুস্থলেই 'ভারত'। কিন্তু, এই দেশকে ভালবাসা বহুস্থলেই খাঁটি আর্যামি। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে রচিত কাব্যে যদিও নবীনচন্দ্রের কবির কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণা ও আদর্শ পরিবর্তিত, তবু দীর্ঘকালের কাব্য-অনুশীলন এবং জীবনের নানা অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি কাব্যগুলিতে অন্য ধরনের গভীরতা সঞ্চার করেছে। এ পর্বের কাব্যের মূল্যায়নও পৃথক পর্যায়ের।

প্রথম পর্ব

অবকাশরঞ্জিনী : প্রথম ভাগ

নবীনচন্দ্রের প্রথম কাব্য অবকাশরঞ্জিনী প্রথম ভাগ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। কবির আঠার থেকে তেইশ বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত এই কাব্যটিকে তিনি খণ্ডকাব্য বলে অভিহিত করেছেন। তখন গীতিকবিতা শব্দটির বহুল প্রচলন ছিল না, খণ্ড কবিতাই ব্যবহৃত হত। গ্রন্থটির প্রকাশ-কালে কবির মনে যে সন্দেহ 'এ শিশু বাঁচিবে কি না,'—তৎকালীন সাহিত্য-রসিক সমাজের সপ্রশংস অভিনন্দনে সে আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হয়। ১২৮০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যার বঙ্গদর্শনে 'অবকাশরঞ্জিনী'র সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কবির উপমা ও শব্দপ্রয়োগ-পটুতার প্রশংসা করে কবিকে—'সুকবি এবং বিশুদ্ধরুচি, যশস্বী হইবার যোগ্য'বলে অভিনন্দিত করেছেন।

যদিও প্রথম জীবনে রচিত এই কবিতাগুলি বহু সময়ই বর্তমান পরিণত সমালোচনায়, ভাবে ও আঙ্গিকে শিথিল-বিন্যস্ত এবং বক্তব্য বিষয়ও অপরিস্ফুট। প্রসঙ্গ থেকে কবির প্রসঙ্গান্তরে বিচরণ একটি নূতন ভাবের রসোত্তীর্ণ উপস্থাপনায় কদাচিৎই চরিতার্থ। তথাপি তারুণ্যের অকপট আত্মোদ্ঘাটন হৃদয়গ্রাহী ও যথার্থ কবিজনোচিত। শশাঙ্কমোহন সেন

তাঁর বঙ্গবাণী গ্রন্থে বলেন,—"স্বদেশের প্রেমে বিগলিত,—সৌন্দর্যে আত্মবিস্মৃত, ভাবুকতায় উন্মত্ত—সৌন্দর্যে সকরুণ, কৃতজ্ঞতায় নতশির এবং নীচতার প্রতি একান্ত অক্ষমাশীল নবীনচন্দ্র এ দুটি কাব্যের ছত্রে ছত্রে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন।"

কবিহৃদয়ের এই উত্তপ্ত সান্নিধ্য সার্থক গীতিকবিতার অন্তর্ভুক্তির দাবী রাখে।

প্রথম ভাগ 'অবকাশরঞ্জিনী'র কবিতাগুলি যখন রচিত হয়, তখন উপর্যুপরি পিতৃ-মাতৃশোক, আর্থিক অনটন, আত্মীয়-স্বজনের দুর্ব্যবহারে কবির মানসিক ভারসাম্য বিচলিত। তাই কাব্যেও তৎকালীন মানসিক অবস্থার প্রতিফলন দেখি। 'একটি চিন্তা' কবিতায়—'এস এস প্রিয় সখি কল্পনে! আমার' বলে আরম্ভ করে শৈশবস্মৃতির রোমন্থনে কবি উদাস হয়ে পড়েছেন,—

দেখিতাম দূর নদী রবির প্রভায়,
জন্মভূমি-কণ্ঠমূলে স্বর্ণ-রেখা প্রায়।
অতি দূরে আম্রবন, স্রোতস্বতী তটে,
চিত্রবৎ দেখাইত আকাশের পটে।

যবে রবি শোভিতেন ভূধরকুন্তলে,
কিম্বা যবে শশধর আকাশমণ্ডলে
হাসিতেন, হাসিতাম বসি নদী কূলে,
শিক্ষকের যত জ্বালা যাইতাম ভুলে।

—সুখস্মৃতির সূত্রেই ব্যক্তিগত দুঃখশোকের কথাও স্মরণ হয়েছে। অবশেষে যে 'শমিপ্রায় হৃদে অগ্নি জ্বলে নিরন্তর', তার বিশদ বিবরণ দিয়ে ঈশ্বরের চরণে আত্মনিবেদনে কবিতাটি শেষ হল। 'পিতৃহীন যুবক' 'ভগ্নাংশ বিদেশী,' 'শশাঙ্ক দূত' প্রভৃতি কবিতায় কবির ব্যক্তিগত দুঃখবেদনার কাহিনী নিতান্তই লৌকিক। আত্মসম্পর্কের সীমা অতিক্রম করে বহু সময়ই তা অলৌকিক রসের আধার হয়ে ওঠে নি। 'অবকাশরঞ্জিনী' প্রসঙ্গে 'নবীনচন্দ্রের কবিকৃতি' নিবন্ধে সুবোধরঞ্জন রায় বলেন,—"স্বকীয় উপলব্ধি-রসে সিঞ্চিত ক্ষণস্থায়ী ভাবমুহূর্তগুলিকে খণ্ড ও নাতিদীর্ঘ কবিতায় তিনি ইহাতে বিধৃত করিয়াছেন।"

উপরোক্ত কবিতাগুলিতে স্বকীয় উপলব্ধির বর্ণনা থাকলেও সেই উপলব্ধ সংবেদনা 'রস' পর্যায়ে উপনীত কদাচিৎই হতে পেরেছে। এখানে

Emotions recollected in tranquility'র অভাবে কবিতা রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি।

'অবকাশরঞ্জিনী' প্রথম ভাগের অন্য কবিতায় এবং দ্বিতীয় ভাগ 'অবকাশরঞ্জিনী'র কবিতায় এই আত্মসম্পর্ক বা Personal element-ই কবিতাগুলিকে 'সহৃদয়-হৃদয়সম্বাদী' করে তুলেছে।

'আমার জীবনে' নবীনচন্দ্র অবকাশরঞ্জিনীর স্বদেশপ্রেমাশ্রিত কবিতাগুলি সম্বন্ধে বলেছেন,—"আমি এডুকেশন গেজেটে লিখিবার পূর্বে স্মরণ হয়, স্বদেশপ্রেমের নামগন্ধ বাংলার কাব্যে কি কবিতায় ছিল না।"

কবির এই দাবী যুক্তিসংগত কি না বিচার্য।

নবযুগের প্রথম পর্যায়ে স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ দেখি Derozio'র 'To India, My Native Land' কবিতায় -

My country ! in thy glory past
A boundless halo circled round
thy brow
And worshipped as a deity thou wast
Where is that glory, where that reverence
now ?

ইংরেজী ভাষায় রচিত কবিতা ব্যতীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সেকালের সকল কবি ও সাহিত্যিকের রচনায় স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছিল। এমন কি কবি নিধুবাবুর মধ্যেও দেখি স্বদেশী ভাষার ও সাহিত্যের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধার প্রকাশে দেশপ্রেমেরই প্রেরণা। নবীনচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতার প্রাচুর্যে ও স্বাদেশিকতার ধারণায়। অধ্যায়ান্তরে আমরা এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেছি।

অবকাশরঞ্জিনীতে কবি অর্থহীন দেশাচার ও অন্ধ কুসংস্কারের অবসান কামনা করেছেন। 'চট্টগ্রামের সৌভাগ্য', 'সায়ং চিন্তা', 'মুমূর্ষু শয্যায় জনৈক বাঙ্গালী যুবক', 'মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অফ্ এডিনবরার প্রতি', 'বুড়া মঙ্গল' ইত্যাদি কবিতায় 'কুৎসিত উদ্বাহদোষ, দরিদ্রতা দাবানল, ভয়ানক তান্ত্রিকতা' প্রভৃতি অনাচারের অবসান-কামনার সঙ্গে সঙ্গে বিগত আর্যবংশ-কীর্তিচয়ের গৌরব-গাথা উচ্চারিত।

'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী', 'বিধবা কামিনী' 'আকাঙ্ক্ষা', 'প্রতিমা বিসর্জন', 'নিরাশ প্রণয়', 'বিষন্ন কমল,' 'কি লিখিব' প্রভৃতি কবিতার বিষয়বস্তু প্রেম। 'হৃদয় উচ্ছ্বাস' প্রভৃতি কবিতা ব্যর্থ প্রণয়ের স্মৃতিতে রচিত। এই শ্রেণীর অধিকাংশ কবিতাই অকৃত্রিম অনুভূতির প্রকাশে, বিষাদপূর্ণ স্মৃতিচারণায়, সহজ সাবলীল ভাষা ও ছন্দের প্রবাহে কাব্যরসের আধার হয়ে উঠেছে। হৃদয়াকূতির গভীরতায় এগুলি সার্থক গীতিকবিতার অন্তর্ভুক্ত, যদিও বর্তমান সাহিত্যরুচি এই সহজ, সাদামাটা কবিতাগুলির মধ্যে পরিশীলনের অভাব দেখে। অকৃত্রিম আত্মপ্রকাশ তবু এগুলিকে তর্কাতীতভাবে কাব্যের সনদ এনে দিয়েছিল।

অবকাশরঞ্জিনী : দ্বিতীয় ভাগ

'অবকাশরঞ্জিনী' দ্বিতীয় ভাগ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের প্রকাশে তাঁর কবিখ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন কবির বক্তব্য তাঁর আয়ত্তাধীন। আঙ্গিকেও শৈথিল্য হ্রাস পেয়েছে। বহির্জগতের বাণী মননক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শিল্পসম্মত কাব্যরূপে প্রকাশিত। প্রথম ভাগ 'অবকাশরঞ্জিনীর' উচ্ছ্বাস উদ্বেলতা দ্বিতীয় ভাগে অনেক কম। এক কথায় 'অবকাশরঞ্জিনী' দ্বিতীয় ভাগ পরিণত মনন ও কবি-প্রতিভার সৃষ্টি।

দ্বিতীয় ভাগ 'অবকাশরঞ্জিনী'তে প্রেমের কবিতার আধিক্য দৃষ্ট হয়। 'সখের গোলাপ,' 'যাই', 'প্রেমোন্মাদিনী' প্রভৃতি এই শ্রেণীর কবিতা। কবির ব্যক্তিগত অচরিতার্থ প্রেমের বিষাদ এখানে সর্বজনীন আবেদন সঞ্চারের উপযোগী। রূপসম্ভোগ-ব্যাকুলতায়, হৃদয়োচ্ছ্বাসের তীব্রতায় এই কবিতাগুলি কাব্য-গুণসমৃদ্ধ রচনা।

স্বদেশপ্রেমের প্রকাশেও কবির চিন্তাধারায় সংহতি এসেছে। কবির স্বদেশ-চেতনা ভারতের ভূখণ্ডে মাতৃভূমির প্রতিষ্ঠায় চরিতার্থ। দাসত্ব-শৃঙ্খল নবীনচন্দ্রের কাছে দুর্বহ। 'আর্যরক্তে আর্যাবর্ত ভাসায়ে আবার' স্বদেশ ও স্বজাতি স্বাধীনতা ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হোক—এ পর্যায়ের কবিতাগুলি রচনার সময় নবীনচন্দ্রের এই ছিল আন্তরিক কামনা।

'অনন্ত দুঃখ', '৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত', 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' ইত্যাদি কবিতা সমসাময়িক বিষয়াশ্রিত। প্রথম কবিতা দুটি যথাক্রমে দীনবন্ধু ও মধুসূদনের তিরোধান উপলক্ষে রচিত। কবি 'ভুবনমোহিনী প্রতিভায়' নারী জাগৃতিকে অভিনন্দিত করেছেন। শক্তিস্বরূপিনী নারীর কাছে তাঁর প্রার্থনা,—

শক্তিস্বরূপিনী তুমি—আয়ুধ-কল্পনা।
ভারতের মর্মস্থলে পশুক তোমার
সুতীক্ষ্ণ কল্পনা-বাণ,
ব্যথিত করুক প্রাণ,—
... ...
ব্যথায় ভারতবাসী,—আর্যের সন্তান,
চরণে দলিত শির করিবে উত্থান।

সমাজজীবনের মধ্যে যে অনাচার, বক-ধার্মিকতা কখনও প্রাচীণত্বের, কখনও প্রগতির অজুহাতে লালিত হয়েছিল, তীব্র বিদ্রূপে অথবা স্মিত পরিহাসে নবীনচন্দ্র তাদের লাঞ্ছিত করেছেন 'চিহ্নিত সুহৃদ', 'বাঙ্গালীর বিষপান' প্রভৃতি কবিতায়। ললিত কাব্যছন্দে, তাত্ত্বিকতার দ্যোতনায় অম্লমধুর তিরস্কার বাক্য আরও মর্মভেদী।—

ওই আকাশের নীলিমা মতন,
দুঃখই জীবন-স্থিতি ও বিস্তার;
সুখ যাহা বল, বিদ্যুৎ যেমন,
বাড়ায় দ্বিগুণ নীলিমা তাহার।
... ...
ব্রাণ্ডি,—ব্রাণ্ডি বিনে, কিছু নাহি আর
অধীনতা-দুঃখ করিতে বিনাশ,
চিত্তে স্বাধীনতা করিতে সঞ্চার;
মহৌষধি এই ব্রাণ্ডির গেলাস!

এখানে দার্শনিকতার অবতারণায়, স্বীকৃতির ছদ্মবেশে ব্যঙ্গবাণ আরও মর্মান্তিক।

নাগরিক সভ্য জীবনের কৃত্রিম চাকচিক্য ও প্রাণহীনতা বন্য ও অনাগরিক এবং সহজ-স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রতি নবীনচন্দ্র আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'জুমিয়া-জীবন' কবিতায় দেখি অসভ্য পার্বত্য জাতির অনাড়ম্বর, সাবলীল গতি ও জীবনপ্রবাহ কবিকে মুগ্ধ করেছে। সেই সহজ স্বাভাবিক অরণ্য-পরিবেশে

কবি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে উন্মুখ। বন্য জীবনের প্রতি তাঁর এই আগ্রহ শুধুমাত্র সে জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার প্রয়াসেই ব্যক্ত নয়; প্রকৃতির দুলাল নবীনচন্দ্র জুমিয়া যুবকের সঙ্গে জীবনবিনিময়েও প্রস্তুত।—

ইচ্ছা হয়, হায়, ওই জুমিয়ার সনে
বিনিময় করি এই বাঙ্গালী-জীবন;

—এই ইচ্ছা কবির একান্তই আন্তরিক।

'ক্লিওপেট্রা' ও 'ভারত উচ্ছ্বাস' প্রথমে পৃথক পৃথক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পরে 'অবকাশরঞ্জিনী' দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থভুক্ত হয়েছে।

নারীর প্রতি নবীনচন্দ্রের সম্ভ্রমপূর্ণ মনোভাব থেকেই তাঁর সৃষ্ট নারী-চরিত্রগুলি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়েছে। সেই রক্ষণশীলতার যুগেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একাধিক নারীর প্রতি অনুরাগ পোষণ করতেন। অথচ লঘুচাপল্যের প্রকাশে কখনও তাঁর সেই অনুরাগ অসম্মানিত হয় নি। নারীর প্রতি সহজ সম্ভ্রমে নত কবি অনুরাগিণী নারীকে তার আপন মর্যাদায়ই অধিষ্ঠিত রেখেছিলেন। তাই 'ক্লিওপেট্রা' বিপথগামিনী নারীরূপে সমকালীন অন্য লেখকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হলেও তার গভীর মর্মবেদনা, তার লাঞ্ছনা, তার অদৃষ্ট-বিড়ম্বনা নবীনচন্দ্রের সহৃদয়তার স্পর্শে করুণ রসাশ্রিত কাব্যরূপ লাভ করেছে। 'ক্লিওপেট্রা' কালীপ্রসন্ন ঘোষের দৃষ্টিতে কামিনী-কলঙ্ক। তিনি—"সাম্রাজ্যলোভে লুব্ধ হইয়া প্রেমের বরিশ লইয়া খেলা করিয়াছেন, এবং প্রতি উদ্যমে মণিমুক্তা ও রাজমুকুট লইয়া মাথায় পরিয়াছেন। অথবা তাঁহার প্রেম সাড়ম্বর মৃগয়াস্বরূপ।"

নবীনচন্দ্রের ক্লিওপেট্রার সগর্ব উক্তি,—

"প্রণয়ের তরে
বিসর্জিয়া কুল আমি পেয়েছিনু যারে;
কুল তুচ্ছ, প্রাণ দিয়া তোরা অভাগিনী
না পাইয়া তারে, আজি তোরা গরবিনী,
পোড়া পরিণয়-বলে? পরিণয়-বলে
জীবলোকে তোরা নাহি পাইলি যাহারে,
দেখিব অমর লোকে, পরিণয়-বলে
তারে রাখিবি কেমনে।"

নবীনচন্দ্রের সহানুভূতির স্পর্শে যে ক্লিওপেট্রার চরিত্রায়ণ তা তাঁকে কামিনী-কলঙ্ক বলে প্রমাণিত করে না। প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির 'পরে তাঁর আস্থা, তাঁর সর্বপ্লাবী প্রেম তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডিকে আরও দুঃসহ এবং মর্মান্তিক করে তুলেছে। কবি-হৃদয়ের সংবেদনশীলতার স্পর্শে তাই ক্লিওপেট্রা কবিতাটি শুধু হৃদয়গ্রাহী নয়, অনন্যসাধারণ।

'অবকাশরঞ্জিনী' প্রথম ভাগ নবীনচন্দ্রের মতে 'বোধ হয়, বঙ্গভাষায় এরূপ ভাবের প্রথম খণ্ডকাব্য'। স্বদেশপ্রেমের পথ প্রদর্শনের মতো খণ্ডকাব্যের পথিকৃৎরূপেও তাঁর দাবী অযথার্থ সন্দেহ নেই। ঈশ্বর গুপ্ত এবং তাঁর অনুগামী কবিসম্প্রদায়, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র তাঁর পূর্বে খণ্ডকবিতা রচনা করেছেন। তথাপি নবীনচন্দ্রের উক্তির অন্তর্নিহিত সত্যতা এই যে,—'এরূপ ভাবের প্রথম খণ্ডকাব্য' হল অবকাশরঞ্জিনী। এখানে আধুনিক বাংলাগীতি কবিতার সঙ্গে আপন কবিতার নিকট-সাদৃশ্যটি তিনি অনুভব করেছিলেন। আধুনিক গীতিকাব্যের অন্তর্মুখীনতা, অনির্দেশ্য বেদনাবোধ, ব্যর্থজীবনের বঞ্চনার জ্বালা নবীনচন্দ্রের কাব্যেও প্রকটিত। তাই ভাবের দিক থেকে তাঁর খণ্ডকাব্যে নূতনত্ব ছিল। নবীনচন্দ্রের কাব্যে নব্যদৃষ্টির সূচনা 'অবকাশ-রঞ্জিনী'তে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত, এবং তাঁর উপরোক্ত দাবী অংশত স্বীকৃত হওয়া উচিত।

পলাশির যুদ্ধ

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন এবং সেকালের অত্যন্ত জনপ্রিয় কাব্য। 'নবীনচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কাব্য'—বললে তার প্রতি সম্পূর্ণ সুবিচার হয় না। বাংলাদেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামে গ্রন্থটির ছিল উল্লেখ্য ভূমিকা। সমসময়ের স্বদেশপ্রেমিক বাঙালীর হৃৎসিংহাসনে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল এই গ্রন্থের। 'পলাশির যুদ্ধে'র বহু অংশ এখনও তাঁদের অনেকেরই কণ্ঠস্থ, অন্তরস্থ।

কাব্যের পাণ্ডুলিপি পাঠ করে একদা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতীতি হয়েছিল, "next, if at all, to Meghnad."

পলাশির যুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের সর্বপ্রধান কাব্য—অবশ্য; পরবর্তীকালের বঙ্কিম-সমালোচনা নবীনচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। সে প্রসঙ্গ অন্যত্র

আলোচ্য। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, 'পলাশির যুদ্ধ' 'মেঘনাদবধের' পরবর্তীকালে রচিত কাব্যসমূহের মধ্যে সর্বাধিক চৌম্বক-শক্তি-সম্পন্ন। বাঙালী পাঠকসমাজ এ কাব্য পাঠ করে মুগ্ধ, অভিভূত এবং আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। শুধুমাত্র জনপ্রিয়তার কথা বাদ দিলেও স্বদেশপ্রেমের শিল্প-সম্মত বাণীরূপ হিসাবে এ কাব্য নূতনের বার্তাবাহক।

নূতনত্বের প্রসঙ্গ কাব্যটির মধ্যেই উত্থাপিত ও উচ্চারিত। কবির অভিলাষ 'বঙ্গইতিহাস মণিপূর্ণ খনির' মধ্যে প্রবেশ করে,

গাঁথিয়া মালা অবিদ্ধরতনে
দোলাইব মাতৃভাষা কম কলেবরে,
সজ্জিত যে বরবপু।

যে পথে কোন কবির পদচিহ্ন পড়ে নি, সে পথের পথিকৃৎ কবি নবীনচন্দ্র সেন। সদ্যোবিগত কালের ইতিহাস তাঁর উপজীব্য।

অন্য কারণেও 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের অনন্যসাধারণতা প্রমাণযোগ্য। প্রত্যক্ষ স্বদেশপ্রেম—সুস্পষ্ট পরাধীনতার বেদনা এ কাব্যেই প্রথম ঘোষিত, প্রকাশিত। যে যুগে রাজভক্তি ও স্বদেশপ্রীতি পরস্পর-বিরোধী উপাদান বলে মনে করা হত, নবীনচন্দ্র সে যুগের একজন প্রতিষ্ঠিত রাজকর্মচারী হয়েও 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের রচয়িতা। এই বৈপরীত্যের সমাবেশেই কাব্যটিও নবীনচন্দ্রের জীবনে বিষামৃতের আধার হ'য়ে উঠেছিল।

সে যুগের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ। যুগলক্ষণ রূপেই চিহ্নিত। স্বদেশ-প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আলোচিত হয়েছে বহু পূর্বে, রামনিধি গুপ্ত ও ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যেই। নবীনচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য তার প্রত্যক্ষতা ও দ্বিধাহীনতা। তাঁর পূর্ববর্তী কবিরা কেউই সাহস করে লিখতে পারেন নি—

দেখিছ না সর্বনাশ সম্মুখে তোমার?
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর?

ইংরেজের প্রতিষ্ঠায় সর্বনাশ—এ মন্তব্য করার মত মনোবল, মতান্তরে হঠকারিতা পূর্বে দেখা যায় নি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে কাব্যটি প্রায় শাস্ত্রগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছিল—এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। 'গীতা' 'আনন্দমঠ', 'পলাশির যুদ্ধ' ছিল স্বাধীনতাসংগ্রামী সৈনিকের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। প্রসঙ্গত, অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের—যিনি নবীনচন্দ্রের অন্যতম কঠোর সমালোচক—(সম্পাদিত 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস'-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য) মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে, "তিনি (নবীনচন্দ্র) পরিণত বয়সে মহাকাব্যাদি লিখিয়া ভক্তিনত চিত্তের পরিচয় দিতে চাহিলেও লোকে তাঁহাকে পলাশির যুদ্ধের কবি রূপেই সম্মান দিয়াছে।"

অনেক পাঠক ও সমালোচকের মতে পলাশির যুদ্ধ কাব্যগুণের দিক থেকেও নবীন-রচনাবলীতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার।

'পলাশির যুদ্ধ' গ্রন্থ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হলেও কাব্য রচনার সূত্রপাত ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে। কবির বয়স তখন সতেরোর নীচে; তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। কবির আত্মজীবনীতে পাই,—"গ্রীষ্মের বন্ধে দাদার অনুরোধে আমি ও ষষ্ঠী রামপুর-বোয়ালিয়া চলিলাম। পথে আমাদের একজন সঙ্গী দূরে পলাশির মাঠ দেখাইয়া যুদ্ধের অনেক অপূর্ব অনৈতিহাসিক গল্প বলিলেন। এখানে পলাশির যুদ্ধের অঙ্কুরপাত হইল।" অর্থাৎ এ সময়ে পলাশির যুদ্ধ ঘটনাটি তাঁর অন্তরকে নাড়া দিয়েছে। এটি কাব্যাকারে রূপ পেয়েছে আরও চার বৎসর পরে। তিনি তখন যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এক জাগরণক্লান্ত রাত্রির অবসানে 'পলাশির যুদ্ধ' একটি দীর্ঘ কবিতারূপে আত্মপ্রকাশ করল। অবশ্য পাঁচ সর্গে বিভক্ত রোমান্টিক গাথা-কাব্যরূপে গ্রন্থপ্রকাশ আরও পরের ঘটনা। নানা গুণগ্রাহী বন্ধুর অনুরোধে ও আন্তর প্রেরণায় 'পলাশির যুদ্ধ' পরিবর্তিত ও দীর্ঘায়িত রূপ লাভ করেছিল। রচনা সমাপ্তি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে; কিন্তু নানাবিধ বিঘ্ন-প্রমাদের পর তা গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করল ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে।

কাহিনী ও ভাবসূত্রে গ্রথিত, পঞ্চাঙ্ক নাটকের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং গীতি-মাধুর্যস্নিগ্ধ এ কাব্যের পাণ্ডুলিপি পাঠ করেই নবীনচন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্র একদা লিখেছিলেন একটি পত্রে, "সমালোচনায় সময় তিনি প্রমাণিত করিবেন যে

পলাশির যুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের সর্বপ্রধান কাব্য, next if at all to Meghnad." নবীনচন্দ্রের আত্মজীবনী 'আমার জীবন' পাঠে জানা যায়, গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই 'বঙ্গসাহিত্যজগতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল'। আত্মাদরপরায়ণ কবির আত্মশ্লাঘার প্রমাণ নয় এ উক্তি। যথার্থই হুলস্থূল পড়েছিল দেশ জুড়ে। সমকালীন পত্র-পত্রিকার সমালোচনা, সাহিত্যিক কবি মনীষীর আন্তরিক অভিনন্দন রাতারাতি কবিকে পৌঁছে দিয়েছিল খ্যাতির শীর্ষদেশে। এ যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা সুকুমার সেন এ তথ্য দিয়েছেন, "সে-সময়ের খুব কম কাব্যই পলাশির যুদ্ধের মত অত শীঘ্র সমাদৃত হইয়াছিল।"

কাব্যটির দ্রুত জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রমাণ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে প্রকাশিত উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকে পলাশির যুদ্ধ কাব্য থেকে গৃহীত উদ্ধৃতি-বিন্যাস। পরে স্বয়ং নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র নবীনচন্দ্র-রচিত পলাশির যুদ্ধের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন এবং ক্লাইভের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি নিজেই। নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবনে' এ ঘটনার উল্লেখ পাই। তবে নবীনচন্দ্র-পরিবেশিত তথ্যে সামান্য কালগত বিচ্যুতি আছে। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে স্মৃতির উপর ফরমাশ করে যে আত্মজীবনী রচিত তাতে এ জাতীয় ছোটখাট ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক।

'আমার জীবনে' নবীনচন্দ্র লিখেছেন, পলাশির যুদ্ধ প্রকাশিত হওয়া মাত্র "ন্যাশনেল থিয়েটারে অভিনীত হয়। সে অভিনয়ে শুনিয়াছি, খ্যাতনামা অভিনেতা ও নাট্যরচয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ ক্লাইভের অভিনয় করিয়া প্রথম খ্যাতিলাভ করেন।"

১৮৭৫-এর এপ্রিলে প্রকাশিত পলাশির যুদ্ধ কাব্যটি অবলম্বনে সেকালে প্রসিদ্ধ 'দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার' একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন ঐ বৎসরেরই সেপ্টেম্বরে। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস-প্রণেতা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার'ই পরবর্তীকালে ন্যাশনেল থিয়েটার নাম গ্রহণ করেছিল। এ পর্যন্ত নবীনচন্দ্রের পরিবেশিত তথ্যে কোন ভুল নেই। তবে পলাশির যুদ্ধ নাটকে ক্লাইভের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অবতরণ আরও দুই বৎসর পরের ঘটনা—"১৮৭৭ সালে ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালনভার গ্রহণ করতঃ গিরিশচন্দ্র 'মেঘনাদ-বধ' অভিনয়ের (১লা ডিসেম্বর ১৮৭৭) পরই নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধে'র নাট্যরূপ দেন এবং

এই জানুয়ারী ১৮৭৮ তারিখে উহা মঞ্চস্থ করিয়া ক্লাইভের ভূমিকায় স্বয়ং অবতীর্ণ হন।"

কবিকৃত সামান্য কালগত ত্রুটির একমাত্র কারণ এ সব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে লোকশ্রুতির উপর নির্ভর করে। কলিকাতার জনজীবন থেকে দূরে তিনি মফস্বল শহরে শহরে সরকারী কাজে ঘুরছিলেন। 'শুনিয়াছি'—এ-টুকুই তাঁর সম্বল ছিল।

নবীনচন্দ্রের আত্মজীবনীতে দেখি 'পলাশির যুদ্ধ' গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিমের যে আবেগ উচ্ছ্বাস ছিল, গ্রন্থ প্রকাশের পর তা অপসৃত। মধুসূদনের পরিত্যক্ত সিংহাসনের উত্তরাধিকার হেমচন্দ্রের—বঙ্কিমচন্দ্র এ অভিমত প্রকাশ করলেন এবং নবীনচন্দ্রকে জানালেন, "It is unfortunate Hem should have made his debut before you.—তোমার দুর্ভাগ্য যে, হেম তোমার পূর্বেই আসরে নামিয়াছেন।"

বঙ্কিম-সমালোচনার এই দিক-পরিবর্তনে নবীনচন্দ্রের অভিমান, ক্ষোভ গোপন থাকে নি। যদিও কাব্যসাম্রাজ্যে নবীনকবির একচ্ছত্র অধিকার বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করলেন না, তবু নবীনের বঙ্গসাহিত্যজগতে আবির্ভাবকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন আন্তরিকভাবে। ১২৮২ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা বঙ্গদর্শনে যথোচিত সমালোচনা ও ভূয়সী প্রশংসার পর লিখলেন, "কবিদিগের মধ্যে আমরা নবীনবাবুকে অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি না পারি তাহাকে বাঙ্গলার বাইরণ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি।" এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নহে। পলাশির যুদ্ধ যে বাঙ্গলার সাহিত্যভাণ্ডারে একটি বহুমূল্য রত্ন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নবীনকে 'বিষয়-নির্বাচনে সৌভাগ্যশালী' বললেন না।

সে যুগে বহুখ্যাত পত্র-পত্রিকাসমূহে, যেমন—'সাধারণী', 'বান্ধব', 'আর্যদর্শন' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সমালোচকবৃন্দও কাব্যটি পাঠ করে যে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন তার সম্পূর্ণ আলোচনার জন্য পৃথক গ্রন্থের প্রয়োজন। পলাশির যুদ্ধ কাব্যের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে আরও একজন প্রাজ্ঞ সমালোচক বিষয়নির্বাচনে কবির সুবিবেচনার অভাব দেখেছিলেন। পলাশির যুদ্ধ কাব্য সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র অভিমত—"There can be no true epic except on a theme of national

glory."—(The Bengal Magazine, P. 282)—হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারে এই 'national glory'র সন্ধান ছিল দধীচির আত্মদানে। লালবিহারী দে লিখলেন,—"We trust the writer will do justice to his powers, which are considerable by trying his hand at another epic on grander and more popular subject."

বক্তব্যের তাৎপর্য অনুধাবনীয়। পলাশির যুদ্ধ মহাকাব্যই হত, যদি না হত বাঙালীর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী-নির্ভর। মহাকাব্য-রচনার কোন অভিপ্রায় এযাবৎ নবীনচন্দ্রের ছিল না। তবু মহাকাব্য রচনা না করেও তিনি মহাকবিতুল্য প্রতিভার অধিকারী রূপে সমকালে স্বীকৃত হয়ে গেলেন প্রথম যৌবনে রচিত কাব্য পলাশির যুদ্ধের জন্য।

প্রশংসার দাক্ষিণ্যে সবাইকে অতিক্রম করলেন মনীষী রাজনারায়ণ বসু এই বলে—"কোন কোন সাহিত্য-রসাভিজ্ঞ ব্যক্তি নবীনচন্দ্র সেনকে এক্ষণকার সর্বাপেক্ষা প্রধান কবি বলিয়া গণ্য করেন।"

অনুমান করতে বাধা নেই, স্বয়ং লেখক এই ব্যক্তিদের অন্যতম। যখন রাজনারায়ণ এ মন্তব্য করেছেন তখন মধুসূদনের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটেছে। বিহারীলাল ও হেমচন্দ্র কবিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। নবীনচন্দ্রের এই উচ্ছ্বসিত সম্বর্ধনা একালে আমাদের বিস্মিত করে।

কারণটা খুঁজে পেলেন বহুকাল পরে বাংলা সাহিত্যের বিবেকী সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার।—"মেঘনাদ-বধের পর, ইহাই (পলাশির যুদ্ধ) স্বতন্ত্র আকারে ও নূতন ভঙ্গীতে সম্পূর্ণ ইংরেজী আদর্শে রচিত দ্বিতীয় বাংলা কাব্য।" বঙ্কিমের প্রত্যাহৃত স্বীকৃতি সমকালের ও তৎপরবর্তীকালের সমালোচকদের হাত থেকে নবীনচন্দ্র পেয়েছিলেন।—মধু-অনুবর্তী কবিদের মধ্যে নবীনচন্দ্রই শ্রেষ্ঠ,—নূতনের অগ্রদূত, বৈচিত্র্যের স্রষ্টা।

নবীনচন্দ্রের নয়, বাঙালী জাতির স্বদেশপ্রীতি এ যুগে ঠিক কতখানি পরিণতি পেয়েছিল, স্বদেশের জন্য কি সম্পদ অপরিহার্য মনে হয়েছিল, তার পরিচয় পেলাম পলাশির যুদ্ধ কাব্যে। শিক্ষা নয় সমাজ নয়, ধর্মের বেদী নয়—স্বাধীনতাকেই চাই। ইংরেজের কবল থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছে বাঙালী কবির ও বাঙালী জাতির অন্তরে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেই। যদিও প্রত্যক্ষ কর্মে তার ঘোষণা বেশ

কিছুকাল পরে। রেনেসাঁসের যুগে শিক্ষিত ও স্বদেশপ্রেমিক বাঙালী পাঠক হৃত-স্বাধীনতার জন্য প্রথম অশ্রুমোচন করলেন এ কাব্য পাঠ করেই। মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্যে পরাধীনতা-জনিত মনোবেদনা ঘোষিত রাবণকণ্ঠে। হেমচন্দ্র শত্রুকবলিত ভারতকে উপস্থাপিত করেছেন বেনামে। যবনপীড়িত ভারতের মুখোশের আড়ালে লুকিয়েছিল ইংরেজ শাসন-শৃঙ্খলিত মাতৃভূমি। দীনবন্ধু মিত্র ইংরেজের বর্বর শাসনপদ্ধতিকে নগ্নভাবে প্রকাশ করেছেন 'নীলদর্পণ' নাটকে। কিন্তু তাঁর প্রচারধর্মী কোলাহলের সঙ্গে পলাশির যুদ্ধ কাব্যের কাব্যরসাশ্রিত স্বদেশপ্রেমের প্রকাশসৌন্দর্যের পার্থক্য যথেষ্ট।

পলাশির যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলা ও ভারতের ভাগ্য একসূত্রে গ্রথিত। সিরাজের পরাজয় ও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতির দুরদৃষ্টের সূচনা :

সিরাজের ছিন্নমুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন।
নিবিল গৃহের দীপ ; নিবিল তখন
ভারতের শেষ আশা, হইল স্বপন !

জগতের সমস্ত উল্লেখযোগ্য শিল্প-সাহিত্যস্রষ্টার মতোই পলাশির যুদ্ধ একাধারে নবীন কবিকে অপরিমেয় যশ ও সম্মান এবং নিন্দা-তিরস্কার এনে দিয়েছিল। সমসাময়িক স্বদেশপ্রেমিক ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'সিরাজ চরিত্রে অযথা কলঙ্ক লেপনের জন্য' তীক্ষ্ণ ভাষায় নবীনচন্দ্রকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। নবীনচন্দ্রের এই ইতিহাস-নির্ভর কাব্যটিতে নিষ্ঠার সঙ্গে ইতিহাস অনুসন্ধান ও রচনা হয় নি। আত্মজীবনী 'আমার জীবনে' কবি তার জন্য 'শো কজ' করেছেন,—"তিনি লিখিয়াছেন ইতিহাস, আমি লিখিয়াছি কাব্য।"

নবীনচন্দ্রকে সমর্থন করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ১৩০১-এর শ্রাবণ-সংখ্যা ভারতীতে, "ইতিহাস-ভারতীর উদ্যানে চঞ্চলা কাব্যসরস্বতী পুষ্পচয়ন করিয়া বিচিত্র ইচ্ছানুসারে তাহার অপরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, প্রহরী অক্ষয় বাবু সেটা কোনমতেই সহ্য করিতে পারেন না - কিন্তু মহারানীর খাস হুকুম আছে।"

পলাশির যুদ্ধে ঐতিহাসিক তথ্যগত বিচ্যুতি আছে। নবীনচন্দ্রের কবি-কর্মের মূল্যায়নে সেটাই বড় কথা নয়। এ যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নবীনচন্দ্রকেই সমর্থন জানিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন তাঁর বহুখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে—"The Bengali poet Babu Nabin Chandra Sen in his masterpiece 'The Battle of Plassey' has washed away the follies and crimes of Siraj by artfully drawing forth his readers' tears for fallen greatness and blited youth."—*History of Bengal, Vol. II, Sri Jadunath Sarkar, Page 477.*

কবির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, স্বদেশপ্রীতির প্রকাশ শাসককুলের মনঃপূত হয় নি। তাই এ কৃতকর্মের ফল সারাজীবন ধরে ভোগ করতে হয়েছিল তাঁকে। 'আমার জীবনে' দেখি, 'ক্লাইভ পলাশির যুদ্ধ দ্বারা ভারতরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, আর আমি পলাশির যুদ্ধের দ্বারা ভারতরাজ্য ধ্বংসকারী বলিয়া রাজপুরুষের কাছে পরিচিত।"

উপরোক্ত গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে 'নিষ্কাম হিংসা ও রাজদ্রোহিতা', 'লাটের ক্রোধ' অধ্যায়ে কবির দুর্গতি-ভোগের ইতিহাস আছে। ইংরেজ শাসন-কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের রাজদ্রোহিতার চিহ্ন রূপে অভিহিত অংশগুলি লুপ্ত বা পরিবর্তিত হয়েছে পরবর্তী সংস্করণে। আবার প্রয়োজন হল 'যবন' শব্দের আড়াল। তবু প্রথম যৌবনে রচিত পলাশির যুদ্ধের জন্য সারাজীবনই লাঞ্ছনা জুটেছিল কপালে। অবশেষে কুড়ি বৎসর পর পদোন্নতির অন্তরায় হল এ কাব্য। সরকারী নির্দেশ "After consideration of the reports received regarding the work of Babu Nabin Chandra Sen, the Lieutenant Governor did not consider him deserving of advancement to the first grade."

নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনচিত্ততাই ছিল এর কারণ, কর্মটি (the work) হল 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য রচনা। 'আমার জীবনে' এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

বিদেশী শাসকের সঙ্গে স্বদেশীয় সমালোচকও অভিযোগ এনেছিলেন রাজদ্রোহের। প্রশ্ন এল,—"পলাশির যুদ্ধে মুসলমান বাঙ্গালা হারাইল; হিন্দুর তাহাতে উচ্ছ্বাস কিসের ও কেন?...মোহনলালের মুখে এরূপ আক্ষেপোক্তি দিয়া তুমি কি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি disloyalty দেখাও নাই?"

কৌতুকজনক ব্যাপার! একই গ্রন্থের জন্য বিভিন্ন প্রতিকূল সমালোচনায় কত অসংগতি! ঐ পলাশির যুদ্ধ কাব্যে নবীনচন্দ্রের 'ইংরেজ তোষণের চেষ্টা' দেখে—'হেম নবীনের সংকীর্ণ স্বাজাত্যবুদ্ধির কলঙ্কে'র প্রমাণ পেয়ে এ যুগের জনৈক সমালোচক অভিমত প্রকাশ করলেন—'অবশ্যম্ভাবী যুগপ্রভাবে স্বার্থবুদ্ধি তাঁকে ইংরেজ তোষণে বাধ্য করল। ইতিহাস জ্ঞানের অপূর্ণতায় চরিত্র নির্মাণের দৃষ্টি খণ্ডিত হল।'

একই কাব্য রচনার জন্য ঐতিহাসিকের দেশদ্রোহের জন্য তিরস্কার, রাজদ্রোহের অভিযোগ আবার সাম্প্রদায়িকতা ও চাটুকারিতার জন্য নিন্দায় যে পরস্পরবিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়, তাতে কবির নয় সমালোচকের পক্ষপাতী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রমাণিত। এ জাতীয় সমালোচনার মানদণ্ডে নবীন-কাব্যের মূল্যায়ন যে অনুচিত তাতে সন্দেহ থাকে না।

নবীনচন্দ্রের জীবনের যে পর্বে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য রচনা করেছিলেন, তখন বিশুদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টিই ছিল তাঁর অভীপ্সিত। দেশের পরাধীনতায় কবির বেদনাবোধ ছিল কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা। রাজদ্রোহ নয়, দেশদ্রোহ নয়, ইতিহাসরচনা নয়, সমাজসেবা নয়; হৃত-স্বাধীনতার স্মরণে অশ্রুবিসর্জন 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য রচনার উদ্দেশ্য। অখণ্ড মানবতার উপাসক নবীনচন্দ্রের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ খণ্ডনের জন্য অজস্র যুক্তি আছে। খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, মোহম্মদকে তিনি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন—কবিজীবনের শেষ অধ্যায়ে। অবশ্য মোহম্মদকে নিয়ে কাব্য রচনা করেন নি, কারণ তার পূর্বেই পরজগতের ডাক এসেছিল তাঁর কাছে।

পলাশির যুদ্ধ কাব্যের আকর্ষণ ছিল বিষয়বস্তুর অভিনবতা। নূতনত্ব, বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য কবির কাব্যমধ্যে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়েছিল; সমসাময়িক সমালোচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়।—"তিনি যে পথে গমন করিয়াছেন, সে পথে কেহই তাঁহার পূর্বে পাদক্রম করেন নাই। তিনি যে 'মণিপূর্ণ খনিতে' সাহস সহকারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে কেহই তাঁহার জন্য অলোকবর্তিকা স্থাপন করেন নাই।"

অনাস্বাদিতপূর্ব কাব্যরসের আধার এ গ্রন্থটি অলোকিক আনন্দ-সৌন্দর্যের সন্ধান দিয়েছিল তাঁদের।—"ইহাতে যাহা কিছু আছে, তাহা পাঠ করিবার

সময় হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে উছলিয়া উঠে এবং কল্পনা অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান হয়।"

মাত্র কিছু বেশী একশ বছর আগের একটি আপাত-তাৎপর্যহীন ঘটনাকে উপজীব্য করে একটি দেশের জাতির জীবনের ষড়যন্ত্র-বিশ্বাসঘাতকতা, দুঃখ-অপমান-পতন, আত্মোৎসর্গের, আত্মনিবেদনের কাহিনী যে আবেগতপ্ত ভাষায় ও নাটকীয় রীতিতে রচিত সে যুগে তার তুলনা ছিল না। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠকসমাজ সবিস্ময়ে সবেদনায় এবং সহর্ষে অভিনন্দিত করেছিলেন কবিকে।

পাঁচটি সর্গে বিভক্ত 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যকে মহাকাব্য-পরিচিতি দানের কোন অভিপ্রায় নবীনচন্দ্রের ছিল না। তাই কি কাহিনী, কি চরিত্র--বিন্যাসে মহাকাব্যিক গাম্ভীর্য ও বিস্তারের অনুসন্ধান করেন নি। এটি একটি ঐতিহাসিক গাথাকাব্য—metrical romance। একদিকে স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, ক্লাইভের উচ্চাশা ও দ্বিধা, হিন্দু-মুসলমানের সীমাবদ্ধ শৌর্য-বীর্য প্রকাশ, লুৎফুন্নেসার পতিপ্রেম, মীরজাফর-মীরনের লোভ-কপটতা-নিষ্ঠুরতা কাহিনী-কাব্যটিকে নাটকীয় গতিসম্পন্ন করেছে। একদিকে নাটক, অন্যদিকে গীতরসের অবতারণায় কাব্যটি অসাধারণ। বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে 'বর্ণনায় মন্ত্রসিদ্ধ' বলেছেন। এই বর্ণনার আশ্রয়েই নাটকের চমকসৃষ্টি। পলাশির যুদ্ধের পাঁচটি সর্গে কবির জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পঞ্চাঙ্ক নাটকের রীতি অনুসৃত। প্রথম সর্গের ষড়যন্ত্র-সভা থেকে পঞ্চম সর্গে ঘাতকের শাণিত খড়্গে সিরাজের মৃত্যু পর্যন্ত নাটকীয় ঘটনাবলী সাবলীলভাবে প্রবহমান। ক্লাইভের অন্তর্দ্বন্দ্বে, ব্রিটানিয়া দেবীর আবির্ভাবে, সিরাজের ভ্রান্তিদর্শনে নাট্যরস চমৎকার ভাবে দানা বেঁধে উঠেছে। মোহনলালের স্বগতোক্তিতে, সিরাজের পতনদৃশ্যে নাট্যধর্ম অটুট। তবু পুরোদস্তুর নাটক হল না। কারণ—"নাট্যবোধ নবীনচন্দ্রের প্রকৃতিগত নহে, তাই নাট্যোপযোগী আবহ-রচনায় তাঁহার আগ্রহ কম।"

নবীনচন্দ্র মূলতই গীতিকবি·· আর আর সমস্ত বাঙালী কবির মতোই। নাটক বাঙালী জীবনে দুর্লভ। তাই নাট্যবোধও দুর্লভ। তবু বিষয়বস্তুর আনুকূল্য ত' ছিলই; যে নাটক রচনার কথা নবীনচন্দ্র সমস্ত জীবন ভেবেছেন—তারই প্রেরণায় সৃষ্ট হয়েছে গীতরসধারার মধ্যে নাটকের

চমক। নাটকীয় মুহূর্ত ও পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁর সহজাত দক্ষতা ছিল। উপরন্তু গীতিকাব্যের স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তিতে পলাশির যুদ্ধ হয়ে উঠল মর্মস্পর্শী, হৃদয়-সম্বাদী।

নাটকীয়তার পাশাপাশি গীতিকবিতার ভাব রসমাধুর্যের প্রকাশ, কবির বেদনাবিক্ষুব্ধ হৃদয়ের উদ্ঘাটন কাব্যটিকে অসাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। কাব্যে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে, বিশেষ ভাবের প্রকাশক কয়েকটি গান কবি রেখেছেন। তাদের অস্তিত্বের উপযোগিতা সম্বন্ধে কোন কোন সমালোচক প্রশ্ন তুললেও কবির কাছে এ জাতীয় সঙ্গীতবিন্যাস অপরিহার্য মনে হয়েছিল। সঙ্গীতের এই উপস্থিতি পাশ্চাত্ত্য কাব্যের প্রভাবজাত। বিশেষত স্কটের কাব্যের অনুপ্রেরণা থাকা স্বাভাবিক। আত্মগতভাবের উচ্ছ্বসিত প্রকাশে, বিরহমিলনের প্রসঙ্গে কবির সংবেদনশীলতায় গীতিকবি নবীনচন্দ্রেরই আত্মঘোষণা। যে দুঃসহ বেদনার মধ্যে কাব্যটির সমাপ্তি, যে সামান্য বর্ণনায় দু-চারটি সাধারণ শব্দের প্রয়োগে শ্বাসরোধী পরিণামহীন পরাজয়গ্লানি ও মৃত্যুর দৃশ্যের মধ্যে যবনিকাপাত হল, সেখানেই গীতি-কাব্যের অন্তর্মুখীন আবেদনে পলাশির যুদ্ধ কাব্যের রসোত্তীর্ণতা।

নিসর্গরূপমুগ্ধ কবি জাতির জীবনের এক সংকটময় মুহূর্তের উপস্থাপনায় পটভূমিতে রাখলেন প্রকৃতিকে। পলাশির যুদ্ধ কাব্যটির সূত্রপাতেই 'দ্বিতীয় প্রহর নিশি, নীরব অবনী ; / নিবিড় জলদাবৃত গগনমণ্ডল'—ভারতের অদৃষ্টাকাশে যে দুর্ভাগ্যের মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল, তারই প্রতীক উপস্থাপনা। আবার দ্বিতীয় সর্গে ব্রিটিশ শিবিরে ক্লাইভের আশা-উদ্দীপনার পরিবেশে—

'খচিত সুবর্ণমেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে, নীচে নাচিছে রঙ্গিনী···
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিনী।'

চতুর্থ সর্গে নবাবপক্ষের পরাজয় ও মোহনলালের পতনের ঘটনা। প্রকৃতিরও পটপরিবর্তন হল। রক্তাক্ত কলেবর সূর্যের দিনান্ত ঘোষণায় যুগান্তরের দ্যোতনা,—

'মূর্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর,
শোণিত-আরক্ত কায় ;

অস্ত গেল রবি হায়।
অস্ত গেল যবনের গৌরবভাস্কর।

পঞ্চম সর্গে সিরাজের মৃত্যু হল 'গভীর নিশীথে', যখন—'হিংস্র জন্তুরাও বনে বিবরে নিদ্রিত।' কারাগারে 'দুর্বল প্রদীপালোকে' যখন ঘাতকের খড়্গে ছিন্ন হল 'ভারতের শেষ আশা' প্রকৃতি তখন নিজেকে দূরে অন্তরালে সঙ্কুচিত করে নিয়েছে। মানুষের পাপলিপ্সা ও নৃশংসতারই একচ্ছত্র আধিপত্য সূচনা হচ্ছে পরিণামহীন ভবিষ্যতের। পলাশির যুদ্ধে প্রকৃতি ও মানুষ—উভয়ের উপস্থিতি, উপলব্ধির মধ্যে রচিত হল বিশ্বাসঘাতকতা, পরাজয়-বেদনার ইতিহাসাশ্রিত কাব্য।

নবীনচন্দ্রের পলাশির যুদ্ধ কাব্যকে বায়রণের Childe Harold's Pilgrimage-এর প্রভাবপুষ্ট বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁকে 'বাংলার বায়রণ' শিরোপা দিয়েছিলেন। বায়রণের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের সাধর্ম্য-সাদৃশ্য থাকতে পারে। তাঁর কাব্যকে বায়রণের কাব্যের অনুকরণ বললে কবির প্রতি সুবিচার হয় না। বঙ্কিমের অভিপ্রায়ও তা ছিল না। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রথম অধ্যায়ে এ ছিল দেশের প্রথা। বাঙালী খ্যাতনামা সাহিত্যিক কবিরা প্রতিভাশালী পাশ্চাত্ত্য কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে উপমিত হতেন। বঙ্কিম ছিলেন বাংলার 'স্কট', মধুসূদন 'মিলটন', হেমচন্দ্র 'পিণ্ডার' আর নবীন সেন বাংলার 'বায়রণ'। পরবর্তীকালে হেম-নবীনের কাব্যের মূল্যায়ন-প্রয়াসে তাঁদের শুধু এ উল্লেখটুকু কোন কোন সমালোচককে সন্তুষ্ট করল না; তাঁরা হুবহু 'আক্ষরিক অনুবাদে'র সীলমোহর দিয়ে কবিকৃতিকে তুচ্ছ করতেও প্রয়াসী হলেন।

কিন্তু বায়রণ ও নবীনচন্দ্রের মধ্যে সাদৃশ্যের মতোই পার্থক্যও ছিল যথেষ্ট। তাহা অধ্যয়নশীল রসিক সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায় নি। বায়রণ বায়রণই। নবীনচন্দ্র হলেন নবীনচন্দ্রই।—"ইহা (পলাশির যুদ্ধ) হৃদয়রূপ জীবন্ত প্রস্রবণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। এবং ইহাতে প্রত্যেক কবিতা ও প্রত্যেক পঙক্তিতেই সজীবতার পরিচয় রহিয়াছে। আমরা ইহাকে বায়রণের কোন কাব্যের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু বায়রণের কবিতায় যে দৃকপাতশূন্য বন্যভাব এবং যে অদ্ভুত মাদকতা আছে ইহাতেও অনেক স্থলে

তাহার অনুরূপ পদার্থ পরিলক্ষিত হয়। কোন কৃত্রিম কবি কদাপি 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্য প্রণয়নে সমর্থ হইত না।"

উভয় কবির মধ্যে প্রকৃতিগত কিছু সাদৃশ্য-সাধর্ম্য দেখা যায়। বায়রণের মতোই নবীনচন্দ্র ছিলেন man of impulses and temperament (The Poetical Works of Lord Byron)। বায়রণের কাব্যের প্রতি নবীনচন্দ্রের পক্ষপাতের কোন দৃষ্টান্ত তাঁর আত্মজীবনীতে পাওয়া যায় না। সাধারণ ভাবেই সেই যুগে শেক্সপীয়র, মিলটন, বায়রণ ছিলেন ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালীর প্রিয় কবি। বায়রণ-প্রীতি উনবিংশ শতকের অধিকাংশেরই সাধারণ লক্ষণ। নবীনচন্দ্রও তার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু কাব্যের সাদৃশ্যের বা অনুকরণের প্রসঙ্গে বিচারশীলতা প্রয়োজন। নবীনচন্দ্রের কাব্যে বায়রণের ভাব ও ভঙ্গী অনুকৃত নয়। পলাশির যুদ্ধের মতো কাব্য, যার মধ্যে একটি জাতির ও কবির নিজস্ব হৃদয়বেদনার আত্যন্তিক প্রকাশ, সেটি কবির হৃদয়শোণিতেই রঞ্জিত, প্রতিফলিত আলোকের ব্যঞ্জনা নয়।

শেক্সপীয়র ও মিলটনের কাব্যের কিছু বর্ণনা, চিত্রকল্প পলাশির যুদ্ধে সাঙ্গীকৃত হয়েছে। প্রথম সর্গে ষড়যন্ত্র-সভার বর্ণনায় Milton-এর The Paradise Lost-এর Pandemonium-এ Council of the rebel angels-এর কথা স্মরণ করায়। Richard The Third-এর তৃতীয় অঙ্কে পঞ্চম দৃশ্যের সঙ্গে সিরাজের স্বপ্নদর্শন তুলনা করা চলে। পলাশির যুদ্ধ স্পেনসরীয় স্তবকবিন্যাস ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যপাঠের ফল এবং বাংলায় নূতন ছন্দ-ঐশ্বর্য সংযোজনের ইচ্ছার প্রকাশ। এ ছাড়াও এ কাব্য থেকে বহু অংশ উদ্ধৃত করা যায় যার মধ্যে ইংরেজী সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক নবীনচন্দ্রকে চিনে নেওয়া সহজ। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সন্নিহিতি-সংস্পর্শে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি। নবীনচন্দ্রেও এরই উপস্থিতি।

রঙ্গমতী

পলাশির যুদ্ধ কাব্যের অসাধারণ সমাদর দেখে নবীনচন্দ্র গীতিকাব্য নয়, দেশপ্রেমাশ্রিত আখ্যায়িকা-কাব্যকেই আত্মপ্রকাশের মাধ্যম বলে গ্রহণ করলেন। এ উদ্দেশ্যে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দেই সূত্রপাত হল 'রঙ্গমতী' কাব্যের। রঙ্গমতীর প্রথম সর্গ রচনার পর, কবি স্থির করলেন,—"কেবল কল্পনার চক্ষে

নহে, চর্মচক্ষেও 'রঙ্গমতী' দেখিয়া কাব্যখনির অবশিষ্টাংশ লিখিব।" এ কাব্যের পটভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজধানী, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়া রঙ্গমতী বা রাঙামাটি। কাব্যরচনার অন্যতম প্রেরণা ছিল কবির জন্মভূমি অরণ্যপর্বতময়ী চট্টোলার সৌন্দর্যসম্ভোগে সৌন্দর্যবর্ণনা। কবির সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিভিন্ন পারিবারিক এবং কর্মসংক্রান্ত জটিলতায় কাব্যরচনার উপযোগী শান্তসুন্দর পরিবেশ পরিমণ্ডল থেকে তিনি ছিলেন বহুদূরে। অবশেষে কিছু পরিমাণ মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেয়ে কাব্যটির রচনা সমাপ্ত হল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

নবীনচন্দ্রের কাব্যজীবনের পূর্বোল্লিখিত দুই পর্বের সন্ধিক্ষণে 'রঙ্গমতী' রচিত; এ পর্যায়ে বিশুদ্ধ কাব্যরস-সৃষ্টি এবং সৌন্দর্যলোকে স্থিতির জন্যে কবি লেখনী ধরেন নি। জাতীয় আদর্শ প্রচার ও অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা উজ্জীবিত করেছিল কবি-কল্পনা।

রঙ্গমতীতে কবির স্বাজাত্যাভিমান শিবাজীর হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে, বীরেন্দ্রর বাহুবলের আশ্রয়ে হিন্দু শৌর্যবীর্যের প্রতিষ্ঠায় তৃপ্ত হল। রঙ্গমতীতেই নবীনচন্দ্র গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন,—

ভারতসন্তান
এত দীর্ঘ শিক্ষাপরে শিখিল না আজি,
জাতিত্বের মহামন্ত্র সর্বশক্তিমূল
একতা!

বহু জাতি, ধর্ম, প্রদেশ ও ভাষায় বিভক্ত ভারতবর্ষে সর্ববিধ খণ্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা দূর করে একজাতীয়তার আদর্শ প্রতিষ্ঠাই ছিল নবীনচন্দ্রের প্রৌঢ় জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। রঙ্গমতীতে শিবাজীর সংকল্পে সংগ্রামের রূপায়ণে কবির আপন স্বপ্নের সার্থকতার পথ অন্বেষণ। শুধু শিবাজীই নয়, শ্রীকৃষ্ণের মহাভারত-স্থাপনের আদর্শে বহুধা বিচ্ছিন্ন ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা—একজাতীয়তার প্রতিষ্ঠার বাসনায় কবি ব্যাকুল হয়েছিলেম এই কালেই।—

সমগ্র ভারতবর্ষ আসমুদ্র গিরি,
'জয় মা ভবানি' বলি উঠিবে গর্জিয়া?

রঙ্গমতী কাব্যে এমন কিছু অংশ আছে যা সামান্য পরিবর্তিত হয়ে 'রৈবতকে' পরবর্তীকালে গৃহীত হয়েছে। যেমন রঙ্গমতীর শিবাজীর আক্ষেপোক্তি,—

বীরেন্দ্র শিবাজী
দস্যু, শিবাজী তস্কর ....
আর্যের সন্তান মোরা হায়! আমাদের
অদৃষ্টে দস্যুত্বলিপি লিখিলা বিধাতা!
আর ঐ নৃশংসয় দস্যুর সন্তান,
পিতৃদ্বেষী, ভ্রাতৃহন্তা, পাপী আরঙ্গজীব,
আজি সে ভারতপতি দিল্লীর ঈশ্বর।

শিবাজীর এ খেদোক্তির সঙ্গে রৈবতকে অর্জুনের প্রতি নাগরাজের তিরস্কারের পার্থক্য সামান্যই। ভারতের আদি অধিবাসী অনার্য নাগজাতিকে নির্মূল করে আর্যসভ্যতার প্রতিষ্ঠা কবির কাছে একটি জাতির স্বাধীনতা হরণের মত অন্যায় কাজ মনে হয়েছিল, তাঁর কৃষ্ণার্জুনপ্রীতি সত্বেও। নাগরাজের তীক্ষ্ণ ভৎসনায় ধ্বনিত হয়েছে পরাধীন দেশের কবির অন্তর্জ্বালার প্রতিধ্বনি,—

নাগরাজ চন্দ্রচূড়, তস্কর সে আজি।
হা বিধাতঃ! ইহাও কি অদৃষ্টে তাহার
লিখেছিলে? নাগরাজ! তস্কর সে আজি!
তাহার সাম্রাজ্যধন করিয়া হরণ
ইন্দ্রপ্রস্থে ইন্দ্রমুখে বিহরে যাহারা
সাধু তারা—নাগরাজ তস্কর সে আজি!

উভয় ক্ষেত্রেই পরাধীন ভারতের কবির লেখনী করেছে পরোক্ষ ভাষণে ইংরেজ শাসনের স্বরূপবর্ণনা।

নবীনচন্দ্রের রঙ্গমতী কাব্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন,—"এ সকল কাব্য কবিগণের প্রচ্ছন্ন আত্মজীবন। নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ঘাতপ্রতিঘাতময় জীবনকেই যেন উচ্ছ্বাসময় কাব্যরূপের ভিতর দিয়া কবিগণ আলোচনা করিতে চাহিয়াছেন।"

রঙ্গমতী কাব্যে বীরেন্দ্রের জীবনে নবীনচন্দ্রের আপন জীবনেরই প্রতিবিম্ব

পড়েছে। বীরেন্দ্রের শৈশবস্মৃতি-বর্ণনায় নবীনচন্দ্রের বাল্য-কৈশোর-স্মৃতিচারণা। বীরেন্দ্রর মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা, কুলদেবীর প্রতি একান্ত আন্তরিক ভক্তি, স্বদেশ প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত প্রেমাবেগ নবীনচন্দ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। নবীন-কবির বাল্যপ্রণয়িনী কুসুমিকার অনুরাগের রঙেই বীরেন্দ্র-প্রিয়তমা কুসুমিকার ছবিটি আঁকা। সেই তীব্র প্রেমাবেগ, পরিশেষে নিদারুণ ব্যর্থতাই এ কাহিনী-কাব্যের উপকরণ। এ কাহিনী-কাব্য পরিপুষ্ট হয়েছে কবির ব্যক্তিজীবনের অনুভূতি-উপলব্ধির গভীর তলদেশ থেকে রসগ্রহণ করেই। 'রঙ্গমতী' কাব্য ব্যক্তিহৃদয়ের, জীবনের স্পর্শে সজীব ও উজ্জ্বল।

'রঙ্গমতী' কাব্যে যে ত্রুটি শৈথিল্য আছে তারও প্রধান কারণ ব্যক্তিগত আবেগের মাত্রাহীন প্রকাশ। Personal element এর মধ্যে নির্বাধ প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। সে সময় কবির জীবনে যে অশান্তি, যে মানসিক অস্থিরতা ছিল, কাব্যটির মধ্যেও তা অনেক ক্ষেত্রেই কাহিনী ও ভাবের গ্রন্থিবন্ধনে জটিলতা, শিথিলতা এনেছে। কবি নিজেই বলেছেন সে কথা—"ইহার প্রত্যেক সর্গে, প্রত্যেক পৃষ্ঠায়, প্রত্যেক অক্ষরে আমাদের বিপদের স্মৃতি, রোগের যন্ত্রণা, বিষাদের ছায়া এবং শোকের অশ্রু জড়িত রহিয়াছে। 'রঙ্গমতী' আমার জীবনের একটি বিষাদপূর্ণ অঙ্কের ইতিহাস।"

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্ব-সম্পাদিত 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' কাব্যত্রয়ের ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন,—রচনা-ভঙ্গিমায় মাইকেল মধুসূদনের প্রভাব সত্ত্বেও কাব্য-পরিকল্পনার মূলে অসঙ্গতি ও রোমান্টিক অসংযমের অতিরেকের জন্য 'রঙ্গমতী' পরিণত মনের কাব্য হইতে পারে নাই। এ সমস্ত দোষত্রুটির কারণ খুঁজে পাওয়া যায় 'আমার জীবনে'। অনুমান করা কঠিন নয়, কবির জীবন ও মনের ভারসাম্যহীন অবস্থায় 'রঙ্গমতী'র রচনা!

নবীনচন্দ্র 'রঙ্গমতী' কাব্য উৎসর্গ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। কবির দাবী, বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের প্রেরণা পেয়েছেন রঙ্গমতী থেকে।—"বরাবর যেরূপ তাঁহাকে লিখিতাম এবারও লিখি যে ইংরাজী রীতিরে ছায়া ছাড়িয়া, তিনি যেন দেশভক্তি, পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃভগ্নীপ্রেম—যাহা রামায়ণ-মহাভারতের শিক্ষা এবং আমাদের জাতিগত লক্ষণ—লইয়া নূতন উপন্যাসটি রচনা

করেন। তিনি তদুত্তরে লেখেন, তিনি এবার আমার অনুরোধ রক্ষা করিতেছেন। এই নূতন উপন্যাসটি ঠিক রঙ্গমতীর পথে যাইতেছে—'it follows exactly the lines of your Rangamati'—এবং রঙ্গমতীর দরুণ তাহার কয়েক অধ্যায় তাঁহাকে পরিবর্তন করিতে হইতেছে। উহাই 'আনন্দমঠ'।"

আত্মশ্লাঘাপরায়ণ কবির অত্যুক্তির মধ্যে এ সত্যটুকু অন্ততঃ স্বীকার্য যে যুগপ্রয়োজন এবং জাতীয় প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেই নবীনচন্দ্র রঙ্গমতীতে স্বদেশপ্রেমের যে উদ্বোধন-সঙ্গীত গেয়েছেন কালানুক্রমিক ইতিহাসের বিচারে তা 'আনন্দমঠে'র পূর্ববর্তী; যদিও বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় ভাবনার উদ্বোধন হয়েছে এর বহুপূর্বে।

নবীন কবির প্রথম 'যৌবনোল্লাসের অধ্যাত্ম প্রতিকৃতি' 'রঙ্গমতী' কাব্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাব্যজীবনের এক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হল।

দ্বিতীয় পর্ব

রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস

কাব্যজীবনের দ্বিতীয় পর্বে রচিত রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস নবীনচন্দ্রের সর্বাধিক পরিচিত ও আলোচিত গ্রন্থ। এখানেই আবির্ভাব হল কবি নবীনের নির্মোক ত্যাগ করে মহাভারতের স্রষ্টা, নব হিন্দুধর্মের প্রবর্তক নবীনচন্দ্রের। অবশ্যই এ পর্যায়ে কাব্যের যে গতিপরিবর্তন হল, তা আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত ও অতীতের সঙ্গে সংযোগ-বিহীন নয়। কবির মানস পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই কাব্য তিনটি রচিত।

জীবনের এ পর্যায়ে সমাজে, সংসারে, অন্তরে বিভিন্নমুখী দ্বন্দ্ব ও জটিলতায় বিভ্রান্ত কবি শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় নিয়েছেন। অনুভব করেছেন এখানেই ঘটবে সকল বাসনার নিবৃত্তিতে সব দুঃখের অবসান। বাসনার অর্থ আত্ম-সুখলাভের বাসনা। স্বদেশের হিতচিন্তা ও মানবজাতির কল্যাণকামনায় রচনা করেছেন এক বিরাট-কলেবর কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য। রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসে গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ ও লোকসংস্থিতির আদর্শকে পাশ্চাত্ত্য প্রত্যক্ষবাদ ও হিতবাদের অনুগত করে মহাভারতীয় কাহিনীর আধারে যে

রূপ দান করলেন, তদানীন্তন বহু জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় উন্নতির পথনির্দেশ ছিল সেখানেই।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পুরীতে নবীনচন্দ্রের চিত্তে যে কৃষ্ণভক্তির উন্মেষ, ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণের লীলাভূমি বিহারে অবস্থানকালে তা স্পষ্ট, সুসম্বদ্ধ রূপ গ্রহণ করেছিল।

পূর্বে কবি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেছিলেন। বিহারে মহাভারত অধ্যয়ন করে শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও চরিত্র কবিমানসে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কবি উপলব্ধি করলেন,—'অন্তর্বিদ্বেষে ও অন্তর্বিদ্রোহে খণ্ডিত ভারতের আত্মহত্যা নিবারণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ভারতে যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই নাম মহাভারত। বুঝিলাম মহাভারত মহাভারত-সাম্রাজ্য (The great Indian Empire) …… এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি তাঁহার গীতোক্ত অনাসক্ত বা নিষ্কামধর্ম …… বুঝিলাম, তিনি এবং তাঁহার শ্রীমুখের গীতোক্ত ধর্ম ভিন্ন আমাদের উদ্ধারের আশা নাই।'

কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণমহিমার উপলব্ধি ছিল কবির অর্জিত বা ঈশ্বরদত্ত, কৃপালব্ধ সম্পদ। এই ব্যক্তিহৃদয়ের উপলব্ধিই তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল পূর্ণমানব শ্রীকৃষ্ণের জীবনে স্বদেশ ও স্বজাতির মুক্তির পথ অনুসন্ধানে। শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শ প্রচার করেন। অর্জুন সে আদর্শের অনুপ্রেরণায় ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কার বিধান করেছিলেন, নব্য যুগেও তাঁরই পন্থার অনুবৃত্তিতে দেশের যথার্থ কল্যাণ।—নবীনচন্দ্রের এ বাণী বহন করেই রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের আত্মপ্রকাশ।

রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস নবীনচন্দ্রের এই কাব্যত্রয়ী বা triology রচনার উদ্দেশ্য ছিল ত্রিবিধ। প্রথমত—

এক ধর্ম, এক জাতি,
এক রাজ্য, এক নীতি,
সকলের এক ভিত্তি—সর্বভূত হিত ;

তারই পরিণাম—"কবির নিশ্চিত ওই ধর্মরাজ্য মহাভারত স্থাপিত। দ্বিতীয়, তার মনে হয়েছিল কোরাণ বা বাইবেলের মত সমস্ত জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য হিন্দুধর্মের একটি দার্শনিক ইতিহাস প্রণয়ন আশু প্রয়োজন। অন্যথায় মহাভারত-স্থাপনার কাজ ব্যাহত হবে।

তৃতীয়ত, কৃষ্ণলীলার অনুধ্যান। 'আমার জীবন' পঞ্চম খণ্ডে 'প্রভাস' অধ্যায়ে ও অন্যত্র নবীনচন্দ্র কাব্যত্রয়ীকে প্রত্যাদিষ্ট রচনা বলেছেন। মঙ্গল-কাব্যরচয়িতা কবিদের মত ইষ্টদেবতা ধ্যানে অথবা স্বপ্নে তাঁকে নির্দেশ দেন নি সত্য কিন্তু এক 'অচিন্তনীয় শক্তির' পরিচালনায় নবীন-কবির রৈবতক-কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের সৃষ্টি। অবশেষে প্রভাসে শেষোক্ত উদ্দেশ্যই প্রধান হয়ে উঠেছে। কবি 'ভক্তিতে অধীর হইয়া' কৃষ্ণনাম-সুধা পানে আবিষ্ট চিত্তে কাব্যজীবনের উপর যবনিকা টেনেছেন। যদিও পদ্যে কয়েকটি জীবনী এর পর রচিত হয়েছিল।

নবীনচন্দ্র যে যুগে রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস রচনা করেছেন, সে যুগ হিন্দু-ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগ। খ্রীষ্টধর্মপ্রচার তখন স্তিমিত। আভ্যন্তরীণ দলাদলিতে ব্রাহ্মধর্মের জনপ্রিয়তা হ্রাসপ্রাপ্ত। এ সময়ে তাই জনসাধারণ ও শিক্ষিত সমাজ হিন্দুধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি নূতন করে মনোযোগ দিলেন। এদিকে ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের কিছু মানুষের মনে কৌতূহল উদ্রেক হল। রাজনারায়ণ বসু যথোচিত উদ্যম সহকারে প্রমাণ করলেন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব। হিন্দুধর্ম ও সাধকদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন মনীষী ম্যাক্সমূলার। ভক্তশ্রেষ্ঠ কেশবচন্দ্র জানালেন শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বীকৃতি। 'প্রচার' ও 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র এবং কেশবভক্ত গৌরগোবিন্দ রায় শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও দর্শনের আলোচনা করে শিক্ষিত জনমানসে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। নবসংস্কৃত হিন্দুধর্মের রাজ্যাভিষেক-অনুষ্ঠানে নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের অর্ঘ্য নিয়ে।

১৩০০ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা 'নব্যভারতে' কুরুক্ষেত্র-কাব্যের সমালোচনায় 'কৃষ্ণচরিত্রের মৌলিক পরিকল্পনায় নবীনবাবু সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমবাবুর নিকট ঋণী' এই অভিমত প্রকাশিত হলে, নবীনচন্দ্র সম্পাদককে এক পত্রে সুস্পষ্টভাবে লিখেছিলেন—'রৈবতক-কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে আমি বঙ্কিমবাবুর নিকট ঋণী নহি।'—ঐ পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বিশেষ উদ্ধৃতি সহযোগে নবীনের অগ্রাধিকার দাবীর সমর্থন করেন। সমসাময়িক বিদ্বৎ-জনের বিচারে অধমর্ণত্বের অখ্যাতি থেকে নবীনচন্দ্র মুক্ত হলেও পরবর্তীকালের গবেষণায় নবীনচন্দ্রের তো বটেই এমন কি গৌরগোবিন্দ রায়েরও পূর্বসূরীরূপে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকৃত। বাংলা ১২৮১ সালের চৈত্রে—১৮৭৫

খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' নামক একটি পুস্তক সমালোচনার অংশবিশেষ এখানে সাক্ষ্যরূপে হাজির করা যায়। 'কৃষ্ণ অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ্—সাম্রাজ্যের গঠন বিশ্লেষণে বিধাতৃতুল্য কৃতকার্য—সেইজন্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া কল্পিত। ..শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে এই সসাগরা ভারত একচ্ছত্রাধীন না হইলে ভারতের শান্তি নাই।'

আজ পর্যন্ত কৃষ্ণচরিত্রের নবরূপায়ণ-উদ্যোগের যত নিদর্শন পাওয়া গেছে তার মধ্যে এ সমালোচনাটি কালানুক্রমে প্রথম স্থানের দাবীদার।

এ সত্ত্বেও কৃষ্ণচরিত্রের নবরূপায়ণে নবীনচন্দ্র বঙ্কিমের কাছে ঋণী ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় প্রথম লিখিত প্রমাণপত্র হাজির করে 'ত্রয়ী' কাব্যের রচনা-পরিকল্পনায় বঙ্কিম-মনীষার উপচ্ছায়ার অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার্য নয়। পূর্বের অধ্যায়েই উল্লিখিত হয়েছে, জীবনের পর্বে পর্বে নানা ঘটনায়, নানা পরিবেশে নবীন জীবনে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। মহাভারতীয় অনুপ্রেরণার সংক্রমণ। আন্তর উপলব্ধির প্রেরণায় শাক্তবংশের সন্তান, শৈশবে তান্ত্রিক কুলগুরুর কাছে দীক্ষিত নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করেছেন। এখানে মানবহিতবাদ প্রমুখ দার্শনিক মতের প্রতিফলন যুগ-প্রভাব মাত্র। সমকালীন অন্যান্য বহু কবি-সাহিত্যিকের মত নবীনচন্দ্রও এ মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র আলোচনায় নবীনের পূর্বগামী হলেও এর দ্বারা নবীনের অধমর্ণত্ব প্রমাণ করা যায় না।

'আমার জীবন' তৃতীয় ভাগে 'শ্রীশ্রীজগন্নাথের নবযৌবনের মেলা' ও 'শ্রীক্ষেত্রের রথযাত্রা' অধ্যায়ে কি ভাবে দেববিগ্রহকে স্পর্শ করে, শতসহস্র যাত্রীর ভক্তি-উচ্ছ্বাস দর্শনে তিনি নিজেও ভক্তি-প্রেমের বন্যায় ভেসে গিয়েছেন তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, অবশেষে—'আমার হৃদয়ে একটি নূতন সর্গ খুলিয়া গেল, এবং সেখানেই রৈবতক-কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস অঙ্কুরিত হইল।'

অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে নবীনচন্দ্রের ঋণস্বীকারের কোন প্রশ্নই ওঠে না। বঙ্কিমচন্দ্র বিচারবুদ্ধি, বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে কৃষ্ণচরিত্র রচনা করলেন, তিনি সর্বগুণান্বিত, সর্বপাপস্পর্শশূন্য, আদর্শমানব। ঐতিহাসিক তথ্যের সমর্থনপুষ্ট এই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের ধ্যানলব্ধ, ভক্তিরসধারায় অভিসিঞ্চিত—মহামানব, ষড়ৈশ্বর্যময়, মাধুর্যময়, প্রেমময়, ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের সাদৃশ্য নেই।

এ প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের বিচার (সাধনা, ১৩০১ মাঘ, কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা) উল্লেখযোগ্য। 'বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রে পদে পদে যুক্তি বিচার উপস্থিত হইয়া আসল কৃষ্ণচরিত্রটিকে পাঠকের হৃদয়ে অখণ্ডভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধা দিয়াছে।'

নবীনচন্দ্রের কৃতিত্ব পাঠকের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড রূপের প্রতিষ্ঠায়। কবি কোন বাইরের প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে নয়, নিজের জীবনে ও মননে শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বকে সত্যভাবে লাভ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ ও তাঁর চরণাশ্রয় একটি যুগের জন্য নয়, যুগে যুগে সর্বমানবের গ্রহণযোগ্য। কবি যে ভক্তিরস পান করে নিজে মুগ্ধ, আবিষ্ট, পাঠককেও তার অংশীদার করতে আগ্রহী হয়েছেন কাব্যত্রয়ীতে। আর এ কারণেই সমসাময়িক সমালোচক (নব্যভারত, ১৩০০, চৈত্র কুরুক্ষেত্র কাব্যের সমালোচনা) নবীনের শ্রেষ্ঠত্বের সপক্ষে লিখেছিলেন,—'ধর্মতত্ত্ব লিখিয়া বঙ্কিমবাবু ও কর্মতত্ত্ব লিখিয়া ভূদেববাবু যত কারুকার্য প্রদর্শন করুন না কেন, হৃদয়তত্ত্বে রমেশবাবু ও নবীনবাবু শ্রেষ্ঠ।'

এই হার্দাগুণের উপস্থিতিতেই নবীনচন্দ্র অগ্রণী এবং বিশিষ্ট; যদিও বঙ্কিমের কৃষ্ণবিষয়ক প্রবন্ধ 'রঙ্গমতীর'ও পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল।

নবীনচন্দ্রের রৈবতক-কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস যথাক্রমে ১৮৮৭, ১৮৯৩ এবং ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। চিরাচরিত নিয়মে বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের জন্য কবির ভাগ্যে জুটেছিল অজস্র প্রশংসা এবং নিন্দা। বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র অক্ষয়কুমার সরকার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ সমকালীন বিদ্বৎ-ও রসিক-সমাজ অভিনব মহাভারতীয় পরিকল্পনা পাঠ করে মুগ্ধ, উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। বিশেষত ঈশানচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, গুরুদাস ও হীরেন্দ্রনাথ ছিলেন 'নবীন'-কাব্যের বিশেষভাবে গুণমুগ্ধ পাঠক। কেউ বা স্পষ্টভাবে রায় দিয়েছিলেন— মধুসূদনের পরবর্তী কবিসম্রাট—নবীনচন্দ্রই। "The question whether Nobin or Hemchandra is entitled to occupy the throne left vacant by Madhusudan will, I think, now be settled once for all,.... It is my best opinion that by your present work, you have distanced all competitors."—আমার জীবন।

রৈবতকের রচনা এই রাজসম্মানের হেতু। রৈবতক রচনা ও প্রকাশের

সঙ্গে সঙ্গে একজন চিন্তাশীল, পরমার্থপরায়ণ কবিরূপে নবীনচন্দ্রের সমাদর ও বিশেষ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

নবীনচন্দ্রের কবিশক্তির পূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয় 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য লীলা কাহিনী অবলম্বনে রচিত তাঁহার রৈবতক-কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস—এই তিনখানি কাব্যে। এগুলিতে বিরাট কবিকল্পনার সঙ্গে দার্শনিকতা ও বর্ণনা নৈপুণ্যের যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে, তাহা বিস্ময়কর। এই কাব্যত্রয়ীতে নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে হিন্দু অধ্যাত্মদর্শনের জটিল তত্ত্ব রূপান্তরিত হইয়াছে উপভোগ্য রসবস্তুতে।' —সাহিত্য সাধক চরিতমালা, নবীনচন্দ্র সেন, পৃ ২৩-২৪।

প্রশংসার বিপরীতে নিন্দাও হয়েছিল প্রচুর। বীরেশ্বর পাঁড়ে দুই শতাধিক পৃষ্ঠার 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' গ্রন্থে যে সমালোচনা করেছিলেন, সেখানে কাব্যত্রয়ীর মূল বক্তব্য অশ্রদ্ধেয়, অনৈতিহাসিক এবং কতকাংশে দুরভিসন্ধিপূর্ণ বলে প্রমাণের চেষ্টা লক্ষণীয়। এখানে ব্যঙ্গে, বিদ্রূপে, অসত্য কটুভাষণে নবীনচন্দ্রের এই মহত্তম কাব্যের নিন্দিত লাঞ্ছনার যে প্রয়াস, তা সম্পূর্ণ ঈর্ষাপ্রসূত এবং যথার্থই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল, সন্দেহ নেই। বীরেশ্বর পাঁড়ের অভিমত (উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত পৃঃ ২৪৯) —"কবি অকারণ পূর্বপুরুষগণের ও কবিগণের নিন্দা করিয়াছেন, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের বিলোপসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, আপনাকে হিন্দু নামে পরিচিত করিয়া তাঁহার কল্পিত কৃষ্ণ ও ব্যাসের দোহাই দিয়া অহিন্দু মত প্রচার করিতেছেন—যে মত প্রচারিত হইলে, হিন্দুর অস্তিত্ব থাকিবে না তাহাকে ব্যাসের ও কৃষ্ণের মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।"

১২৯৪ বঙ্গাব্দের পৌষ-সংখ্যা ভারতীতে রৈবতক কাব্যের সমালোচনায় ও নবীনচন্দ্রের মহাভারতের বাসনাবিরোধী ভাষ্যের নিন্দা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বেই কাব্য তিনটির প্রস্তাবনা পাঠ করে ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন। ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি বা বিচ্যুতির আতিশয্যে সাধারণ পাঠকসমাজকে বিরূপ করে তোলা স্বাভাবিক। নবীনচন্দ্রের মহাভারতের কয়েকটি প্রধান প্রতিপাদ্য বক্তব্য ইতিহাসানুসারী তো নয়ই বরং হিন্দুসমাজের শতাব্দী-লালিত সংস্কারের বিপরীত। বঙ্কিম লিখলেন,—Krishna preached, if he preached anything,

devotion to the Brahmans. It is against all tradition and written knowledge to set him up against the Brahmans. But the modern poet is of course welcome to give a new character to Krishna, which this chapter does.—আমার জীবন

কৃষ্ণের নবচরিত্রায়ন, নবমূল্যায়নের প্রয়োজন বঙ্কিম স্বীকার করেছিলেন – কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি অনাস্থা তাঁর মনঃপূত হয় নি।

পৌরাণিক কৃষ্ণ যথার্থতঃ ব্রাহ্মণ-শক্তির বিরোধী ছিলেন না। গীতাতেই তিনি অর্জুনকে বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা বলেছেন। তাঁরই উক্তি—চাতুর্বর্ণং ময়াসৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ, ৪।১৩ এবং—

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥

—শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা, ১৭।১৪

পৌরাণিক কৃষ্ণের বুকে ছিল ব্রাহ্মণ ভৃগুর পদচিহ্ন।

কাব্যত্রয়ীতে নবীনচন্দ্র দুর্বাসা প্রমুখ ব্রাহ্মণ সমাজের রাজনৈতিক ক্ষমতা-লিপ্সায় অনার্যজাতির সহায়তায় ক্ষত্রিয় সমাজের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রের বিবরণ দেন তা একান্তভাবেই কবির স্বকপোলকল্পিত। এখানে কৃষ্ণার্জুন সহ সমগ্র ক্ষত্রিয় সমাজের ধ্বংসসাধনই ছিল দুর্বাসা ও তাঁর অনুচরদের ধ্যানজ্ঞান, অভীষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ এই কপটাচারী ব্রাহ্মণসমাজের বিরোধী। তিনি ব্রাহ্মণের অত্যাচারে অনাচারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বলেছেন –

·· নাহি কি হে কেহ,—
ব্রাহ্মণ রহস্যারণ্যে করিয়া প্রবেশ,
আপন বিবরে সর্প ধরি মন্ত্রবলে,
তাহার এ বিষদন্ত করে উৎপাটন?

—রৈবতক, প্রথম সর্গ

কাব্যত্রয়ীতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান কারণ দুর্বাসা-বাসুকির ষড়যন্ত্র। গৌণ কারণ—দুর্যোধনের হিংসা, কৌরব-পাণ্ডব বিরোধ। এখানে ব্রাহ্মণ-সমাজে অধর্মের অভ্যুত্থানের জন্যেই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ—পাপীর বিনাশ ও সাধুর পরিত্রাণ এষণায়। অবশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবল ভক্তিবন্যায় কবি নিজেও ভেসে গিয়েছেন—ভেসে গিয়েছেন 'প্রভাসের' শেষ পর্যায়ে দুর্বাসা, বাসুকি, সুভদ্রা—সাধু পাপী সকলেই। অস্বীকার করার উপায় নেই যে—কবি

এখানে ইতিহাস থেকে বেশ দূরে সরে এসেছিলেন। কাব্য রচনা নয়, মহাভারত প্রতিষ্ঠা নয়—মহাভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হয়ে পাপীতাপী সকলের জন্যে বিতরণ করেছেন কৃষ্ণ প্রেমামৃত।

একদা পলাশির যুদ্ধ কাব্যে ঐতিহাসিক তথ্য বিকৃতির জন্য কবির নিন্দা হয়েছিল। সে সময় পরোক্ষে নবীনচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছিলেন 'ত্রয়ী' কাব্যেও তারই সাক্ষ্যে কবির পক্ষ সমর্থন করা যায়। 'ইতিহাস ভারতীর উদ্যানে চঞ্চলা কাব্য সরস্বতী পুষ্পচয়ন করিয়া বিচিত্র ইচ্ছানুসারে তাহার অপরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, মহারানীর খাস হুকুম আছে। ইহাতে ইতিহাসের কোন ক্ষতি হয় না। অথচ কাব্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়।'—ভারতী, ১৩০৫ শ্রাবণ।

বঙ্কিমচন্দ্রও The modern poet is of course welcome to give a new character to Krishna—মন্তব্যে কবিকল্পনার স্বচ্ছন্দ বিহারে অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন—যদিও সর্তাধীনভাবে।

নবীনচন্দ্র কিন্তু কাব্যত্রয়ীতে ঐতিহাসিকের ভূমিকাও গ্রহণ করেছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল তিনিই যথার্থ ইতিহাসসম্মত মহাভারতের রচনাকার। তিনি মনে করতেন মহাভারতের যুগের প্রকৃত ইতিহাসকে উদ্ধার করেছেন অতিরঞ্জিত, অযথার্থ, প্রক্ষিপ্ত নানা উপকরণের মৃত্তিকাস্তূপের ভিতর থেকে। অতএব উপরোক্ত ছাড়পত্র তাঁর প্রয়োজনীয় মনে হয় নি। নবীনচন্দ্রের মতে —কিংবদন্তী, অতিরঞ্জন, স্বকপোলকল্পিত তথ্যাবলী প্রাচীন ও প্রচলিত মহাভারতে অপর্যাপ্ত আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত রচনাকালে তিনি তাই সেগুলি বাতিল করে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি-ঘটনা ও তথ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। তাঁর মনে হল কৃষ্ণের ধর্মসংস্কার ও কর্মবাদ প্রচার, কর্ণের জন্ম, অনার্য জরা ব্যাধের শরে কৃষ্ণের জীবনাবসান প্রভৃতি ঘটনার মধ্যেই অজ্ঞাতপূর্ব কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস নিহিত। এ ইতিহাসকেই সর্বান্তঃকরণে সত্য বলে মেনে রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসে তার উপস্থাপনা। ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যতিক্রম নয়—আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রকৃত ইতিহাসের উদ্ধার ছিল তার কর্মসূচী।

নবীনচন্দ্রের এই অভিনব মহাভারতীয় কাহিনী অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছিল—তিনি 'মহাকবি'র সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। প্রশংসায় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল সে যুগের পাঠক সমাজ—শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রসিক-জ্ঞানী

নির্বিশেষে। মধুসূদনের মেঘনাদ বধে রাম-রাবণের ব্যক্তিত্ব-চরিত্রের মত এখানেও প্রাচীন মহাভারতের বাসনাবিরোধী ভাষ্য ও নবরূপায়ণকে প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে কবির স্ব-কাল স্বাগত জানিয়েছিল। যুগের প্রয়োজন ছিল আর এক মহাকাব্য—মহাভারতের প্রেরণার। জাতীয় কল্যাণ ও জনমানসে অখণ্ড ভারতবর্ষকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠার জন্যে নবীনচন্দ্রের এই মহাভারতের পরিকল্পনা।

যুগ প্রয়োজনের প্রেরণায় নবীনচন্দ্র মনে করেছিলেন বর্ণাশ্রমধর্মের কঠোর নিয়মাবলী সংশোধিত হওয়া উচিত। তখন নবযুগের নতুন জীবনের বাণী দেশবাসীর মর্মে এসে পৌঁছেছে কিন্তু প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের অজুহাতে মধ্যযুগীয় অন্ধ, অর্থহীন কুসংস্কার ও প্রথার অচলায়তন ছিল অটুট। একরাষ্ট্রের পরিকল্পনা—এক জাতীয়তার আদর্শ ব্যাহত হচ্ছিল আত্যন্তিক বর্ণগত, সমাজগত, ধর্মগত বিভেদের অস্তিত্বে। জাতীয় আদর্শ প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধের সকল সাহিত্যিক ও কর্মী। সমন্বয় পর্বের কবি নবীনচন্দ্রের কাছে যে আহ্বান এসেছিল, তা ছিল আরো প্রবল, মর্মভেদী এবং অমোঘ। এক অবিচ্ছিন্ন ভারত জুড়ে ঐক্য স্থাপনার জন্যে ব্যাকুল কবি বৃহদায়তন 'কাব্যত্রয়ী' রচনা করলেন 'এক জাতি মানব সকল—' এ চিরন্তন সত্যকে তার মর্মে রেখে। এক জাতীয়তার পরিপন্থী প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমাজের অনাচার-অবিচারের স্বরূপ উদ্ঘাটন ছিল তাঁর কাব্য রচনার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের সার্থকতা বিধানেব প্রয়াসে কল্পনার মুক্তাকাশে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার। জাতীয় প্রয়োজনের চরিতার্থতাই রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের গুরুত্বের এবং এক বৃহৎ পাঠক ও সমালোচক সম্প্রদায়ের সমাদর ও অভিনন্দনের কারণ। একটি যুগের জাতির ভবিষ্যৎ স্বপ্নের রূপকার নবীনচন্দ্র—মহাকবির খ্যাতিতে ছিল তাঁর সহজ অধিকার—তাঁর কাব্য মহাকাব্যই।

আপন ও অব্যবহিত পরবর্তী যুগে রৈবতক-কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস মহাকাব্য নামেই অভিহিত, প্রশংসিত এবং ব্যাখ্যাত ও বিশ্লেষিত হয়েছিল। কিন্তু তার পরবর্তীকালে নবীনকাব্য আলোচনার প্রয়াস অনেক সময়ই তাঁর শিল্প নৈপুণ্যের অভাব আবিষ্কার—অসঙ্গতির উদাহরণ উপস্থাপনা ও শৈথিল্যের সাক্ষ্য প্রমাণ খোঁজায় পর্যবসিত হয়েছে। আজও পর্যন্ত অ্যারিষ্টটল ও বিশ্বনাথের প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যের বিচার হয়ে থাকে। সহৃদয়তা ও

সহানুভূতি যা শিল্পের রসাস্বাদনে সাহায্য করে প্রায়ই তার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেই এ কাব্যের সমালোচনা হয়ে থাকে। এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ও সাবধান করেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,—'হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র কেহই তাঁহাদের মহাকাব্য রচনার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন নাই। সুতরাং মহাকাব্যীয় ফলশ্রুতি তাঁহাদের নিকট দাবী করা কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহাও বিচার্য। তাঁহাদের কবি-প্রকৃতিকে মহাকাব্যের লোহার খাটে (Procrustean bed) শোয়াইয়া উহাদের স্বাভাবিক অঙ্গায়তনকে সেই খাটের মাপে বিন্যাস করিবার কৃত্রিম চেষ্টা আমাদিগকে সেই কবিত্বের মর্মমূলে পৌঁছিতে সহায়তা করিবে না ইহা সুনিশ্চিত।'

নবীনচন্দ্র মহাকাব্য রচনার সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন নি। তথাপি মহৎ একটি সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করেছেন—রচনাকার তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারতের—তাঁর এ প্রত্যয় ছিল গভীর। কাহিনীর পটভূমি বিস্তৃত দেশ ও কাল—ইতিহাসের ফ্রেমে আঁটা। বিষয়বস্তু, উত্তুঙ্গ আদর্শ এবং মহাকাব্য-উপযোগী। নায়ক, উপনায়ক চরিত্র ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন। আয়োজনে ছিল না কোন ত্রুটি। কিন্তু ত্রুটি ছিল মর্মগত। ছিদ্র ছিল জাতীয় বৈশিষ্ট্যে, বাঙালী কবি জন্মলগ্ন থেকেই গাঁটছড়া বেঁধেছে গীতিকবিতার সঙ্গে। ঐতিহ্যকে তো অস্বীকার করা যায় না। মহাকবি মধুসূদনও অপারগ হয়েছিলেন। তাঁর উত্তরসাধকও হলেন। বিশেষতঃ নবীনচন্দ্র। পরিকল্পনা স্বপ্ন ছিল মহা-কাব্যের, মগ্নচেতনায় ছিল গীতিকাব্যের আবেশ ও আকর্ষণ। ফলে তাই যা হবার তাই হল—

ঠেক্‌ল কখন তোমার কাঁকন
কিংকিণীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।

মহাকাব্য সে অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।

—রবীন্দ্রনাথ, কণিকা, ক্ষতিপূরণ

মহাকবি নবীনচন্দ্র রৈবতক-কুরুক্ষেত্র, প্রভাস সৃষ্টি করলেন—কিন্তু গীতি-কাব্যের প্রচ্ছায়ায় গ্রস্ত। কাব্যত্রয়ীতে গীতিকবির অন্তর্মুখিনতা, সৌন্দর্য পিপাসা, ভাবোচ্ছ্বাস, ছোট ছোট সুখ দুঃখের আঘাতে স্পন্দিত হৃদয়ের ব্যাকুলতা মহাকাব্যের কাঠামোয় এনেছে গীতি-কবিতার স্থাপত্যশৈলীর ব্যঞ্জনা। মহাকাব্যীয় ওজস্বিতা হ্রাস পেয়েছে সেখানে। কাব্যত্রয়ীর প্রস্তাবনা পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র যে মত ও কিছু আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন বাস্তবে তাই সত্য হল। বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে একটি পত্রে জানিয়েছিলেন,—You have planned a new 'Mahabharat' indeed—an excellently ambitious work—the most ambitious perhaps since the days of হরিবংশ and অধ্যাত্ম রামায়ণ. It is nothing against the plan that is ambitious provided that you execute with the same grandeur as you have planned. You will perfectly justify yourself, properly executed the poem will of course take its rank as the greatest in the language.

'কাব্যত্রয়ী'র সাহিত্যমূল্য সম্বন্ধে আজ মতভেদ আছে। মহাকাব্য কিনা, আদৌ কাব্য কিনা—কোন কোন সংশয়ী সমালোচকের এ হেন সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা উদ্রেকের জন্যে তাঁর কাব্যগুণকে নস্যাৎ করা যায় না। যুগ-প্রয়োজন ছাড়াও সাহিত্যরস পরিবেষনায়, বিশেষত বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার প্রয়াসে রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকৃত। আবার রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কাল-সীমায় যে ভারতবর্ষ আসমুদ্রহিমাচল জনগণচিত্তে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছিল তার পশ্চাতে নবীনচন্দ্রের দান সামান্য নয়। প্রসঙ্গত ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায়ের উক্তি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—'এক বিপুলাকার মহাকাব্যের অবিরাম চরিত্র মিছিলে ও অজস্র ঘটনার কলকোলাহল থেকে আধুনিক যুগের উপযোগী ভাবসত্য নিষ্কাশিত করা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়।' —রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, ২য় পর্ব, পৃ ২১৬।

প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের, মহাকাব্যের সঙ্গে গীতিকবিতার, গীতার কর্মযোগের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মানবহিতবাদের, কাব্যের সঙ্গে তত্ত্বকথার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়েছেন এই কাব্য তিনটির মধ্যে। যা ছিল নিতান্তই বুদ্ধির আয়ত্ত, যুক্তির নির্ভর, তাকেই তিনি স্নিগ্ধ কাব্যরসের আধারে পরিণত

করলেন। পরিকল্পনার বিরাটত্বে, দার্শনিকতার অবতারণায়, গোষ্ঠী-সচেতনতায় রৈবতক-কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস মহাকাব্যোচিত। অবার গীতিপ্রাণতা, ভাবাতিরেক, পারিবারিক স্নেহরস পিপাসা, ভক্তিবিহ্বলতা মহাকাব্য রচনারীতির পক্ষে প্রশস্ত নয়। সব বৈশিষ্ট্য মিলে যেন সৃষ্টি হল নতুন শ্রেণীর মহাকাব্য—যা একদিকে প্রাচীন ও সাহিত্যিক (Authentic ও Literary) মহাকাব্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেও এ যুগের উপন্যাসের স্বাদ সৃষ্টি করেছে কোথাও কোথাও; আবার কবির প্রবল, প্রচণ্ড ভাবাবেগের বন্যায়—গীতিকাব্যের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ। সব কিছু মিলে মিশে যা হল, তাকে মহাকাব্য ছাড়া অন্য কিছু বলা গেল না বা যায় না। নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীতে কবি বিরাট পরিকল্পনা, অজস্র চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ, অন্তহীন তাত্ত্বিকতাকে সহজেই উপভোগ্য মহাকাব্যে পরিণত করলেন। বর্ণনার শান্তমহিমায়, প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় আবেদনের সূক্ষ্ম উপলব্ধিতে, অধ্যাত্মতত্ত্বের কাব্যময় প্রকাশেও রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস বাংলা সাহিত্যের দরবারে একটি অ-সাধারণ মর্যাদার স্থান করে নিল অতি সহজেই।

জীবনী কাব্য

কাব্যজীবনের দ্বিতীয় পর্বে নবীনচন্দ্র রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস ব্যতীত তিনটি জীবনীকাব্য অমিতাভ, খ্রীষ্ট ও অমৃতাভ প্রণয়ন করেন। অমৃতাভ কাব্য নবীনচন্দ্র শেষ করতে সক্ষম হন নি। এটি কবির মৃত্যুর পর হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহায়তায় অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই প্রকাশিত হয়। কাব্যগুলি রচনার কারণ নবীনচন্দ্র আমার জীবনে লিখেছেন,—

'আমার উদ্দেশ্য সমস্ত অবতারদের লীলা একবার ধ্যান করিয়া বুঝিতে এবং যে রূপ নিজে বুঝি, তাহা বুঝাইয়া পরস্পর ধর্মদ্বেষ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিব।' —আমার জীবন।

মহম্মদের জীবনী কাব্য রচনার অভিপ্রায়ও কবির ছিল, কিন্তু কার্যত সম্ভব হয়নি।

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন এই সময় থেকে সুপরিকল্পিত পথে পরিচালিত হচ্ছে। রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বাতন্ত্র্য লাভের স্পৃহাও নেতৃবর্গের কল্পনাকে বিচলিত করে তুলেছে। জাতি গঠনের সর্ববিধ প্রয়াস যে

সাম্প্রদায়ক ঐক্য প্রতিষ্ঠার অভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে তদানীন্তন শিক্ষিত সম্প্রদায় ও নেতৃবর্গের কাছে এ সত্য অজ্ঞাত ছিল না। বাঙালীর চেতনার গভীরতম অংশেও ঐক্য স্থাপনের প্রয়োজন উপলব্ধ হয়েছিল। এক কথায় বলা যায় সমগ্র যুগের প্রবণতাই ছিল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সব সম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতির অনুষ্ঠান করে সব মতই সত্য বলে ঘোষণা করলেন। কেশবচন্দ্রের নববিধানে দেখি একই আদর্শের প্রচার। বিশেষত কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট তিনজন ঈশ্বর প্রেরিত, ঈশ্বর অবতার মহামানবের জীবনী ও বাণী তৎকালীন বাঙালী সম্প্রদায়কে মুগ্ধ করেছিল। এমন কিছু সম্পদ এই তিনজনের প্রচারিত আদর্শের মধ্যে তারা লাভ করেছিল যা ছিল সেই যুগসন্ধিক্ষণে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। জাতি ও সমাজের অস্তিত্ব রক্ষায় যা ছিল অপরিহার্য। কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের সর্বজন অনুধাবনীয় ঐক্যের, মানবতার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন কবি, প্রাবন্ধিক ও নাট্যকার। যুগচেতনাই নবীনচন্দ্রকে অবতারগণের জীবনী কাব্য রচনায় প্ররোচিত করেছে। নবীনচন্দ্র অবশ্য ব্যক্তিগত জীবনেই, একান্তভাবে ঈশ্বরাভিমুখী হয়ে পড়েছিলেন। জীবনের শেষ পর্বে বিভিন্ন অবতারের লীলা অনুধ্যান করে কবি তাঁদের মানস সান্নিধ্য লাভের কামনায় ব্যাকুল। একদিকে যুগ প্রয়োজনে, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক প্রেরণায় নবীনচন্দ্রের জীবনী কাব্যগুলি রচিত। নবীনচন্দ্র সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন শ্রীভগবানই যুগে-যুগে, দেশে দেশে সাধুর পরিত্রাণ ও পাপীর বিনাশের জন্য বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। 'প্রভাসের' ত্রয়োদশ সর্গে কবি খ্রীষ্ট ও মহম্মদকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন,—

সুদূর সিন্ধুর তীরে আসিলেন আর বার
নব যদুকুলে, নব যদু স্থানে, হরি
শান্তিরস অবতার ; উদ্ধারিলা পশুভূমি,
ঘোর আত্ম বলিদানে শিলাদ্রব করি।

লোহিত সমুদ্রতীরে সেই মহামরুভূমে,
পাণ্ডব প্রস্থান স্থানে, আসিল আবার
সখ্য রস অবতার ; নব ধনঞ্জয় রূপে,
মরুভূমে ভোগবতী করিয়া সঞ্চার।

— প্রভাস, ত্রয়োদশ সর্গ

শুধু প্রয়োজন বোধে নয় আন্তরিক উপলব্ধিতে সত্য সকল ধর্মের মূলগত ঐক্য প্রতিপাদনের জন্য এই কাব্য তিনটি রচিত। যখনই তিনি খ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা মহম্মদের কথা উল্লেখ করেছেন, পরমশ্রদ্ধার সঙ্গেই তাঁদের প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। মহম্মদের জীবনী কাব্য রচনার অভিলাষ তাঁর পূর্ণ হয়নি। 'শ্রীভগবানের মহম্মদ অবতার দর্শন করা আমার ভাগ্যে হইবে না।' —আমার জীবন।

কালানুক্রমিক ভাবে খ্রীষ্ট নবীনচন্দ্রের রচিত প্রথম জীবন কাব্য। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাব্যটি "The Gospel according to St. Matnew"-র অনুবাদ। খ্রীষ্টের ভূমিকায় নবীনচন্দ্র মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, কৃষ্ণোক্তি ও খ্রীষ্টোক্তিতে কিছুই বিভিন্নতা নাই। ভূমিকা পত্রেই তিনি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের অবতার তত্ত্বের সঙ্গে মেথুর গস্‌পেলের খ্রীষ্টোক্ত অবতার তত্ত্বের ঐক্য প্রমাণ করেন। নবীনচন্দ্র বিশ্বাস করতেন খ্রীষ্টও এশিয়ার লোক। "তিনি একজন কৌপীনধারী হিন্দু সন্ন্যাসী।"

কাব্যরূপে খ্রীষ্ট রসোত্তীর্ণ হয়নি। উপরন্তু অনুবাদের আড়ষ্টতায় সুখপাঠ্যও বলা যায় না। প্রসঙ্গত শ্রীসুবোধ রঞ্জন রায়ের মতই যথার্থ বলা যায়।

খ্রীষ্ট উদ্দেশ্য-প্রণোদিত রচনা হিসাবেই উল্লেখ্য, অনুবাদের সীমাবদ্ধতা এবং বিষয়-পরিবেশের সহিত কবির একপ্রাণতার অভাব উহাকে সুকাব্য করিয়া তুলিতে পারে নাই। —নবীনচন্দ্রের কবিকৃতি, সুবোধ রঞ্জন রায়, পৃঃ ২৩৭।

আমরা পূর্বেই বলেছি, কাব্য সাধনার দ্বিতীয় পর্যায়ে নবীনচন্দ্র বিশুদ্ধ কাব্য রচনা করেন নি। একটি বৃহত্তর উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে, জাতীয়, সামাজিক প্রয়োজন বোধের প্রেরণায় কাব্য রচনা করেছেন। খ্রীষ্ট কাব্যকে অভিনন্দিত করে শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন লিবারেল পত্রিকায় যা লিখেছিলেন তার মধ্যেও কাব্যাংশের উৎকর্ষের প্রসঙ্গ বিশেষ নেই। তিনি লিখেছিলেন -

'ধর্মের সার্বভৌমিক ভাব তুলনার দ্বারা ভারতীয় পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করা একটি অতীব মহৎ কার্য।' (লিবারেল পত্রিকায় কৃষ্ণবিহারী সেনের প্রবন্ধের অনুবাদ আমার জীবন [৫]এ উদ্ধৃত।)

খ্রীষ্ট কাব্য প্রণেতা নবীনচন্দ্র এই মহত্ত্বের দাবী রাখেন, কিন্তু কবিত্বের মূল্য এখানে নাম মাত্র। অবশ্যই স্মরণযোগ্য যে "খ্রীষ্ট' ম্যাথুর গসপেলের একটি অনুবাদ কাব্য মাত্র। 'অমিতাভ, 'অমৃতাভ' কাব্যে তথ্য সংগ্রহ কবি

যেখান থেকেই করুন বুদ্ধ ও চৈতন্য তাঁর মনকে স্পর্শ করেছিল। তাঁর চেতনার নির্জ্জান স্তরেও তাঁদের বাণী পৌছেছিল। তথ্য সমৃদ্ধ জীবন কাহিনী যথার্থ কবিত্বের স্পর্শে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু খ্রীষ্ট প্রসঙ্গে কবির মন জড়তা দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। তার প্রধান কারণই হল—নবীনচন্দ্রের স্বধর্ম, স্বজাতি, স্বদেশ সম্পর্কে অতিমাত্রায় সপ্রেম সচেতনতা। যেখানে প্রাণের সংযোগ নেই, সেখানে আদর্শের প্রচার থাকলেও আন্তরিকতার—ভালবাসার সীমাবদ্ধতা থেকেই যায়।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্রের অমিতাভ কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে নবীনচন্দ্র কর্মব্যপদেশে বিহারে যখন অবস্থান করেন, তখন বুদ্ধদেবের লীলাভূমি রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন এবং বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। বিহারেই 'অমিতাভে'র বীজ তাঁর হৃদয়ে রোপিত হয়েছে।

ইতিমধ্যে দেখি বুদ্ধদেবের জীবন ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। শ্রীরামদাস সেন 'বুদ্ধদেব, তাঁহার জীবন ও ধর্মনীতি', সাধু অঘোরনাথ 'শাক্যমুনি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব', কৃষ্ণকুমার মিত্র 'বুদ্ধদেব চরিত ও বৌদ্ধ ধর্মের সংক্ষেপ বিবরণ' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করে সমগ্র উত্তর ভারতে যে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রচার হয়েছিল এবং বহু প্রসিদ্ধ হিন্দু মন্দির ও বিগ্রহ যে বৌদ্ধ, তা প্রমাণ করেছেন। গিরিশচন্দ্র পঞ্চাঙ্ক নাটক প্রণয়ন করেন 'বুদ্ধদেব চরিত'। বুদ্ধ-জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নবীনচন্দ্রের যুগের প্রগতিশীল, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। নবীনচন্দ্র ব্যক্তিগতভাবে বুদ্ধ জীবনের প্রতি যেমন ভাবেই আকৃষ্ট হন, যুগের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন নি। নবীনচন্দ্র ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বাস করতেন 'কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর।' কিন্তু কাব্য রচনা কালে বুদ্ধদেবের অতিলৌকিক লীলা যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করে মানবত্বের মৃত্তিকাসনেই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে কবির মতই উল্লেখযোগ্য—

'অবতারেরা মানুষ ছিলেন, মনুষ্য দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মানুষের মত কার্য করিয়া মানুষের শিক্ষাদানই অবতারত্বের একমাত্র সার্থকতা।' আমরা যে ভাবে বুদ্ধদেবকে চক্ষের উপর দেখিতে পাই তাঁহাকে ধারণা করিতে পারি, সে ভাবে চিত্র করাই আমার উদ্দেশ্য।'

নবীনচন্দ্র যে Edwin Arnold'-এর রচিত কাব্য 'Light of Asia' গ্রন্থটি পাঠ করেছিলেন যত্নসহকারে আমার জীবনে কবি নিজেই উল্লেখ করেছেন। অমিতাভ নামটির সঙ্গে 'Light of Asia' এই নামকরণের ভাবগত সাদৃশ্য আছে। সম্ভবত Arnold অমিতাভ শব্দ থেকেই নামটি সৃষ্টি করেছেন। তথাপি অমিতাভ ও 'Light of Asia' দুটি গ্রন্থে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য প্রচুর। তথ্যের দিক থেকে একজন মহাপুরুষকে নিয়ে রচিত দুটি জীবনী গ্রন্থে সাদৃশ্য থাকা খুবই সঙ্গত। নবীনচন্দ্র ও Arnold উভয়েই পূর্ববর্তী বুদ্ধ জীবনী গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। নবীনচন্দ্র বুদ্ধ জীবনের যে অলৌকিক ঘটনাগুলি পরিহার করেছেন, Arnold কিন্তু সে রকম মানবিক মর্যাদায় বুদ্ধদেবকে ভূষিত করতে সক্ষম হননি। নবীনচন্দ্র নিজেও এ বিষয়ে যে অবহিত ছিলেন, আমার জীবনে তার উল্লেখ দেখা যায়, এপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, আমার জীবন, ৫ পৃঃ ২৬২—২৬৩।

উনিশটি সর্গে বিভক্ত এই কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক সমাজে সমাদরে গৃহীত হয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার সমালোচনায় রমেশচন্দ্র দত্তের পত্রে, এমন কি সিংহল ও শ্যামদেশেও নবীনচন্দ্রের অমিতাভ কাব্য উচ্চ প্রশংসিত হয়। বুদ্ধ জীবনের প্রতি কবির আন্তরিক শ্রদ্ধা ও তাঁর ধর্মতত্ত্বে কবির অসামান্য অধিকার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের এত মুগ্ধ করেছিল যে তাঁরা তাঁর কাছে নির্বাণ পত্র ভিক্ষা করে পত্র লিখতে আরম্ভ করেছিলেন।

অমিতাভ কাব্যগ্রন্থ প্রণয়নের পশ্চাতে প্রয়োজন বোধের যে প্রেরণাই থাকুক কাব্যাংশের দিক থেকে নবীনচন্দ্রের সুনাম এতে ক্ষুণ্ণ হয়নি। বর্ণনার সহজ, স্বচ্ছন্দ গতি এই গাথাজাতীয় কাব্যটির উৎকর্ষ বিধান করেছে। কবির ভাষা ক্রমশই বিরলভূষণ হয়ে এসেছে, ছন্দের বৈচিত্র্য বিধান প্রচেষ্টা নেই বললেই চলে। আহত রাজহংসের বেদনায় ব্যথিত চিত্ত সিদ্ধার্থের মনে প্রথম করুণার সঞ্চার, সিদ্ধার্থ ও গোপার পূর্বরাগ, সিদ্ধার্থের অন্তর্দ্বন্দ্ব, বুদ্ধের মহানিষ্ক্রমণ কবি নিপুণতার সঙ্গে শিল্পসম্মত রূপে রচনা করেছেন। মৃত্যুর করাল রূপ দর্শন করে সিদ্ধার্থের মনে যে ভাবের উদয় হল, কবি মাত্র দুটি ছত্রেই তার বর্ণনা দিলেন অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ভাষায়

মরণের লৌহ করে জন্ম জন্মান্তর
করিতেছে হাহাকার ব্যাপি এই ধরা।

—অমিতাভ, পৃঃ ১৮৮

বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে এসেছেন। এখানেও দুটি ছত্রে কবি জীবন্ত এক চিত্র রচনা করেছেন। বুদ্ধদেব নগরদ্বারে এসে দাঁড়ালেন

নীরব আনত মুখে, ভিক্ষা পাত্র হেম করে
গৈরিকে আবৃত হেম বপু জ্যোতির্ময়।

নবীনচন্দ্রের সর্বশেষ রচিত জীবনীকাব্য অমৃতাভ তাঁর মৃত্যুর পর অসম্পূর্ণ অবস্থায় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

নবীনচন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে এই কাব্যটির রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কবির পুত্র নির্মলচন্দ্র সেন বিলাত যাত্রা করেন। প্রবাসী পুত্রের মঙ্গল কামনায় কবি ঐ দিন থেকে গ্রন্থটি রচনার কাজ আরম্ভ করেছিলেন। কবি বিশ্বাস করতেন 'অমৃতাভ' রচনার কাজ শেষ হলেই পৃথিবীতে তাঁর জীবনধারণের কোনই প্রয়োজন থাকবে না। যতদিন তিনি 'অমৃতাভ' রচনা সমাপ্ত না করবেন ঈশ্বর ততদিনই তাঁকে ইহলোকের অবস্থানের অনুমতি দেবেন। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে নবীনচন্দ্র খুব মন্থর গতিতে কাব্যটি রচনা করেছিলেন। প্রতি সর্গেই প্রবাসী পুত্রের কল্যাণ কামনা করেছেন। নিমাই'এর উপনয়ন অংশে পুত্রের উপনয়ন স্মৃতি তাঁকে কবির সকল দায়িত্ব বিস্মৃত করিয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা প্রসঙ্গে-অপ্রসঙ্গে উত্থাপিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলা বর্ণনায় ভক্ত ও কবি নবীনচন্দ্র বৈষ্ণব সাধক বর্গের অনুবৃত্তি লক্ষ্য করি। হৃদয়াবেগের অকৃত্রিম প্রকাশে, অসম্পূর্ণ হলেও গ্রন্থটি কাব্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে। শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "'অমৃতাভ' কবি প্রতিভার দীপ্তিহীন অঙ্গার মূর্তি ভিন্ন কোন উজ্জ্বলতার, কবি চেতনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।" রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাস, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা, পৃঃ ২২।

শ্রীসুবোধ রঞ্জন রায় অমৃতাভে'র কাব্যগুণ বিচার এবং এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এখানে তাঁরই সঙ্গে একমত হয়ে আমরা বলতে পারি,

'...... নবীনচন্দ্রের কাব্য বর্ণনা প্রধান, সংযত এবং ভাবগম্ভীর, স্বাভাবিক বেদনা রস মাধুর্যে ভরপুর। ... এই সর্বশেষ অসম্পূর্ণ কাব্য নবীনচন্দ্রের কবিকীর্তির উজ্জ্বল নিদর্শন নহে, তবে আন্তরিকতার স্পর্শে তাহা সজীব করুণাধারায় সিক্ত।'

গদ্যানুবাদ

নবীনচন্দ্রের গদ্যানুবাদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র রৈবতক কাব্য রচনা সমাপ্ত করে গীতার পদ্যানুবাদে ব্যাপৃত হলেন। এ প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে' বলেছেন,

'আমি এ পর্যন্ত শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা পড়ি নাই। ভাগবতের ও মহাভারতের উপাখ্যান ভাগের বঙ্গানুবাদ পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম ও রাজনৈতিকতা সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহাই রৈবতকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।'

নবীনচন্দ্রের রৈবতক কাব্যের সঙ্গেও কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের দৃষ্টিভঙ্গীর যথেষ্ট পার্থক্য আছে। রৈবতকে কবি প্রতীচ্য ভাবধারার সঙ্গে অনেক বেশী সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। যদিও এই নবীনচন্দ্র বলেন—

বিষ্ণু সর্বভূতময়
জন্মমৃত্যু কিছু নয়।

—রৈবতক, ১৭ সর্গ

কিন্তু পরক্ষণেই কবির কৃষ্ণ যে নির্দেশ দিলেন সেখানে—"Greatest good of the greatest number"—এই হিতবাদেরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

জগতের সুখ যাহা,
আমাদের সুখ তাহা,
সকলে জগৎ সুখে সমর্পিলে প্রাণ,
হবে ধরাতলে কিবা স্বর্গ অধিষ্ঠান।

—রৈবতক, ১৭ সর্গ

তবে কবির 'আমি এ পর্যন্ত 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা' পড়ি নাই' এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য নয়। রৈবতকে কিছু অংশ আছে যা শ্রীমদ্‌ভগদ্গীতার শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ। যেমন—

ভ্রান্ত নরগণ
ত্যাজি সর্ব ধর্ম লও আমার শরণ

রৈবতক, দ্বাদশ সর্গ

এখানে তুলনীয়,

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥

শ্রীমদ্ভগদ্গীতা—১৮।৬৬

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উত্তমরূপে না অধ্যয়ন করলেও গীতার সংস্পর্শে অন্তত তিনি এসেছিলেন। মহাভারত পাঠকালেই কবি গীতা পাঠ করেছেন। কারণ মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' নামে একটি স্বতন্ত্র পর্বাধ্যায় আছে।

পরবর্তী কালে রৈবতক রচনা সমাপ্ত হলে নবীনচন্দ্র ফেণীতে অবস্থানকালে অভয়ানন্দ তর্করত্নের নিকট মূল সংস্কৃত গীতা পাঠ করেন, এবং 'স্ত্রীকে পড়াইবার জন্য' বাংলায় অনুবাদ করেন। অনুবাদের উদ্দেশ্য থেকেই অনুমিত হয় গ্রন্থটি অত্যন্ত সরল ভাষায় লিখিত হয়েছে। দীর্ঘকাল কবি গীতার আলোচনা করেছিলেন। এই দীর্ঘ অনুশীলনের ফলে কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের 'স্বয়ং ভগবান' রূপে, নিষ্কাম কর্মযোগের প্রবর্তকরূপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। কুরুক্ষেত্রে প্রথম সর্গে গীতার বহু শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ সন্নিবিষ্ট। কুরুক্ষেত্র নবম সর্গে শরশয্যায় ভীষ্ম দিব্যনয়নে প্রত্যক্ষ করলেন।—

উর্ধ্বে নারায়ণ
বসি কৃষ্ণমূর্তি পূর্ণ মহিমায়
মধুর বাঁশীর স্বরে ডাকিছে মানব
আইস যে পথে পার পাইবে আমায়।

ভীষ্মের এই দিব্যদর্শনে দেখি গীতারই প্রেরণা,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪ ১১

শুধু রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস কাব্যে নয় কবির সমগ্র জীবনে গীতাকেই তিনি আশ্রয় করেছিলেন। গীতার অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নবীনচন্দ্রের অনুরাগী পাঠকসমাজে গ্রন্থখানি সাদরে গৃহীত হয়েছিল। শিশির-কুমার ঘোষ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তি অনুবাদটির বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। শিশিরকুমার তাঁকে এক পত্রে লেখেন,—

'এমন কঠিন বিষয় এরূপ সহজ ভাষায় ও সহজ রূপে প্রকাশ যে সম্ভব হয়, তাহা আমার পূর্বে বোধ ছিল না।'

নবীনচন্দ্র নিজে গীতা অধ্যয়নকালে টীকাসমূহের দুর্বোধ্যতার জন্য মূল গ্রন্থই পাঠ করেছিলেন। অনুবাদের সময় গ্রন্থটিকে যথাসাধ্য সহজবোধ্য

করার দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। সমকালীন সমালোচনায় কবির এই প্রচেষ্টা অভিনন্দিত হল।

Babu Nabin Chandra Sen's rendering of the Gita is admirable and a splendid acquistion to the poetical literature of the day. **The Indian Mirror,** 'আমার জীবনে' উদ্ধৃত।

কবির প্রতিভায় তত্ত্বমূলক নীরস গীতার অনুবাদও সরস ও কবিত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গীতার সংস্কৃত শ্লোক বাংলা কাব্যে যথার্থ অনূদিত হয়েছে সহজ, সাবলীল ভাষা ও ছন্দের প্রবাহে,—

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদস বেদবিৎ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৫।১

এই সমস্ত শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদে কবির অনুবাদসামর্থ্য সহজেই অনুধাবনীয়।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নবীনচন্দ্রের মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হল। অথচ 'আমার জীবনে' এই প্রসঙ্গে কবি বলেন যে, কুরুক্ষেত্র কাব্য সমাপ্ত হলে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর বঙ্গানুবাদে তিনি ব্যাপৃত হয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্র কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থটির মধ্যে যে কাল-নির্দেশ আছে কবির কাল-নির্দেশ তা থেকে ভিন্ন। ভূমিকা পত্রে দেখি ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর কাব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর আভাষ বা ভূমিকায় কবি বিষয়বস্তুর সার সংকলন করেছেন সহজ, স্বচ্ছন্দ গদ্যে। 'কমলাকান্তের দপ্তরের' প্রায় পরিহাস-সরস বাগ্‌ভঙ্গী কঠিন ধর্মশাস্ত্রকেও শর্করাবৃত তিক্ত বটিকার মত সর্বজন-বোধ্য ও গ্রাহ্য করতে কবি আগ্রহী, সচেষ্ট। অবশিষ্টাংশ আক্ষরিক অনুবাদ;

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা তং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥
অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যাযানুচ্চার্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেব জননী পরা॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৭৩-৭৪

অনুবাদ,

তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি স্বর, বষট্‌কার।
হে অমরে, নিত্যে তুমি সুধা তিন মাত্রা আর॥
অর্ধ মাত্রা স্থিতা নিত্যা অনুচ্চার্য মাত্রা আর।
তুমিই সাবিত্রী দেবী জননী তুমি সবার॥

এখানে সংস্কৃত শব্দগুলিও যথাস্থিত ভাবে রক্ষা করা হয়েছে।

নবীনচন্দ্র গীতা ও চণ্ডীর মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন; তাই উদাহরণ সহযোগে গীতা ও চণ্ডীর ঐক্য প্রতিপন্ন করেন ভূমিকা অংশে।

কাব্যজীবনের দ্বিতীয় পর্বে নবীনচন্দ্র ধর্মীয় কাব্যই প্রণয়ন করেন, যার ফলে তাঁর পরিচয় পত্র রচিত হল হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের কবিরূপে।—

Babu Nabin Chandra Sen is undoubtedly the poet of Hindu revival:....He is now writing on Jesus Christ, now translating Gita and now making version of Markandeya Chandi and one absorbing purpose runs through all the work, namely, that reviving in the minds of his educated countrymen a respect for Hinduism.—*Calcutta Review.*

আপন সাহিত্যজীবনকে কবি যে উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন, কবির জীবৎকালেই তার সার্থকতা প্রত্যক্ষীভূত হয়েছিল।

নবীন কাব্যের অনুবাদ

পলাশির যুদ্ধ কাব্যের সর্বজনগ্রাহ্য কাব্যরস গ্রন্থটিকে সবিশেষ জনপ্রিয় করেছিল। বাংলা দেশের সীমানার বাইরেও তার খ্যাতির বিস্তার ঘটেছিল। পলাশির যুদ্ধের হিন্দী অনুবাদ করেছিলেন খ্যাতনামা হিন্দী কবি শ্রীমৈথিলী-শরণ গুপ্ত। পলাশির যুদ্ধ ইংরেজিতেও অনূদিত হয়েছিল, নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' চতুর্থভাগে তার উল্লেখ আছে।

হিন্দী অনুবাদক শ্রীমৈথিলীশরণ গুপ্ত 'মধুপ' এই ছদ্মনামে পলাশির যুদ্ধ অনুবাদ করেন। ১৯৭৭ সংবতে ঝাঁসী সাহিত্যসদন থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ভূমিকা বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন কর্তৃক লিখিত।

মধুপ সর্বত্র আক্ষরিক অনুবাদের পক্ষপাতী না হলেও অনুবাদ যথেষ্ট মূলানুগ।—

আধীরাত হোরহী হৈ, মৌন মহীতল হৈ,
সঘন ঘনোঁসে ঘিরা ঘোর নভস্থল হৈ।
করকে বিদীর্ণ উসেনাগ জোঁ্যা করে বলা।
রহ রহ কর কোঁধতী হৈ চলা চঞ্চলা।
বঙ্গদশা দেখনে কো মানো দেব বালাএঁ —
খোলকর গগন গবাক্ষ রূপমালাএঁ—
মানকে সিরাজ ভয় বন্দ কর লেতী হৈঁ,
রূপ জ্যোতিওঁসে চকা চোধ লগা দেতী হৈঁ।
মেঘোঁ কো হঁসা কর নিমেষ ভর, অন্ত মে
বিজলী বিলা জাতী হৈ ভয়সে অনন্ত মে।

এই সঙ্গে আমরা যখন মূল কাব্যে পলাশির যুদ্ধ ১ম সর্গ ১ স্তবক পাঠ করি—

দ্বিতীয় প্রহর নিশি, নীরব অবনী;
নিবিড় জলদাবৃত গগন মণ্ডল;
বিদারী আকাশতল, যেন দুষ্ট ফণী—
খেলিতেছে থেকে থেকে বিজলী চঞ্চল।
দেখিতে বঙ্গের দশা সুরবালাগণ,
গগন গবাক্ষ যেন চকিতে খুলিয়া,
অমনি সিরাজ ভয়ে করিতে বন্ধন
চমকিছে রূপজ্যোতিঃ নয়ন ধাঁধিয়া
মুহূর্তেক হাসাইয়া গগন প্রাঙ্গণ,
সভয়ে চপলা মেঘে পশিছে তখন,

তখন দেখি, এক ভাষার কাব্য আর এক ভাষায় অনুবাদ করা বেশ দুরূহ কাজ। বিষয়বস্তু বা আখ্যানভাগের ভাষানুবাদ অনায়াসে করা সম্ভব হলেও কবিতার প্রতিটি শব্দ, ধ্বনি, ছন্দের গতি ও বৈশিষ্ট্য অন্য ভাষায় সঞ্চারিত করা যায় না। এক কথায়, এক ভাষায় রচিত কাব্যের প্রাণ অন্য ভাষার অনুবাদে ধরা দেয় না। তারই অভাবে মূল কাব্যের রসাস্বাদ অনুবাদ থেকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবু মধুপ সে প্রচেষ্টা করেছিলেন। কবির এই

কাব্যের আবেগ, স্বদেশপ্রেম ভিন্ন প্রদেশবাসীর হৃদয় স্পর্শ করতেও সক্ষম হয়েছিল। এইখানেই অনুবাদটির সার্থকতা। মোহনলালের অন্তিম উক্তির মধ্যে নবীনচন্দ্রের পরাধীনতার যে বেদনা আত্মপ্রকাশ করেছে, অনুবাদেও তার উচ্ছ্বাস অক্ষুণ্ণ। মধুপও সেই বেদনার জ্বালা আপন মর্মে অনুভব করেছেন। এখানে অনুবাদের মধ্যেই অনুবাদকারক কবির বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পাই,—

কহাঁ চলে, ফির কর তো দেখা, একবার দিনরাজ
তুম ডুবে তো ডুব জায়গা যবন রাজ্যভী আজ।
আয়েগী উনকে অভাগ্য কী অতল আঁধেরী রাত,
নির্মম হোকর চলে ন জানা করকে যোঁ পবিপাত।

পলাসিকা যুদ্ধ, ৪র্থ সর্গ

বহুস্থানে নবীনচন্দ্র পাঁচ ছয় আট পংক্তিতে যে কথা বলেছেন 'মধুপের' দুটি মাত্র ছত্রে সেই বক্তব্য উপস্থাপিত। যেমন,—

শার্দূল কবলগত কিম্বা নাগপাশে
বদ্ধ যেইজন হায় ভীষণ বেষ্টনে,
নিরাপদ, বসি যেন আপনার বাসে
ভাবে সে যদ্যপি মনে, তবে এ সংসারে
ততোধিক মূর্খ আর বলিব কাহারে।

পলাশির যুদ্ধ, ১ম সর্গ

অনুবাদ,

সোচে ঘর বৈঠাহুঁ জো ব্যাঘ্র মুখ মেঁ পড়া,
হোগা কঁহা কৌণ ভলা মূর্খ উসসে বড়া ?

কখনও অনুবাদক কবির বক্তব্যকে একটু বিস্তারিত করেছেন,—

সমভাবে সর্বদেশ শ্বেত ও শ্যামলে,
বরষে তাহার মেঘ, বাঁচায় পবনে,

অনুবাদ,

সব দেশোঁ মে সাম্য ভাবসে সিত শ্যামল পর,
করতে হৈ জলবৃষ্টি ঘুমকর উনকে জলধর।
সবকে উনকী বায়ুজিলাতী হৈ সমতা সে
করতী উনকী আগ দগ্ধভী অবিষমতা সে।

ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র নবীনচন্দ্রের 'বুড়া মঙ্গল' কবিতাটির হিন্দী অনুবাদ কবিবচনসুধা পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

পলাশির যুদ্ধের ইংরাজি অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। কাব্যটির সম্পূর্ণ অনুবাদও হয় নি। 'আমার জীবন' চতুর্থ ভাগে নবীনচন্দ্র এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু অনুবাদের কিয়দংশও আমাদের হস্তগত হয় নি। অনুবাদক ডাক্তার ফ্রেঞ্চ মলেন ছিলেন আইরিশম্যান। পরাধীন ভারতবর্ষের বেদনা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। অনুবাদে তিনি আপন মর্মজ্বালা সঞ্চারিত করে কাব্যটি আরো অগ্নিগর্ভ করে তোলেন।

এই অনুবাদ প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র আমার জীবন ৪র্থ খণ্ডে লিখেছেন,

'তিনি কেবল দূর থেকে Free অনুবাদ করিতেছেন এমন নহে, তাহার উপর আগুন ঢালিতেছেন। আমি দেখিলাম এই অনুবাদ প্রকাশিত হইলে আমার ফাঁসির ব্যবস্থা হইবে।'

শেষ পর্যন্ত সম্ভবতঃ অনুবাদটি সমাপ্ত হয়ে থাকলেও অনুবাদকের তা মনোমত হয় নি। মলেন নূতন ছন্দে কাব্যটিকে নূতন করে অনুবাদ করতে মনস্থ করেন। আরব্ধ কাজ তিনি শেষ করতে সক্ষম হন নি।

আর্য-দর্শন কবিতাটি ডাক্তার মলেন অনুবাদ করেছিলেন। 'আমার জীবন' ৪র্থ খণ্ডে তা পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের পরাধীনতার বেদনা একজন বিদেশীর লেখনী মুখে আশ্চর্য স্বাভাবিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পরাধীন কবির স্বাধীনতার বাসনা দ্বিধাহীন ভাষায় উচ্চারিত।—

Be calm and silent tho' thou still must weep
Since India's Sun of Glory long hath set ;
It is not needful that thou shouldst forget,
But utter not that grief inspiring sound,—
Ganges some future day will cease to fret
When Freedom's Sun shall take an upward bound
And spread its hallow'd light o'er India's holy ground.

অনুবাদটি মূল কবিতার ভাবাবলম্বনে কৃত। নবীনচন্দ্রের বিস্তারিত শিথিলভঙ্গী এর মধ্যে অনুপস্থিত। নবীন-পরিবেষিত স্বদেশপ্রীতি, পরাধীনতার বেদনার উচ্ছ্বাসবাষ্পটুকু বাদ দিয়ে সংহত, সুন্দর কাব্যরূপে এখানে উপস্থিত।

চতুর্থ অধ্যায়
নবীনকাব্যের ভাব ও রূপ

পাদবদ্ধোহক্ষর সমতন্ত্রী লয়সমন্বিতঃ কবি যে কাব্যকবিতা সৃষ্টি করেন তার দুটি অংশ। একটি ভাবের দিক, অপরটি রূপের। রূপ সৃষ্টি ও রসোপভোগের জন্য কিছু বক্তব্য বা বস্তুর প্রয়োজন। আর এই বক্তব্যে কবিচিত্তেরই ঘটে প্রতিফলন। কবির মনের নানা ভাবের আলোছায়ার লীলা নির্মল কাব্যরসের আধার তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই ফুটে ওঠে। অলৌকিক সেই কাব্যবস্তুর পেছনে থাকে লৌকিক কবির নানামুখী ভাব ও ভাবনার প্রেরণা। কবি যখন মহাকাব্য অথবা কাহিনীকাব্য রচনা করেন, যখন কবির দৃষ্টিকোণ প্রধানতই বস্তুগত বা objective সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা ও অনুভূত সত্যের প্রকাশ অনেক স্পষ্ট। গীতি কবির Subjective দৃষ্টিভঙ্গী ও অন্তর্লীনতার মধ্যেও কবিচিত্তের মৌল প্রবণতা কিছু পরিমাণে অপ্রত্যক্ষ হলেও তা আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য নয়।

নবীনচন্দ্র যে যুগে কাব্য রচনা করেন, সে হল জাতীয় জীবন পুনর্গঠনের যুগ। কবিরাও সেই কর্মে আপন সাধনাকে একীভূত করেছিলেন; বিশেষত নবীনচন্দ্র। তিনি যুগের মর্মবাণী আপন কাব্যে যেমন ব্যক্ত করেছেন, আগামী দিনের জাতি-গঠনের কাজকেও তেমনি ব্রত বলে মেনেছিলেন। তাই কবি-হৃদয়ের, তথা যুগ-মানসের নানা ভাবের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর কাব্যে সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষভাবে।

যদিও নবীনচন্দ্র চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে ছিলেন গীতিকবির শ্রেণীভুক্ত, তথাপি যুগপ্রয়োজনে, যুগপ্রবণতায় তাঁকে মহাকাব্য, আখ্যায়িকাকাব্য রচনা করতে হল। গীতিকবি রূপে তাঁর কাব্যে দেখি প্রেমের রহস্যময়তা, অনির্দেশ্য বেদনাবোধ। প্রকৃতির অতলান্ত সৌন্দর্যে আত্মনিমজ্জন, তার সঙ্গে একটি মর্মগত ঐক্যবন্ধন অনুভবের জন্য আকুতি প্রকাশ। স্বদেশপ্রেমও কবিচিত্তে অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত অনুমোদন ব্যতিরেকেই সুচির প্রভাব বিস্তার করেছিল। গীতিকবিতার আঙ্গিকে, মহাকাব্যের আধারে তাঁর স্বদেশ চেতনার ক্রমপরিণত রূপটি প্রত্যক্ষ হয়েছে। স্বদেশ ও স্ব-ধর্মসংস্কৃতি প্রসঙ্গে

চিরদিনই কবির একটি বক্তব্য ছিল। কবিচিত্তে অবশেষে যখন ঈশ্বরানুরক্তির আধিক্য দৃষ্ট হল, কবি শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করলেন, তখন তাঁর কাব্যে কবির অধ্যাত্ম চেতনার আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করি। কাব্য-বিষয়ের দিক থেকে নবীনকাব্যে প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ ও স্বধর্মের প্রেরণাই প্রাধান্য লাভ করেছে।

প্রেম

নবীনচন্দ্রের কাব্যের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু প্রেম। নারীপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের ধারা এসে মিলিত হয়েছে ভগবৎ প্রেমের মহা-সমুদ্রে। কবিচিত্ত যেন বিদ্যাপতির রাধার মত মুগ্ধতা ও প্রেমবিহ্বলতার সকল স্তর অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী প্রেমের রমণীয় প্রশান্তির মধ্যে আত্ম-নিমজ্জন করেছে।

ব্যক্তিগত জীবনের অচরিতার্থ প্রেমের বেদনার প্রকাশ ঘটেছে নবীনচন্দ্রের কাব্যে। তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে দেখি একাধিক নারীর সঙ্গে তিনি হার্দিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁর আপন উপলব্ধির বেদনাময় প্রকাশেই প্রেমের প্রসঙ্গে তিনি দক্ষ শিল্পী। কবি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণয়াস্পদার স্মৃতির রোমন্থন করেছেন।

'আমি এ জীবনে তুইটি রমণীরত্নের ভালবাসা পাইয়াছিলাম। এই ভালবাসার নাম আন্তরিক বন্ধুতা, নিষ্কাম, অনাবিল, পুণ্যময়, প্রেমময়।... এরূপ অনলে দাহিত ও পবিত্রিত না হইলে আমি রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস লিখিতে, এবং শৈলজা-জরৎকারুর চিত্র আঁকিতে পারিতাম না।'

আমার জীবন, ৪র্থ নবীনচন্দ্র রচনাবলী ৩।১১৬

অবকাশরঞ্জিনী প্রথমভাগ থেকে প্রভাস পর্যন্ত কবির আপন বেদনার স্পর্শে কাব্যগুলি হৃদয়গ্রাহী। কখনও বা ব্যর্থ প্রণয়ের মর্মজ্বালায় কবি দিক্‌ভ্রান্ত কুল। তাই কাব্যে তার প্রকাশও নাটকীয়। -

আন সুরা,—আন বিষ, —ছুরি,
নিবাই দারুণ জ্বালা যন্ত্রণা পাসরি।

স্বপ্ন উন্মত্ততা, অবকাশরঞ্জিনী. ২।২৮৬

আবার বাসুকির মর্মবেদনায় কবিরই ব্যথাহত কণ্ঠস্বর শুনি,

শরীরের কোন্ অংশ মানব হৃদয়,
কহ ঋষি। কাটি তাহা কৃপাণে এখনি
নিক্ষেপি সম্মুখে তব জলন্ত অনলে।

কখনও তীব্র হৃদয়াবেগকে সংযত করে যে বিশ্ববিনোদিনী ছবি তাঁর অন্তরাকাশে বিরাজমান তারই ধ্যানে তিনি আবিষ্ট-চিত্ত। এখন প্রিয়ার স্মৃতি সম্বল করেই কবি জীবন অতিবাহিত করবেন। 'কোন শরৎ পূর্ণিমার রাত্রে তাহার সহিত চিরমিলন হইবে' এই আশাই বিরহী কবির একমাত্র সান্ত্বনা।

আশার সুদূর প্রান্তে তেমতি তোমায়
স্থাপিয়া, জীবনে মম
এই নীলসিন্ধু সম
ঝলসিব, সুখ দুঃখ তরঙ্গনিচয়
সচঞ্চল, হবে তব প্রতিধ্বনিময়।
জলিবে, নিবিবে উর্মি হাসিবে নাচিবে।
সেই প্রতিবিম্ব তলে,
অনন্ত আশার জলে,
সেই নৃত্য, সেই ক্রীড়া দেখিয়া দেখিয়া,
আশাজলে দেহতরী দিব ভাসাইয়া।

কি করি, অবকাশরঞ্জিনী ২।২৯২

'উত্তর' কবিতায় দেখি জীবনের এই তীরে তাঁর মিলনের প্রত্যাশা অন্তহীন ব্যর্থতায় পরিসমাপ্ত।—

এখন সে আশা-আলো, হায়! দূর-দরশন,
সুদূর—স্বপন!
কতবার পাই পাই, উন্মত্ত অন্তরে ধাই,
চকোরের আকিঞ্চন,
যথা চন্দ্র পরশন।...
নিবুক নিবুক প্রিয়ে! দাও তারে নিবিবারে,
জালিও না আর;
উন্মত্ত জলধিরূপ, উন্মত্ত-জীবন-জলে,
অস্ত যাক্ শেষ-তারা,
হ'ক্ সব অন্ধকার!

অবকাশরঞ্জিনী, ২।২০৮-২০৯

মিলনের মধ্যে যাকে একক সুনির্দিষ্টরূপে লাভ করেছিলেন, বিরহের স্পর্শে সে যেন বিশ্বব্যাপিনী মূর্তি পরিগ্রহ করে ধরা দিল।—

যেদিকে ফিরাই আঁখি হেরি তারে নয়নে,
যেই দিকে কান পাতি শুনি তারে শ্রবণে ;
নয়নের কাছে, তার চিত্র ভেসে আছে,
রয়েছে সখি মিশাইয়া জীবনে,—

হৃদয়-উচ্ছ্বাস. অবকাশরঞ্জিনী, পৃ ১২৯

শ্রীমতী রাধার বিরহের মত এখানে প্রিয়বিচ্ছেদে মনে হয়েছে 'ত্রিভুবনম্ অপি তন্ময়ং বিরহে'।

দাম্পত্য জীবনের সুখস্মৃতির ... 'একদিন' কবিতাটি রচিত। গার্হস্থ্য জীবনের সহজ, অনাবিল প্রীতিরসে মুগ্ধচিত্ত কবি মহাকাব্যের কুরুক্ষেত্রের রণনির্ঘোষের মধ্যেও অর্জুন-সুভদ্রা, শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা, উত্তরা-অভিমন্যুর যৌথ জীবনের মাধুর্য উপভোগে সর্বদায়িত্ব বিস্মৃত। সমালোচকের দৃষ্টিতে কবির এজাতীয় মনোভাবে মহাকাব্যের মর্যাদা হানি ঘটেছে। মহাকাব্যের কঠিন নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে এই স্নেহপ্রীতির তরল উচ্ছ্বাসের অবকাশ নেই। কবি নবীনচন্দ্র সে বিধিনিষেধকে মান্য করেন নি।

'পলাশির যুদ্ধ' ও 'রঙ্গমতী' কাব্যে নবীনচন্দ্রের প্রণয়ভাবনা একটি বিশেষ রস সৃষ্টি করেছে। এখানে সিরাজদ্দৌলার মৃত্যুর ট্র্যাজেডি শুধু ভারতের পরাধীনতার সূচনায় নয়, সিরাজ-মহিষী লুৎফুন্নিসার সর্বনাশের সম্ভাবনার মধ্যে নিহিত। রঙ্গমতী কাব্যে নায়ক বীরেন্দ্রের অদৃষ্টের নিয়ন্তা প্রেম। তার স্বদেশ উদ্ধারের ব্রত অসমাপ্ত থাকল। অসার্থক প্রণয়ের বেদনায় প্রাণত্যাগ করে তার সর্বদুঃখের অবসান হয়েছে। পিতার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে, শিবাজীর সহায়তায় ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করে বীরেন্দ্র যখন দেখেছে তার প্রিয়া কুসুমিকা প্রাণত্যাগ করেছে, তখন সব কিছুই তার কাছে অর্থহীন হয়ে গেল। কুসুমিকার বিরহে 'আর্য স্বাধীনতা ধন', 'আর্যের বিক্রম', 'আর্যগৌরব জীবন' শুধুই অর্থহীন শব্দসমষ্টি।

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে বাসুকি, জরৎকারু শৈলজার অদৃষ্টচক্র যে কীলককে আশ্রয় করে আবর্তিত তার নামও প্রেম। মহাকাব্যের উপযোগী চিরায়ত কাব্যকলার মধ্যে আধুনিক উপন্যাসের দ্বন্দ্বজটিল জীবনাবর্তের

তিরূপ সৃষ্টি করে কবির প্রণয়-ভাবনা চরিতার্থ হলেও মহাকাব্যের শিল্প-রীতির পক্ষে তা ত্রুটি বলেই গণ্য হবে আত্ম-সম্পর্ক বা Personal element নবীন-সাহিত্যের একটি রস সৃষ্টি করলেও, মহাকবির অনাসক্তি ও নিরপেক্ষতার হানি হয়েছে। হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে কবি আপন কল্পনাকে সং... না করে কৃষ্ণ অর্জুন, বাসুকি জরৎকারু শৈলজা সুভদ্রার ত্রিভুজ ... জটিল অরণ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করেছেন। আর পাত্রপাত্রীদের অন্তর্দ্ব...কে মহাকবির গুরুদায়িত্ব বিস্মৃত করিয়েছে।

নবীনচন্দ্রের কাব্যের প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখি সেই প্রেম একান্তই ইন্দ্রিয় সচেতন,—ইন্দ্রিয় সম্পৃক্ত এবং ব্যক্তিসম্পৃক্ত। নারীর রূপের প্রতি তাঁর সহজাত প্রীতিতে, দয়িতাকে একান্ত ক...র পাওয়ার আগ্রহে তাঁর কাব্য-কবিতায় কবি-হৃদয়ের উষ্ণ সান্নিধ্য অনুভূত হয়। আকাঙ্ক্ষা, প্রতিমা বিসর্জন, হতাশ, হৃদয়-উচ্ছ্বাস প্রভৃতি কবিতা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দেহগত, রূপগত এই প্রেমভাবনার অকৃত্রিম প্রকাশের বৈশিষ্ট্যে, অকপট আত্মোদ্ঘাটনে বহু যথার্থ গীতিকবিতার সৃষ্টি হয়েছে। কবি গোপনে প্রণয়পুষ্পে, নয়নের জলে হৃদয়বাসিনী পাষাণময়ী দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করেছেন। আজীবন সেই রূপ সম্ভোগের বাসনা দগ্ধ করেছে তাঁকে,

প্রিয়তম !
সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ সেই পদ্মানন —
আকর্ণ বিশ্রান্ত সেই বিস্তৃত নয়ন,
আবৃত নিদ্রায়; সেই চারু রক্তাধর
জীবনের মদিরায় সিক্ত নিরন্তর,···

সেই বর্ণ,—যেই বর্ণ নয়নের জ্যোতি,
মম জীবন-আলোক,
কত দীর্ঘ বর্ষ যাহা জাগ্রতে, নিদ্রায়,
করেছে হৃদয় মম বিভাসিত, হায় !

স্বপ্ন উন্মত্ততা, অবকাশরঞ্জিনী, ২।২৮০

বাস্তবজীবনে কবি বঞ্চিত হয়ে স্বপ্নে প্রিয়ার দর্শন, লাভ করেছেন, সেই মধুর মুহূর্তকে তিনি অক্ষয় করে তুলবেন মৃত্যুময় বিস্মরণের ক্রোড়ে,

ছাড় কর, দাও ওই তীক্ষ্ণ ছুরি খানি,
সর্বস্ব অর্পণ করি,
কালের চরণে পড়ি,
সেই মুহূর্তটি আমি ভিক্ষা মাগি' আনি।

স্বপ্ন উন্মত্ততা, অবকাশরঞ্জিনী ২।২৮৬

কাব্যত্রয়ীতে জরৎকারু ও বাসুকি এই রূপগত, ইন্দ্রিয়সচেতন প্রেমেরই উপাসক। শ্রীকৃষ্ণ জরৎকারুকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন, জরৎকারুর প্রেম তাতে সন্তোষ লাভ করে নি। প্রিয়কে একান্ত আপনার করে না পাওয়ার বেদনা তার হৃদয়ে বেজেছিল মর্মান্তিক ভাবে। বাসুকিরও অনার্য প্রাণধর্ম নির্মল, স্বর্গীয় সৌন্দর্যরূপিণী সুভদ্রাকে আত্মসাৎ করার বাসনায় আপন ইহকাল পরকাল সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছে। বাসুকি ও জরৎকারুর অচরিতার্থ প্রণয়ের বহ্নিদাহ প্রিয়জনকে দগ্ধ করে, ধ্বংস করে উপশমিত হল। অদৃষ্টে অলক্ষ্য প্রভাবের মত বাসুকি ও জরৎকারুর প্রণয়বেদনা সমগ্র কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধকে এক মৃত্যুময় পরিণামের পথে করেছে পরিচালিত।

আবেগউচ্ছ্বসিত প্রেমবিহ্বলতার প্রকাশেই নবীনচন্দ্রের কাব্যকবিতা বিশিষ্ট নয়, নিষ্কামপ্রেমের (Platonic love) আদর্শ উপস্থাপনাও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। অবকাশরঞ্জিনীতে কবি বাল্য প্রণয়িনীকে স্মরণ করে লিখেছেন,

যে মনে তোমায় ভাল বাসিয়াছি আমি,
নিরমল, পাপশূন্য, পাপ আকাঙ্ক্ষায়
নহে কলুষিত তাহা তুমি কি জান না আহা!
ভালবাসা তরে ভাল বেসেছি তোমায়,

'কি লিখিব', পৃ ১৪৯

রঙ্গমতী কাব্যে বীরেন্দ্র-কুসুমিকার, এবং পলাশির যুদ্ধ কাব্যে লুৎফুন্নিসার প্রেম অনাবিল, শান্ত, স্নিগ্ধ। দয়িতের কল্যাণেই তাঁরা আপন মঙ্গল মেনেছেন। কাব্যত্রয়ীতে রুক্মিণীর মধ্যেও দেখি প্রিয়ের ইচ্ছা, তাঁর শুভ কামনাই তাঁর সর্বস্ব। আপনাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করেই তাঁর প্রেম চরিতার্থ। নবীন কাব্যে প্রেমভাবনা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছে 'শৈলজা'র চরিত্র পরিকল্পনায়। একটি সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি যে প্রেমের সঞ্চার, নানা ঘাত-

প্রতিঘাতে ক্রম পরিণতির স্তর বাহিত হয়ে তা বিশ্ব প্রেমের মধ্যে আত্মবিলীন করেছে। ব্রজগোপীর 'অকৈতব কৃষ্ণ প্রেমে'র মূর্ত প্রতীক 'শৈলজা' তার সূর্যমুখীর তপস্যার শেষে অনুভব করেছিল 'এই চরাচর হইল অর্জুনময়'। তারপর,—

কভু পার্থ পতি আমি প্রেমে আত্মহারা
কভু পার্থ পিতা, আমি ভক্তিতে অধীরা।
কভু পার্থ মাতা, আমি স্নেহে নিমজ্জিতা;
কভু পুত্র পার্থ, আমি বাৎসল্যে পূরিতা।
কভু পার্থ সখা, আমি সখী বিনোদিনী;
কভু পার্থ প্রভু, আমি দাসী আজ্ঞাধীনী।
কভু আমি পার্থ, পার্থ শৈলজা আমার;
অভিন্ন উভয় কভু নদী পারাবার।

কুরুক্ষেত্র, ১৩।৬৭

এখানে শৈলজা শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর এই পঞ্চভাবের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছে। লৌকিক প্রেমের আশ্রয়ে সে লোকাতীত অতীন্দ্রিয়, আধ্যাত্মিক প্রেমের স্তরে উন্নীত হল। অবশেষে অতল স্পর্শ বিরহের সমুদ্রে অবগাহন করে যে রত্ন সে আহরণ করেছে, একমাত্র বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীমতী রাধাই তার অধিকারী—অনুদিন মাধব মাধব (সোঙরিতে) সুন্দরী ভেলী মাধাই' নিষ্কাম প্রেমের এই সকরুণ চিত্রটিও কবির সংবেদনশীলতায় অপূর্বজীবন রসে নিষিক্ত, মনোরম হয়ে উঠেছে।

অমিতাভ ও অমৃতাভ জীবনী-কাব্য দুটিতে কবির রোম্যান্টিক প্রণয় ভাবনার আত্মপ্রকাশের অবকাশ অল্প। গোপার পূর্বরাগ, অনুরাগের দৃশ্যে শান্ত সংযত কাব্য রসের অবতারণায় এই অধ্যাত্ম প্রেরণাজাত কাব্যটি অপূর্ব মাধুর্যে ভূষিত। জীবনরসিক ছিলেন বলেই নবীনচন্দ্র ভগবদ্‌প্রেমের কূলপ্লাবী জোয়ারের মধ্যেও মানবিক প্রণয়ের বেদনা আন্তরিকভাবে অনুভব করেছেন, কাব্যে দেখি তারই রসসিদ্ধ নিবেদন।

প্রকৃতি

নবীনচন্দ্রের প্রকৃতি-চেতনা তাঁর কাব্যকে এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছিল। সমকালীন বাংলা কাব্যের নিসর্গ বর্ণনার গতানুগতিকতার

মধ্যে নবীন কাব্য নব্যদৃষ্টি সূচনা করল। এবিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ ও বিহারীলালের সহযাত্রী। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চেতনা সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি নবীনচন্দ্র সম্পর্কেও একদিক থেকে প্রযোজ্য।

'রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাই প্রকৃতির বিপ্রতুলতা ও রহস্যকে। আড়ম্বর ও বাহুল্যবর্জিত বলেই তা প্রাণবন্ত, অসাধারণ চক্ষুষ্মান প্রতিভা সেখানে কেতাবী বর্ণনা-পদ্ধতির মোহপাশ কাটিয়ে নিজের চোখ ও মনকে বড় বলে মেনেছে, সে দর্শনও যেমন নিখুঁত, তেমনি Convincing.'

বিচিত্রা, ১৩৩৮, আশ্বিন

নবীনচন্দ্র সম্পর্কেও একথা অত্যন্ত সত্য। কেতাবী বর্ণনার মোহ তিনি অস্বীকার করেছেন, বড় বলে মেনেছিলেন নিজের চোখ ও মনকে। আর এই প্রকৃতি দর্শন ছিল Convincing—সন্দেহ নেই।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবের অন্তরঙ্গ যোগসূত্রটি তাঁর অজ্ঞাত ছিল না।— 'যখন ভাবি যে, এই মহারঙ্গভূমে, যেখানে সৌরজগৎ প্রভৃতির অনন্তকাল হইতে অনন্ত অভিনয় হইতেছে, আমিও তাহাতে রূপান্তরে অনন্তকাল হইতে অভিনয় করিয়া আসিতেছি, তখন হৃদয় কি আত্মগরিমায় পূর্ণ হয়! তখন আমাকে আর একটি ক্ষণজীবী ক্ষুদ্র পতঙ্গ বিশেষ বলিয়া বোধ হয় না।'

আমার জীবন, ১ম, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ১।১

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে, বিশ্ব জীবনের সঙ্গে একাত্মীয়তার উপলব্ধিতে নবীনচন্দ্রের নিসর্গচেতনা পরিপুষ্ট। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অভিন্নতার, এক সৌহার্দ্যের সম্পর্কে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। আর এই বিশ্বাসেই তাঁর কাব্য সমপর্যায়ের বাংলা কাব্য সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র। এখানেই তাঁর কাব্যে আগামী যুগের পূর্বাভাস।

বহিঃপ্রকৃতি কবির জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কবির হর্ষবিষাদ আশা-আকাঙ্ক্ষা সূর্যকরোজ্জ্বল দিবা ও তামসী রাত্রির দ্যোতনায় পরিস্ফুট। 'পিতৃহীন যুবক' কবিতায় নবীনচন্দ্রের প্রচণ্ড শোক এবং তৎকালীন জীবনের নিশ্ছিদ্র নৈরাশ্যের কথাই ব্যক্ত। দুঃখের আঘাতে যে জড়তার সঞ্চার হয়েছে কবির চিত্তে সুগভীর ভাবে নিবিড় রজনীর পটভূমিকায় তার প্রকাশ হয়েছে আরও স্পষ্ট। গঙ্গার কলকল ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কবি আপন মর্ম-

বেদনাকে ব্যক্ত করেছেন। পলাশির যুদ্ধের সিরাজের বিরুদ্ধে সেই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র দুর্যোগময়ী রজনীর পটভূমিতে আরও ব্যঞ্জনাময়। সেই রাত্রির রূপ,—

নীরদ-নির্মিত নীল চন্দ্রাতপ তলে
দাঁড়াইয়া তরুরাজি, স্থির, অবিচল,—
প্রস্তরে নির্মিত যেন! জাহ্নবীর জলে
একটি হিল্লোল নাহি করে টলমল।
না বহে সময়-স্রোত, জাহ্নবীর জল;

পলাশির যুদ্ধ, প্রথম সর্গ

কি যেন এক আসন্ন সর্বনাশের প্রতীক্ষায় সমস্ত প্রকৃতি স্তব্ধ। কালস্রোতও যেন প্রবাহহীন। সমগ্র দেশের অদৃষ্টাকাশে যে দুর্যোগের সূচনা এই প্রকৃতির বর্ণনাও তারই প্রতীক।

ভয়ানক অন্ধকারে ব্যাপ্ত দিগন্তর,
তিমিরে অনন্তকায় শূন্য ধরাতল।

সেই মহাবিপ্লবে, সেই সর্বনাশে, ষড়যন্ত্রে, জাতীয় জীবনের সেই সঙ্কট মুহূর্তেও রানী ভবানীর ন্যায়পরায়ণতা ও বীর্যবত্তা, মোহনলালের শৌর্য ও আত্মোৎসর্গ ক্ষীণ আশার ব্যঞ্জক। তারই দ্যোতনা ছিল—

কেবল কতটি রশ্মি গবাক্ষ বিদারি,
একটি মন্দির হ'তে হইয়া নির্গত
তমোরাশি মাঝে ক্ষীণ আলোক বিস্তারি
শোভিছে, আকাশ-চ্যুত নক্ষত্রের মত।

কাব্যের সূচনায়ই দেখি কাহিনীর পরিণতি আভাসিত।

শুধু পলাশির যুদ্ধ নয় নবীনচন্দ্রের অধিকাংশ কাব্যই আরম্ভ হয়েছে নিসর্গরূপ সম্ভোগের মধ্যে দিয়ে। ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্টের উপস্থাপনায়, দেশের সদ্য অপহৃত স্বাধীনতার বেদনার প্রকাশের জন্য প্রাকৃতিক পটভূমিকা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত হয়েছিল তাঁর কাছে। শুধু এখানেই নয় কাব্য ত্রয়ীতে যেখানে কবি মহাভারত সংকলনের আয়োজনে ব্রতী, 'অমিতাভে' বুদ্ধের জীবনলীলা কাহিনী রচনায় উদ্‌যোগী, সেখানেও নৈসর্গিক সৌন্দর্যের স্তুতিপাঠ করেই কাব্যারম্ভ হল। এ যেন নবীন-কবির মঙ্গলাচরণ পাঠ।

নবীনচন্দ্র তাঁর কাব্যে যে প্রকৃতির উপাসক সে হল জন্মভূমি চট্টগ্রামের

ললিত-ভৈরব প্রকৃতি। তার একদিকে উত্তুঙ্গ শীর্ষ পাহাড়-পর্বত, অন্যদিকে অকূল সমুদ্র। একদিকে পর্বতের উচ্চতা, অন্যদিকে ঘন অরণ্যের নিবিড় শ্যামলিমা। নবীনচন্দ্রের কাব্যের মধ্যে দেখি, কবি যত্রতত্র সব উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে, সর্ব কর্ম স্থগিত রেখে জন্মভূমির সৌন্দর্যধ্যানে আত্মনিমগ্ন। নবীনকাব্যের মত পর্বত ও সমুদ্রের এমন সজীব বর্ণনা, এমন দূরপ্রসারী প্রেরণা সমকালীন বাংলা সাহিত্যে সুলভ ছিল না। বঙ্গদেশের উচ্চভূমিবাসী (High Lander) কবির কাব্য পার্বত্যরূপ-পিপাসু পাঠক পাঠিকাকে আনন্দ-দানে সক্ষম হয়েছিল। গতানুগতিক প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে এই অভিনব সৌন্দর্যধ্যান যে নূতন স্বাদের সঞ্চার করেছিল,—বাঙালী রসিক পাঠক সমাজ তাকে স্বাগত জানিয়েছিল।

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, 'আমরা নবীনচন্দ্রের কাব্য সমগ্রভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাইব, পর্বত এবং সমুদ্র তাঁহার কাব্যের এক চতুর্থাংশ জুড়িয়া রহিয়াছে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে স্থানে অস্থানে কবি পর্বত এবং সমুদ্রের দীর্ঘ বর্ণনা দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এই সকলের বর্ণনায় তাঁহার প্রতিভার একটা বিশেষ স্ফূর্তি ছিল, কারণ, এই সকল দিয়াই তাঁহার অন্তরধাতু গড়া ছিল।'

বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, পৃ ২১২

পর্বত সমুদ্র শুধু বস্তুরূপে নয়, কবির মগ্ন-চৈতন্যের প্রেরণার মত, সূক্ষ্ম মনোময় রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর কাব্যের কাহিনী ও চরিত্র নির্বাচনে পর্বতের বিরাটত্ব ও বলিষ্ঠ উচ্চতা এবং সমুদ্রের প্রভাব রচনা-রীতিতে, কল্পনার প্রসারতায় দৃষ্ট হয়।

চিত্রকল্প রচনায় ও উপমাপ্রয়োগে নবীনচন্দ্র গতানুগতিক ছিলেন না, তাঁর—

সাগর কপোতে—
খেলে যেই মতে শান্ত সুনীল সাগরে
প্রসারিয়া পক্ষপুট জলধি উপরে।

অথবা,

চন্দ্র করে শ্যাম গিরি কলেবর
হাসে ঝোপে ঝোপে মলিন হাসি।

অথবা,

সম্মুখে আমার
গিরিবর ভীম অঙ্গ অর্ধচন্দ্রাকারে
দিয়াছে ঢালিয়া যেন নীল কাঞ্চি জলে।

প্রভৃতি উপমা উৎপ্রেক্ষা ও বর্ণনা সমকালীন বাংলা সাহিত্যে খুব সুলভ ছিল না। শস্যশ্যামলা, সমতল বঙ্গভূমির সাহিত্যে এগুলি অভিনব সন্দেহ নেই। তদানীন্তন বিখ্যাত সাময়িকপত্র Englishman-এ নবীনচন্দ্রের প্রকৃতি-চেতনা উচ্চ প্রশংসিত এবং Swinburn -এর কবিতার সঙ্গে তুলনীয় হয়েছে। —The influence of the Sea-shore in assisting the poet's meditation and ecstasy has been ably depicted in a recent novel by the well-known Poet Babu Nabin Chandra Sen in language which reminds the reader at times Mr. Swinburne's poem of the joy and splendour of the Sea.

—আমার জীবন, ৫, নবীনচন্দ্র রচনাবলী ৩।০৭

প্রকৃতিপ্রেমিক নবীনচন্দ্রকে তাঁর সব কাব্যেই আবিষ্কার করা যায়। অবকাশরঞ্জিনীর খণ্ড কবিতায়, পলাশির যুদ্ধে, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাসে কবির নিসর্গ-চেতনা কখনও স্বতন্ত্র বর্ণনায়, কখনও অন্তরঙ্গ ভাবের পরিপূরক হয়ে কাব্যকবিতাকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। কিন্তু নবীনচন্দ্রের প্রকৃতি-প্রেমের চরম উৎকর্ষ দেখা যায় রঙ্গমতী কাব্যে ও ভানুমতী উপন্যাসে। প্রকৃতিই এখানে যেন সহনায়িকার স্থলাভিষিক্ত।

রঙ্গমতী প্রসঙ্গে শশাঙ্কমোহন সেন বলেন,—'জন্মভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি প্রত্যক্ষভাবে সেই সৌন্দর্যের মধ্যস্থলে আপন কাব্য-বীণাপাণিকে স্থাপনপূর্বক, যদৃচ্ছ সঙ্গীতে নিজের হৃদয়কে ছাড়িয়া দিয়াছেন।'

—বঙ্গবাণী, পৃ. ৭৮

রঙ্গমতী কাব্যের সূচনা সৌন্দর্য-সম্ভোগে। কবি বসন্ত ও ধরিত্রীর প্রণয়ের উপমায়, মধুসূদনের কাব্যাঙ্গিকের অনুসরণে প্রথমাংশে লেখনীর অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলেও ক্রমশ সহজ হয়ে এসেছেন। তৃতীয় সর্গের অধিকাংশ স্থলে দুরধিগম্য ও বাঙালী পাঠকের কাছে অজ্ঞাতপ্রায় আরণ্য ও পার্বত্য প্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাই। নায়ক বীরেন্দ্রের চন্দ্রশেখর তীর্থে গমন উপলক্ষে কবি তাঁর যাত্রাপথের চারপাশের প্রকৃতি-পরিবেশের চিত্র

অঙ্কন করেছেন। এমন কি, দীর্ঘ বর্ণনা পাঠকচিত্তে ক্লান্তি ও উদাসীনতার সঞ্চার করতে পারে—কবি সেই আশঙ্কাও বিস্মৃত। চম্পকারণ্য, ব্যাস সরোবর, কলকণ্ঠী মন্দাকিনী, একের পর এক বিস্তৃত বর্ণনায় কবি সেই সৌন্দর্য-স্মৃতি রোমন্থন করেছেন; সপ্ত জিহ্বাত্মক বহ্নি, পার্বত্য নদী-নির্ঝরিণী-কুণ্ডের বর্ণনা দিয়েছেন খুব সাবধানে। প্রত্যক্ষ দর্শন ও একাত্মতার প্রমাণ বর্ণনীয় বিষয়ের সজীবতা ও পুঙ্খানুপুঙ্খতা থেকেই পাওয়া যায়। প্রথমে কবি আঁকলেন কুমারী কুণ্ডের চিত্র,—

সলজ্জ কুমারী কুণ্ড আছে লুকাইয়া,
নিবিড় অরণ্যময় পর্বত গহ্বরে,
বঙ্গের কুমারী যেন বঙ্গঅন্তঃপুরে।
... ... প্রেমরূপী বহ্নি
দেখালে সলিলে, হাসি মুহূর্তেক অগ্নি
কুমারী-হৃদয়ে, কুমারী-লজ্জায়, মরি
যায় মিশাইয়া।

—রঙ্গমতী, তৃতীয় সর্গ

কিন্তু 'বাড়ব উত্তরে জলিত প্রলয়াগ্নি শতজিহ্বাত্মক' তার সম্পূর্ণ পৃথক।

দৈত্যযুদ্ধে, মহাশক্তি মহাক্রুদ্ধা যবে,
গলদ্রক্তনিভাননা—ছাড়িয়া নিঃশ্বাসে
যেই কাল-জ্বালানল, ভেদিয়া পাতাল,
দহিয়া সলিল রাশি, উঠিল হুঙ্কারি
এই কুণ্ডে।

—রঙ্গমতী, তৃতীয় সর্গ

সাতটি উষ্ণপ্রস্রবণের বর্ণনা দিয়েছেন। নিসর্গপ্রেমিক কবির লেখনীতে প্রত্যেকটির রূপ স্বতন্ত্র এবং সজীব।

নবীনচন্দ্রের রঙ্গমতীর প্রকৃতি-বর্ণনা কোন কোন পাঠক বা সমালোচককে Scott বা Swinburne-এর কথা স্মরণ করায়। অনেক বিরূপ সমালোচক তাকেই আবার 'প্রাণের সহিত উপভোগ না করার' অভিযোগ করেছেন। কবির বন্ধুস্থানীয় ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে,—'প্রাকৃতিক বর্ণনা বাদ দিলে ভাল হইত'।—

—নবীনচন্দ্র রচনাবলী ২।১৬৫

আবার অবকাশরঞ্জিনী দ্বিতীয়ভাগ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে 'বাঙ্গালী কবি নয় কেন' এই প্রবন্ধের লেখক নবীনচন্দ্রের নিসর্গ-বর্ণনার নীরসতা ও গতানুগতিকতার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। 'কে তুমি' কবিতা থেকে—

আইল গোধূলি—সৌর রঙ্গভূমে,—
নামিল পশ্চিমে ধীরে যবনিকা
ধূসর বরণা ; ফুরাইল ক্রমে
দিনেশের দৈনিক গতি অভিনয়।
অষ্টমীর চন্দ্র-রজতের চাপ
নভোমধ্যস্থলে বিষণ্ণ বদনে
ভাসিল ; লভিতে যেন প্রিয় রবি
আলিঙ্গন, ভ্রমি অলক্ষ্যেতে শশী
অর্ধ সৌররাজ্য, বিরহেতে কৃশ
নিরাশা-মলিন।

এই অংশ উদ্ধৃত করে লেখক মন্তব্য করেছেন,—মন্দগমনা বিষণ্ণ সায়াহ্নের মুখ যাহার বিশেষ ভাল লাগে, সে কখনও এরূপ নির্জীব বর্ণনা করিতে পারে না। সূর্যের সহিত আলোকের অপসরণ, এই প্রাকৃতিক ঘটনামাত্রকে সে সন্ধ্যা বলিয়া জানে না ; তাহার হৃদয়ে সন্ধ্যার একটি স্বতন্ত্র জীবন্ত অস্তিত্ব আছে। —ভারতী, ১২৮৭, পৃ. ২১০

এখানে রবীন্দ্রনাথ ও বিহারীলালের প্রকৃতি চেতনার তুলনায় নবীনচন্দ্রের নিসর্গ-প্রেম অপরিণত হলেও পৃথক একটি স্থানের দাবিদার সন্দেহ নাই। সমকালীন অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিকদের তুলনায় নবীনচন্দ্রের প্রকৃতি-দৃষ্টি স্বচ্ছ, হার্দ্য, রহস্যময়। উপরোক্ত কবিতারই পরবর্তী পংক্তিতে দেখি,—

এমন সময়
ওই সরোবরে বসিয়া নীরবে
করেতে কপোল, কে ওই রমণী ?
যেন নিদাঘের আকাশ হইতে
একটি নক্ষত্র সরোবর ঘাটে
পড়েছে খসিয়া।

এখানে শারদীয় আনন্দ-উৎসবের মুখরতায় বঙ্গের বিধবা রমণীর দুর্বহ নিঃসঙ্গতা গগনচ্যুত একাকী নক্ষত্রের উপমায় বর্ণনাকে 'নির্জীব' করেছে বলে মনে হয় না। আর একটি রক্তাক্ত সন্ধ্যার চিত্র পাই পলাশির যুদ্ধের চতুর্থ সর্গে।—

মূর্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর,
শোণিত-আরক্ত-কায়,
অস্ত গেল রবি হায়!
অস্ত গেল যবনের গৌরব ভাস্কর।

নবীনচন্দ্রের হৃদয়ে এক একটি সন্ধ্যার এক একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল। কাব্যের অন্তরঙ্গ ভাবের সঙ্গে সৌষম্য রক্ষা করেই তিনি নিসর্গ চিত্রণ করেছিলেন। পলাশির যুদ্ধের অবসানে কবির তথা ভারতবাসীর হৃদয়-শোণিত ক্ষরণে বাংলাদেশের সান্ধ্য আকাশ সেদিন রক্তাভ। এই দৃষ্টি, এই প্রকাশ নবীনচন্দ্রের কাব্যকে হৃদয়হীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে বাধা দেয়।

উপরোক্ত লেখকই বাঙালি কবিসাধারণকে বাহ্য প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশের জন্য নিন্দা করেছেন। এখানে স্পষ্টতই বোঝা যায়, যে কবির কাব্য থেকে তিনি উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন তিনি হলেন নবীনচন্দ্র। লেখকের মতে,—'যখন আমরা একটি কানন দেখি তখন সে কাননের মুখের দিকে আমরা ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি না। কানন অর্থে একটি ভূমিখণ্ড যেখানে ফুলের গাছ আছে। আমরা জানি যে মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি ফুল দেখিতে ভাল এবং কবিতায় সে সকল ফুলের নামোল্লেখ করিলে ভাল শুনাইবে।'

—ভারতী, ১২৮৭, পৃ. ২৬৬

. নবীনচন্দ্রের প্রসঙ্গে এই অভিযোগ সেই যুগের পটভূমিতে অযথার্থ। প্রকৃতি-প্রসঙ্গে নবীনকাব্য কেতাবি বর্ণনার বাইরে যেতে উৎসুক ছিল তার প্রচুর প্রমাণ আছে। হতে পারে সে প্রকৃতি সমালোচকের অচেনা প্রকৃতি; বাংলা কাব্যের প্রকৃতি-বর্ণনায় এই যে লেখক প্রাণহীনতার উল্লেখ করেছেন তৎকালীন বঙ্গসাহিত্যের কবি নবীনচন্দ্র প্রসঙ্গে যথার্থ নয়।

নবীনচন্দ্রের কাব্যে আমরা একটি দ্বিপ্রহরের চিত্র পাই।—

প্রখর ভানুর করে তাপিত অবনী।
মণ্ডিত আতপতাপে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ
অদূরে জ্বলিতেছিল ধাঁধিয়া নয়ন,
বিহঙ্গ বসিয়া ডালে নীরবে অমনি।
কেবল বায়সগণ কখন কখন
কাতরে ডাকিতেছিল তৃষ্ণাভগ্ন স্বরে ;
গাভীগণ তরুতলে মুদিয়া নয়ন,
রোমন্থন করিতেছিল ক্লান্ত-কলেবরে।

—পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী, নবীনচন্দ্র রচনাবলী ৪।৩৮

এখানে কবির স্বচ্ছ, সহজ প্রকৃতি-দৃষ্টি বাংলাদেশের নিদাঘ মধ্যাহ্নের বর্ণনায় একটি স্নিগ্ধ চিত্ররস সৃষ্টি করেছে।

রঙ্গমতীতেও এমন একটি গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরের বর্ণনা আছে।—

নবীন নিদাঘ দিবা, হেথায় পশ্চিমে
ভাস্কর মুকুট, যেন বঙ্কিম গ্রীবায়,
(নিরখিয়া প্রতিযোগী বসন্ত নিগ্রহ)
ঈষদে হাসিতেছিল, বিতরিয়া মুক্ত
করে স্বর্ণ রাশি রাশি, তরল উজ্জ্বল !
সেই স্বর্ণ-কারুকার্যে—হীরক মার্জিত,—
রঞ্জিয়া ধবল বাস ; রঞ্জিত প্রান্তদ্বয়,
তীরস্থিত অবিচ্ছিন্ন কানন শ্যামলে ;
ওই স্রোতস্বতী ওই, নাচিয়া নাচিয়া
চলেছে সাগরোদ্দেশে। হিল্লোলে হিল্লোলে
নাচিছে তরণী ওই, চলেছে ভাসিয়া,
যেন ক্ষুদ্র জলচর, মন্থর গমনে।

—রঙ্গমতী, প্রথম সর্গ

এখানেও অপরাহ্লের অস্তগামী সূর্য, কলনাদিনী স্রোতস্বিনী, তীরস্থিত বনভূমি, আর তরঙ্গের দোলায় নৃত্যশীল একটি তরণীর উপস্থাপনায় একটি সুন্দর নিসর্গদৃশ্যের কাব্যময় প্রকাশ দেখি।

ভানুমতী উপন্যাসটি গদ্যে-পদ্যে লিখিত। এখানেও আছে একটি নিদাঘ দ্বিপ্রহরের বর্ণনা।—

দ্বিতীয় প্রহর বেলা। আকাশ মণ্ডল
ঘন কৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণ ঘোরতর
উঠিতেছে সিন্ধুগর্ভ হইতে উত্তাল।
মেঘের পশ্চাতে মেঘ, মহাদৈত্য মত,
মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিতেছে বেগে।
মহাকালী প্রকৃতির যেন মহাসেনা,
ছুটিয়াছে মহাহবে প্রচণ্ড বিক্রমে

—ভানুমতী, নবীনচন্দ্র গ্রন্থাবলী, বসুমতী সং

প্রকৃতিনন্দন নবীনচন্দ্র মুগ্ধ চিত্তে প্রভাত-মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যার পট পরিবর্তন নিরীক্ষণ করেছেন। চঞ্চলা তটিনী ও উত্তাল তরঙ্গশীর্ষ সমুদ্র, ভাদ্র মাসে ভরা পূর্ণজোয়ারের জলে মন্থরগমনা ভাগীরথী কবির চিত্তে আপন আপন বার্তা প্রেরণ করেছিল। কবি আত্মবিস্মৃত হয়ে, আত্মমগ্নভাবে সেই সৌন্দর্য সম্ভোগ করেছেন। কবি-চিত্ত আপনাকে বিস্তৃত করে দিয়েছিল জলে-স্থলে-আকাশে। কখনও সেই রসোদ্গারে, কখনও মনের অবচেতন স্তরে গূঢ় প্রেরণায় তার প্রকাশ ঘটেছে। কখনও নিছকই নিসর্গবর্ণনা, কখনও বা কোন ভাবের অখণ্ড, সুষম প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রকৃতি-চিত্রণ। স্ব-কালের মধ্যে নবীনচন্দ্রের প্রকৃতি-ভাবনা অনন্যসাধারণ।

স্বদেশ

নবীনকাব্যের প্রধান বিষয় হল স্বদেশপ্রেম। স্বদেশের কল্যাণসাধনাই ছিল তার সাহিত্যসাধনার মুখ্য প্রেরণা। যশোহরে এর সূত্রপাত। অবকাশ-রঞ্জিনী, পলাশির যুদ্ধ, রঙ্গমতীতে কবির স্বাদেশিকতার চেতনাই ক্রমপরিণত-রূপ গ্রহণ করেছে। অবশেষে স্বদেশের মঙ্গলসাধনাই কবির জীবনসাধনায় রূপান্তরিত হল। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস কাব্যত্রয়ীতে সমগ্র জাতির সম্মুখে আদর্শচরিত্র উপস্থাপনার জন্য হল—'National Hero' 'কৃষ্ণ' চরিত্র পরিকল্পিত।

নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের উন্মেষ ও বিকাশে শিশিরকুমার ঘোষের প্রভাব ছিল। 'যশোহরে লিখিত আমার খণ্ড কবিতায় ও পলাশির যুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রুবিসর্জন আছে, তাহা কথঞ্চিৎ শিশির-

কুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ফল। তিনি ও তাঁহার পত্রিকাই এই দেশে স্বদেশভক্তির পথপ্রদর্শক।'

—আমার জীবন ২ ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ১।২।১৫

শিশিরকুমার এই দেশের স্বদেশভক্তির পথপ্রদর্শক নন—সন্দেহ নেই। তবে তিনি নবীনচন্দ্রের গুরুস্থানীয় ছিলেন। যশোহরে অবস্থানকালীন শিশিরকুমারের স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনা নবীনচন্দ্রের হৃদয়েও সঞ্চারিত হয়েছিল। দেশের পরাধীনতার অপমান কবির দুঃসহ মনে হয়েছিল। কিন্তু কবির স্বদেশ-ভাবনা তখন একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করে নি। কখনও কবির পরাধীনতার গ্লানি নয়নজলেই ব্যক্ত, কখনও তীক্ষ্ণ তরবার, দুর্জয় কামানকে অস্ত্ররূপে, একমাত্র সম্বলরূপে গ্রহণ করে প্রত্যক্ষ সমরক্ষেত্রে পরাধীনতার কলঙ্ক অপনোদন করতে আগ্রহী। কিন্তু সেই সংগ্রাম কার বিরুদ্ধে কবি তা স্পষ্টভাবে বলেন নি। হয়ত বলা সম্ভব ছিল না রাজকর্মচারী নবীনচন্দ্রের পক্ষে। তবে নবীনচন্দ্রের যুগে বৈদেশিক শাসন-কর্তৃত্বের অবসান-কামনা জাতির সচেতন মনের সামগ্রী ছিল না। কিছু পরিমাণ রাজনৈতিক অধিকার অর্জন, দেশের শাসনব্যবস্থায় দেশবাসীর আংশিক মতামত দানের অধিকার স্থাপন, শাসক ও শাসিতের বিচারসাম্য প্রতিষ্ঠার বাসনাই ছিল সে যুগে বাংলাদেশের রাজনীতির লক্ষ্য। কখনও দেখি, 'পিঞ্জরে আবদ্ধ বিহঙ্গ শাবক' পরাধীন দেশের কবির কাছে দাসত্ব শৃঙ্খলভার দুর্বহ। কিন্তু প্রতিকারের পথ,—

রাণী যিনি, কহ তাঁরে এসব যাতনা,
কাঁদিবেন দয়াবতী ভারত রোদনে

—সায়ং চিন্তা, অবকাশরঞ্জিনী

নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমমূলক বই খণ্ড কবিতায়, আখ্যায়িকা-কাব্য পলাশির যুদ্ধ ও রঙ্গমতীতে যবনাধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পরাধীনতার সূত্রপাতের কথা বলা হয়েছে।

অবকাশরঞ্জিনী দ্বিতীয় ভাগে 'আবাহন' কবিতায় দেখি গিরিরাজ হিমাচল 'বিধর্ম পতাকা দেখিব না আর' এই ঘোষণা করে সপ্তশত বর্ষ মূর্ছাগত হয়ে আছেন। 'শব সাধন' কবিতায়ও তাই,—

নিবেছে অনল ? নিবেনি এখন,
কে নিবাবে বল,—নিবিবে কেমনে ?

সপ্তশত বর্ষ জ্বলিছে এমন,
কতশত বর্ষ জ্বলিবে কে জানে ?

হিন্দু রাজত্বের অবসানে বাংলার পরাধীনতা আরম্ভ হয়েছে—পলাশির যুদ্ধ কাব্যে কৃষ্ণচন্দ্রেরও এই অভিমত।—

সেনকুল কুলাঙ্গার, গৌড় অধিপতি,
সপ্তদশ অশ্বারোহী তুরকের ডরে,
কি কুলগ্নে কাপুরুষ বৃদ্ধ নরপতি
তেয়াগিল সিংহাসন সন্ত্রাস অন্তরে !
সেই দিন হতে যেই দাসত্ব-শৃঙ্খল
পড়েছে বঙ্গের গলে আর্যসুত-বল
আর কি পারিবে তাহা করিতে খণ্ডন ?

রঙ্গমতী কাব্যেও শিবাজীর হিন্দুরাজ্য স্থাপনার কল্পনায় বীরেন্দ্র উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে। শিবাজী তাকে যে ভারত-উদ্ধার-ব্রতে দীক্ষিত করেন, তা হল যবন অধিকার থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করবার ব্রত।

নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম অনেক সময় হিন্দুধর্ম-প্রীতি ও আর্যগৌরবের সঙ্গে অভিন্ন। কারণ স্পষ্ট ভাষায় ইংরেজ শাসনকে নিন্দিত করার মত মনোবল বা সুযোগ তখন ছিল না। তাই রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র এবং রঙ্গমতীতে নবীনচন্দ্র শত্রুপক্ষকে মুসলমান কল্পনা করেছেন,—তাঁদের দেশাত্মবোধক কাব্য রচনায়। প্রথমদিকে নবীনচন্দ্রের আর্যধর্ম-প্রীতি কখনও কখনও উৎকট আর্যামির পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। শ্রীসুকুমার সেন মনে করেন অবকাশরঞ্জিনীর এই পর্যায়ের কবিতায়—আর্যামিতেই কবির স্বাধীনতার কল্পনা সীমাবদ্ধ। দ্র. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড।

অবকাশরঞ্জিনী প্রথম ভাগ প্রসঙ্গে আমরাও পূর্বে উল্লেখ করেছি, এই পর্বে কবির স্বাদেশিকতার ধারণায় অপূর্ণতা ছিল। কিন্তু যখন পরবর্তী কাব্যে নবীনচন্দ্রের স্বদেশ-চেতনার পূর্ণবিকশিত রূপটি দেখি, সেখানে কি যথার্থই হিন্দুর সঙ্গে বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টানকে অভিন্ন, একই মর্যাদার অধিকারী বলে তার প্রত্যয় দৃঢ় ছিল ? এ প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে। এবং প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন।

আমরা দেখি স্বদেশের চিন্তার ক্ষেত্রে ক্রমশ কবির মনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষ এক ভারতীয়তার পরিকল্পনা প্রাধান্য লাভ করেছে। কবি শ্রীভগবানের মহম্মদীয় লীলার প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছেন ও সেই জীবনীকাব্য রচনার ইচ্ছাও তাঁর হয়েছিল।

হিন্দু ধর্ম শব্দটিই একদা নবীনচন্দ্র কদর্থব্যঞ্জক মনে করে তাকে নিন্দিত করেছিলেন। 'যবন বিপ্লবের পর হইতে তর্কভূষণ মহাশয়েরা হিন্দু নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। শুনিয়াছি, যাবনিক ভাষায় তাহার অর্থ গোলাম। তর্কভূষণ মহাশয়েরা ধর্মগ্রন্থের এরূপ ভয়ঙ্কর বিপদভঞ্জন অর্থ করিয়াই আজ পুণ্যভূমি আর্যস্থানকে হিন্দুস্থান এবং সনাতন আর্যধর্মকে হিন্দুধর্ম বা গোলামের ধর্মে পরিণত করিয়াছেন।'

কিন্তু ভানুমতী উপন্যাসে হিন্দু শব্দটিই স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এখানে হিন্দু শব্দটিই ভারতীয় শব্দের সমার্থক। 'এই ভারতের আসমুদ্র গিরি, আচট্টল গান্ধারে যে অসংখ্য লোক বাস করিতেছে, ইহাদের বিশ্বাস এক নহে, আকৃতি এক নহে, ভাষা এক নহে অথচ সকলেই হিন্দু।'

—ভানুমতী, নবীনচন্দ্র গ্রন্থাবলী

তৎকালীন যুগে বাংলাদেশের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গই হিন্দু বলতে ভারতীয়ই বুঝতেন। নবীনচন্দ্রও সম্পূর্ণভাবে না হলেও অংশত ভারতীয় অর্থেই হিন্দু শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তবে আর্যধর্ম-প্রীতি তাঁর ছিল।

হিন্দু জাতীয়তাবোধকে মোহাম্মদ মণিরুজ্জমান 'বিভীষণের প্রেত' নামে অভিহিত করেছেন।

'বিভীষণের প্রেত অলক্ষ্যে ক্রিয়া করছে বলে কাল্পনিক কাহিনীতে পর্যন্ত হিন্দু বীরের মাহাত্ম্য ঘোষণার জন্য প্রতিপক্ষকে মুসলমানরূপে ও হীনবর্ণে চিত্রিত করা হল। আত্মস্বার্থ অবহেলিত না হওয়ায় দেশাত্মবোধের কথা নিম্ন কণ্ঠে নেপথ্য ভাষণে উচ্চারণ করে ইংরেজ তোষণের বাণী উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত হল।'

—আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র, পৃ. ৭

নবীনচন্দ্রের হিন্দুয়ানী বা আর্যামি লেখকের কাছে অপেক্ষাকৃত সহনীয় মনে হয়েছে।

"নবীনচন্দ্র সেন অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছদৃষ্টি সম্পন্ন কবি। 'ত্রয়ী' কাব্যের পরিকল্পনার বিরাটত্ব ও ভাবকল্পনার ব্যাপ্তি হেমচন্দ্র অপেক্ষা তাঁর প্রতিভার

স্বাক্ষর। প্রথম প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসকে অবলম্বন করে জাতীয় আবেগ প্রকাশের কৃতিত্ব নবীনসেনের * * * বাঙ্গালীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা, চক্রান্তে অসহায় নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের কাহিনী কবি মর্মস্পর্শী তুলিতে চিত্রিত করলেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও, দ্বন্দ্বমুক্ত তিনি হতে পারলেন না। অবশ্যম্ভাবী যুগপ্রভাবে স্বার্থবুদ্ধি তাঁকে ইংরেজ তোষণে বাধ্য করল, ইতিহাসের অপূর্ণতায় চরিত্র নির্মাণের সৃষ্টি খণ্ডিত হল।"

—আধুনিক কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র, পৃ. ৮

ঐতিহাসিক জ্ঞানের অপূর্ণতার যথার্থ বিচার পূর্ব অধ্যায়ে করা হয়েছে। এখানে 'যুগপ্রভাবে স্বার্থবুদ্ধির প্রণোদনার' বিচার হওয়া প্রয়োজন।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ আপন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। একদা রামমোহনের প্রেরণায় জাতি পূর্ব থেকে পশ্চিমে মুখ ফিরিয়েছিল, এখন পশ্চিম থেকে পূর্বে মুখ ফেরানোর পালা। আমরা বলতে পারি পূর্বগামীরা আপন গৃহ পরিত্যাগ করে দূরকে আপন করার ব্রত গ্রহণ করেছিল। এখন, নবীনচন্দ্রের সময় কর্মী, সাহিত্যিক ও যোগী সকলেই ঘরে ফেরার জন্য উৎসুক। এখন স্বভাবতই স্বদেশের সনাতন ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিশেষত, এই সময় পাশ্চাত্য দেশবাসী বিবুধমণ্ডলী প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-দর্শনকে তার যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসন তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখলেন,—

The history of Mankind can be but imperfectly appreciated without some acquaintance with the Literature of the Hindus.—যোগেশ চন্দ্র বাগল, শ্রীজাগৃতি ও জাতীয়তা গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৭

নবীনচন্দ্রের যুগে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি জাতির চিত্তে শ্রদ্ধার আসন পেয়েছে। সুতরাং নবীন কাব্যে হিন্দু জাতীয়তাবোধ, অতীত গৌরবের অনুধ্যান স্বাভাবিক ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। তারই জন্য কখনও কখনও হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে জাতীয়তাবোধ পরিণত হয়েছে বিশুদ্ধ আর্যামিতে। এই হিন্দুধর্ম-প্রীতি জাতিবৈর নয় এটা ছিল স্বদেশ প্রেমের উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা। হিন্দু মুসলমানের প্রতিপক্ষ ছিল না।

নবীনচন্দ্রের স্বদেশ-চেতনার গণ্ডি মাত্র এইটুকুই বিস্তৃত ছিল না। কবি আর্যামি অথবা হিন্দুয়ানীর প্রবণতা অতিক্রান্ত হয়ে স্বপ্ন দেখেছেন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ভারতবর্ষের এক জাতীয়তার। তাই মুসলমান বাংলার সিংহাসন হারালে তিনি অনুভব করলেন—'আসিবে ভারতে চির বিষাদ রজনী' আর এ কারণেই তাঁর কণ্ঠে শুনি –

সিরাজের ছিন্ন মুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্তস্রোতের মতন।
নিবিল গৃহের দীপ; নিবিল তখন
ভারতের শেষ আশা হইল স্বপন।

—পলাশির যুদ্ধ, পঞ্চম সর্গ।

সিরাজদ্দৌলার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই কবি অনুভব করেছেন ভারতের সকল সুখ, শান্তি, সম্মান বিপর্যস্ত হবে। আর যে স্বার্থবুদ্ধি তাকে ইংরেজ-তোষণে বাধ্য করেছিল বলে সমালোচকের মত ইংরেজ ও ইংরেজ-ভক্তের দৃষ্টিতে তা ছিল রাজদ্রোহের নামান্তর। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রসঙ্গে শ্রীরেজাউল করীম যে মন্তব্য করেছেন, নবীনচন্দ্র সম্বন্ধেও তা প্রযোজ্য।—নবীনচন্দ্রের কাব্যও 'হিন্দুকে মুসলিম-বিতাড়নের আদর্শে দীক্ষিত করে নাই, দীক্ষিত করিয়াছে স্বদেশ মন্ত্রে।'—বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমানসমাজ, পৃ. ৩

নবীনচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেমের ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে দেখি কবির প্রথম যৌবনে রচিত অবকাশরঞ্জিনীর কবিতায় স্বদেশ সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় সত্যরূপে, স্বরূপে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে নি। প্রধানতই কবির দেশপ্রেম নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক অসাম্য ও কুসংস্কার এবং দুর্নীতির অবসান কামনায় চরিতার্থ। অবকাশরঞ্জিনীতে কবির 'স্বদেশ' কল্পনা অনেক সময় চট্টগ্রামের মধ্যেই সীমিত। চট্টগ্রামের বাইরে বাংলা দেশই তাঁর কাছে বিদেশ। 'ভগ্নাশ বিদেশী' কবিতায় তার বিদেশ বাংলা দেশেরই রাজধানী কলকাতা। রঙ্গমতীর নায়ক বীরেন্দ্র শিবাজীর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্যতম নায়ক নির্বাচিত হলেও মাতৃভূমি রঙ্গমতীর উদ্ধারেই তার জন্মভূমি উদ্ধারের ব্রত হল সমাপ্ত।

অবকাশরঞ্জিনীতে যদিও কবির স্বদেশ চট্টগ্রাম তবু দুঃখিনী ভারতের কথাও অস্পষ্টভাবে কবির হৃদয়ে উদ্রিক্ত হয়েছে। পলাশির যুদ্ধ কাব্যে কবির

স্বদেশ চেতনা বাংলা দেশে এবং ব্যাপক ভাবে ভারতবর্ষের বিস্তৃত অঙ্গনে আপনাকে প্রসারিত করল। স্বদেশের পরাধীনতার স্মরণে বেদনাদীর্ণ হৃদয়ে কবি রচনা করলেন এই কাব্যটি। তবে এখনও নবীনচন্দ্র আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষকে সর্বান্তঃকরণে স্বদেশরূপে কল্পনা করেন নি। অন্ততঃ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কবির স্বদেশ-ভাবনা শুধু চট্টগ্রামের সীমানা ত্যাগ করে বাংলা দেশকে আশ্রয় করেছে। ভারতবর্ষের কথা কবি ততটুকুই স্মরণ করলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সেই পরিমাণই মূল্যবান মনে হল তাঁর, যে পরিমাণে বাংলা দেশের সঙ্গে তার যোগ ছিল। এখনও বঙ্গ ও বঙ্গবাসীই কবির আপন জন। রাণী ভবানীর উক্তিতে আমরা নবীনচন্দ্রেরই হৃদয়-বাসনার প্রতিফলন দেখি।

অসহ্য দাসত্ব যদি নিষ্কোসিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি সমাজ
প্রবেশ সম্মুখ রণে ; যেন পূর্ণ শশী
বঙ্গ স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে
হাসুক উজলি বঙ্গ।

—পলাশির যুদ্ধ, প্রথম সর্গ

চতুর্থ সর্গে মোহনলাল ভীত সৈন্যদলকে বিপন্ন বঙ্গস্বাধীনতার কথা স্মরণ করিয়ে যুদ্ধে আহ্বান করেছেন,

দেখিছ না সর্বনাশ সম্মুখে তোমার ?
যায় বঙ্গ সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব কি দেখিছ আর ?

প্রচলিত অর্থাৎ পরবর্তী সংস্করণ 'পলাশির যুদ্ধ'-এ পাণিপথের সংগ্রামে ভারতের পরাধীনতার আরম্ভ মনে করা হলেও, প্রথম সংস্করণে 'সপ্তদশ অশ্বারোহী যবনের ডরে' চিরপরাধীন 'বঙ্গের' জন্যই কবি বেদনা অনুভব করেছেন। পরবর্তী সংস্করণে কবি সংশোধন করে লিখলেন—

সিরাজের ছিন্ন মুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্তস্রোতের মতন।

নিবিল গৃহের দীপ, নিবিল তখন
ভারতের শেষ আশা হইল স্বপন।

—পলাশির যুদ্ধ পঞ্চম সর্গ

কিন্তু প্রথম সংস্করণে দেখি,—

সেই শোণিতের স্রোতে হইল তখন
বঙ্গ স্বাধীনতা শেষ আশা বিসর্জন!

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কবির জন্মভূমি বাংলা দেশ। তবু অবকাশরঞ্জিনী প্রথম ভাগ থেকেই দেখি কবি কখনও কখনও ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের ঐতিহ্যের উল্লেখ করেছেন। পলাশির যুদ্ধেও প্রথম সংস্করণে কবি বঙ্গ-স্বাধীনতাকে ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে অভিন্ন বলে কখনও কখনও গ্রহণ করেছিলেন। ভারত-বোধ কবির মজ্জাগত, তবে রৈবতকের পূর্বে তার পূর্ণ বিকাশ হয় নি। অবকাশরঞ্জিনীর মত পলাশির যুদ্ধেও তার অস্পষ্ট রূপটি লক্ষ্য করা যায়। রাজরোষের আশঙ্কায় এবং স্কুলপাঠ্য সংস্করণে প্রকাশের উদ্দেশ্যে পরবর্তী সংস্করণে নবীনচন্দ্র নিম্নোক্ত অংশটি সংশোধন করেছিলেন। এখানে ভারতের পরিবর্তে যবন শব্দ ব্যবহৃত হল।

কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ!
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির বিষাদ রজনী।
অধীনতা অন্ধকারে চিরদিন তরে,
ডুবায়ে ভারতভূমি যেও না তপন,
উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ ক'রে,
কি দশা দেখিয়া আহা ডুবিছ এখন!

—পলাশির যুদ্ধ, চতুর্থ সর্গ

এছাড়া এই সর্গেই নবম শ্লোকে পরবর্তী সংস্করণে কবি কল্পনা করেছেন,

এসো সন্ধ্যে! ফুটিয়া কি ললাটে তোমার
নক্ষত্র-রতনরাজি করে ঝলমল?
কিম্বা শুনি যবনের দুঃখ সমাচার,
কপালে আঘাত বুঝি করেছ কেবল,

তাহে এই রক্তবিন্দু হয়েছে নির্গত ?
এস শীঘ্র প্রসারিয়া ধূসর অঞ্চল,
লুকাও যবন মুখ দুঃখে অবনত !
আবরিত কর শীঘ্র এই রণস্থল !

কিন্তু প্রথম সংস্করণে তৃতীয় পংক্তিতে যবনের নয় 'ভারতের' দুঃখ সমাচারের উল্লেখ আছে। সন্ধ্যার ধূসর প্রসর অঞ্চলের অবগুণ্ঠনে দুঃখে অবনত ভারত মুখ আত্মগোপন করুক কবি নবীনচন্দ্রের তখন এই ছিল আন্তরিক বাসনা।

রঙ্গমতীর নায়ক বীরেন্দ্র প্রকৃতির ক্রীড়াভূমি রঙ্গমতীর স্বাধীনতার কথা স্মরণ করেই উচ্ছ্বসিত তবু ভারতের স্বাধীনতা, হিন্দু জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও তার হৃদয়ে উদিত হয়েছিল। কবির ভারতউদ্ধার-কল্পনা শিবাজীর বাহুবল ও বুদ্ধিবলের আশ্রয়ে সাফল্যমণ্ডিত হতে আগ্রহী, উৎসুক। কবি এখানে স্বদেশ বলতে মাতৃভূমি চট্টগ্রাম অথবা বাংলা দেশকে গ্রহণ করলেও তিনি অনুভব করতে পারছেন যে সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, ভারতের কল্যাণ ও তাঁর ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জন্মভূমির কল্যাণ একই সূত্রে বিধৃত। রঙ্গমতী কবির সাহিত্য-জীবনের সন্ধিপর্বে রচিত। এখানে কবি উপলব্ধি করেছেন,—

ভারত সন্তান
এত দীর্ঘ শিক্ষা পরে শিখিল না আজি,
জাতিত্বের মহামন্ত্র, সর্ব-শক্তি-মূল একতা !

—রঙ্গমতী, ষষ্ঠ সর্গ

কাব্যত্রয়ীতে নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার গণ্ডিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে সমর্থ হল। কবির স্বদেশ বিশাল ভারতবর্ষ। কবির উপলব্ধিতে পুণ্য ভূমি জননী ভারত-মগধ, মিথিলা, চেদী, বিদর্ভ, অযোধ্যা, মথুরা, গান্ধার, অঙ্গ, বঙ্গ, উৎকল অজস্র খণ্ড, ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্তই নয়, পরস্পর বিচ্ছিন্ন। কবি উপলব্ধি করেছেন এই খণ্ড, বিচ্ছিন্ন ভারতে, বহু জাতি, সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতে, অর্থহীন জটিল কর্মকাণ্ডে লক্ষ্যভ্রষ্ট ভারতে, সনাতন ঐতিহ্যচ্যুত ভারতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে, নিষ্কাম কর্মযোগের প্রবর্তনায় মহাভারত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন,—'আমরা দেখিতে পাই কবির দেশাভিমানের ক্ষুদ্র পর্বত নির্ঝরিণী রৈবতকের পাদদেশে নির্মল উদার দেশপ্রেমের গঙ্গাপ্রবাহে পরিণত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র পরিক্রমা করিয়া এই প্রেম মহামানবের সমুদ্রে নির্বাণ খুঁজিতেছে।"—(কবি নবীনচন্দ্রের দেশপ্রেম, প্রবাসী ১৩৫৩, বৈশাখ)। এই বিচার খুবই যথাযথ।

রৈবতকে দেখি কৃষ্ণ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ভারত ও রাজন্যবর্গের পারস্পরিক ঈর্ষার বিষময় ফল অনুভব করেছেন,—

প্রত্যেক নৃপতি,
ক্ষুধার্ত শার্দুল মত, রয়েছে চাহিয়া
নিজ প্রতিবেশী পানে * * *
দহিয়া দহিয়া এই হিংসার অনলে
কমলার পদাশ্রিত বাণিজ্য-কমল,
জ্ঞানের সহস্রদল ভারতী-আশ্রয়,
শুকাইছে ; পড়িয়াছে হেলিয়া পশ্চিমে
আর্য সভ্যতার রবি।

—রৈবতক, তৃতীয় সর্গ

আর তাই তাঁর আশঙ্কা,—

বলবান কোন জাতি পশ্চিম হইতে
আসিলে ঝটিকা বেগে, নিবে উড়াইয়া
ভেদপূর্ণ আর্যজাতি তৃণরাশি মত,

ঐ

তাই ব্যাকুল কৃষ্ণ প্রশ্ন করেন ব্যাসদেবকে,

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যচয় করি সম্মিলিত
এই শৈল প্রাচীরের মধ্যে পুণ্য ভূমে
এক মহারাজ্য, প্রভু! হয় না স্থাপিত,—
এক ধর্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন?"

ঐ

তিনি নিষ্কাম কর্মযোগে অর্জুনকে দীক্ষা দিয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে আপন ব্রত উদ্‌যাপন করবেন।—কর্ম ও নৈষ্কর্ম্য একই সঙ্গে সাধিত হবে।

শিখাব—একত্ব মর্ম,—
এক জাতি, এক ধর্ম ;
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,—
সমগ্র মানব প্রজা, রাজা নারায়ণ!

—রৈবতক, সপ্তদশ সর্গ

কৃষ্ণ মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করলেন সেই নিষ্কাম ব্রত উদ্‌যাপনের পর 'রাজ রাজ্যেশ্বরী মাতা, সম্রাজ্ঞীরূপিণী জননী, ভারতবর্ষকে।

কুরুক্ষেত্রে এই সাম্রাজ্য স্থাপনের, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিবৃত্ত বিধৃত। যখন 'ছাইল সমরক্ষেত্র প্রজ্বলিত চিতানল' তখন কৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করলেন—

উঠিল সে অগ্নি হ'তে ত্রিভুবন আলো করি
মহাভারতের মূর্তি,—মাতা রাজরাজেশ্বরী।

প্রভাসে কৃষ্ণ ঘোষণা করলেন লীলা শেষ। মহাভারত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অন্তে তাঁর লীলা সংবরণের প্রয়োজন হল। এবার ভারতবর্ষকে অতিক্রম করে কবি বিশ্বের মধ্যে আপনাকে ব্যাপ্ত করে দিলেন। স্বাদেশিকতা বিশ্বানুভূতির, বিশ্ব-মৈত্রীর মধ্যে আত্মনিমজ্জন করল। কবি অনুভব করলেন,—

তাঁর রাজ্য, লীলা স্থল, মানব-হৃদয়।
তাঁর রাজ্য, বিশ্ব রাজ্য, তিনি নারায়ণ।

—প্রভাস, দ্বাদশ সর্গ

প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে বৃহত্তর ভারতে প্রেরণ করলেন। উদ্দেশ্য,—

যেই শক্তি এ হৃদয়ে, যেই ধর্ম শিরে,
হইল স্থাপিত, সুখে করিয়া গ্রহণ
সেই শক্তি বৈজয়ন্তী, সেই পুণ্য ধর্মালোক
যাও দেশ দেশান্তরে, পতিত পাবন।

—প্রভাস, অষ্টম সর্গ

প্রভাস রচনার সময় নবীন কবি সর্ব্ব হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন—

ভারত জগৎ নহে। নহে এই পারাবার
এই জগতের সীমা। অন্য পারে তার
আছে মহারাজ্য চয় অনন্ত বিস্তার।

ঐ

নবীনচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেমের ধারা বিশ্ববোধের মহাসমুদ্রে মিলিত হল এই কাব্যে। এখানেই তার স্বদেশ-চেতনার পূর্ণ বিকাশ। কবির স্বদেশ-চিন্তা চট্টগ্রাম থেকে বাঙলাদেশ, বাঙলা থেকে ভারতবর্ষ, ভারত থেকে বিশ্বকে আশ্রয় করে ব্যাপক, পূর্ণ পরিণত রূপ লাভ করেছে। এখন, 'বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর?'

নবীনচন্দ্রের ধর্ম

"মনুষ্যত্বের বিরাট মহিমার জয়গান করিতেই নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব। ... ঊনবিংশ শতব্দীর সাহিত্য মানুষের সাহিত্য,—নবীন সেন মানুষের কবি।'

—বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃ. ২১৩

নবীনচন্দ্র নিজেই 'অমিতাভের' ভূমিকায় এ জাতীয় মত প্রকাশ করেছেন। 'সম্ভবামি যুগে যুগে' এই ঐশ্বরিক শপথে বিশ্বাসী নবীনচন্দ্রের স্বীকারোক্তি—

'অবতারদিগকে মানুষিক ভাবে দেখিলে যেন আমার হৃদয় অধিক প্রীতি লাভ করে, তাঁহাদিগকে অধিক আপনার বলিয়া বোধ হয়।' নবীনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধের জীবনী কাব্য রচনায় অতিলৌকিক কাহিনী ও গুণাবলী যথাসম্ভব পরিহার করতে সচেষ্ট ছিলেন। শুধু তাই নয়, কবির মর্ত্য-প্রীতি ও মানবিকতায় সর্বত্র দেবকল্প চরিত্রগুলি মানবিক স্নেহ-ভালবাসার স্পর্শে অপূর্ব জীবনরসে অভিসিঞ্চিত। মহাভারতের কৃষ্ণ ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প বিস্মৃত হয়ে কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে ও অভিমন্যু-উত্তরার বাল্যলীলায় মাধুর্যে সুলোচনার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অম্লরসে, সত্যভামার প্রণয়রসে আবিষ্ট চিত্ত।

জীবনের আদ্যন্ত কালে নবীন সেন মানবভক্ত কবি – এ সত্য স্বীকার করেও দেখি, কবি জীবনের দ্বিতীয় পর্বে পরিণত জীবনে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর ঐশিক শপথ ও শক্তিকে মেনে 'স্বয়ং ভগবান' রূপে গ্রহণ করেছিলেন। 'রৈবতকে'র ভূমিকায় কবির নির্দেশনা—'দেখিলাম ··· ভগবান বাসুদেব ঐশিক প্রতিভায় গগন পরিব্যাপ্ত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এবং অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পতিত ভারতবাসীর, পতিত মানবজাতির উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন।'

নবীনচন্দ্র তাঁর কাব্যত্রয়ীতে শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের অলৌকিক লীলা বর্ণনা করেন নি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছেন নিঃসংশয়ে। ত্রয়ীর

শেষপর্বে 'প্রভাসে' শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বের নয়, পরম পুরুষত্বের বিশ্বাস ও ঘোষণা দ্বিধাহীন ও অকুণ্ঠ।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৩।২৮

'প্রভাসে' কবি এই তত্ত্ব প্রচার করেছেন শেষ পর্যন্ত।

শ্রীকৃষ্ণ মহামানব নন, স্বয়ং ঈশ্বর, পরমপুরুষ কবির এই বিশ্বাস 'ত্রয়ী'র তিনটি গ্রন্থেই অল্পবিস্তর অনুস্যূত। 'রৈবতক' দ্বাদশ সর্গে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে সোঽহং তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছেন। -

আমি কে মহর্ষি? আমি আমরা সকল,—
জগৎ তাঁহার অংশ। তাঁর অবতার।
সোঽহং আমি নারায়ণ।...
বিশ্বের জীবন আমি আমাতে জীবিত
চরাচর, জন্ম, মৃত্যু, স্থিতি রূপান্তর।
নহি ব্রহ্মা, নহি রুদ্র, আমি ক্রীড়াবান।
একমেবাদ্বিতীয়ং আমি ভগবান।

এখানে শ্রীকৃষ্ণের সোঽহং তত্ত্ব শঙ্করাচার্যের দার্শনিক অদ্বৈত তত্ত্ব নয়। কবি এখানে দ্বৈতবাদী। জীব ও জগৎ ঈশ্বরের প্রকাশ। জগৎপ্রপঞ্চ মায়া-মরীচিকা নয়। ঈশ্বরের বিরাট শরীরের অংশ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পুরুষোত্তম, নারায়ণ 'নিরঞ্জন—নররূপধর'। মানবদেহ ধারণ করেও স্বরূপ বিস্মৃত হন নি।

নবীনচন্দ্রের পূর্বোদ্ধৃত অংশটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র।

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১১।৮

সোঽহং তত্ত্ব প্রচারের অব্যবহিত পরেই শ্রীকৃষ্ণ 'ত্যজি সর্বধর্ম, লও আমার শরণ' —'আমি বিশ্বরূপ' বলে ব্যাস ও অর্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করালেন।

দেখিলেন ব্যাসার্জুন, গোধূলি তিমিরে...?
নাহি বাসুদেব আর; দেখিতে দেখিতে

দীপ্তিমান বপু যেন হইয়া বর্ধিত
ছাইল এ চরাচর। সবিতৃমণ্ডল
শোভিতেছে পদতলে, শতদল মত,…?
কিবা শোভা সে বদনে! কি জ্যোতি নয়নে!
শোভে করে কিবা শঙ্খ, চক্র সুদর্শন!
অপার্থিব কি আলোক, সঙ্গীত-সৌরভ,
ভাসিছে অনন্তব্যাপী! কিবা অধিষ্ঠান
প্রকৃতিতে পুরুষের—মিলন মহান।

এখানে পরমপুরুষ রূপে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু তারই সঙ্গে মানব-মহত্ত্ব স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত কাব্যত্রয়ীতেই। প্রথম পর্বে—

মানব! উৎকৃষ্ট সৃষ্ট। যে অনন্ত জ্ঞানে
সৃষ্ট ও চলিত এই বিশ্বচরাচর,
পড়েছে সে জ্ঞান-ছায়া হৃদয়ে যাহার
ছাড়ি সে অনন্ত জ্ঞান অনন্ত শকতি,
সে কেন পূজিবে অন্ধ জড় প্রভাকর!

—রৈবতক, প্রথম সর্গ

নবীন চিত্তকে সরস করে, নবীনকাব্যকে ভুক্তি মুক্তির আকর করে দুই প্রেমের স্রোতস্বিনী বয়ে গিয়েছে এই কাব্যে। একটি ধারার গতি ভগবদ্‌-ভক্তির মহাসাগর-সঙ্গমের দিকে অপরটি মানবপ্রেমের সরস, শস্যশ্যামল সমতলভূমি অভিমুখীন।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে নবীনকাব্যে কোঁৎ মিল, বেন্থামের প্রভাব যথেষ্ট আছে। রৈবতকেও পাশ্চাত্য মানবতাবাদ, হিতবাদের প্রেরণা দেখি। কোন কোন সমালোচকের মতে পাশ্চাত্য Humanitarianism-কে মহাভারতের গল্পের ছাঁচে ফেলে নূতন Nationalism-এর প্রতিষ্ঠার জন্যেই এই কাব্যত্রয়ী রচনা। উপরোক্ত মতবাদের সত্যতা বিচারের অবকাশ আছে। যুগপ্রভাবে পাশ্চাত্য Humanitarianism-এর প্রতিফলন সে যুগের সব সাহিত্যেই এবং নবীনকাব্যেও অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী ছিল। নবীনচন্দ্রের সর্বধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শ-সন্ধানে, শ্রীকৃষ্ণের মহাভারত প্রতি ষ্ঠার আয়োজনে এই মানবতাবোধ অন্যতম প্রেরণা ছিল—সন্দেহ নেই। তবু

রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসে কবি যে মানব-মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছেন পাশ্চাত্য-মতের সঙ্গে যোগ রেখেও সেই 'মানবতা' প্রাচ্য তথা ভারতীয় দর্শন এবং শাস্ত্রানুগ। গীতায় যে আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তথা জীবের ব্রহ্মত্বকে শ্রীভগবান ব্যাখ্যা করেছেন, নবীনচন্দ্রের মানবতাবাদ তারই অনুসরণ ও অনুবাদ। যে 'কর্মযোগ' নবীনচন্দ্র শিক্ষা দিয়েছেন তা ৺গীতারই শিক্ষা। এর লক্ষ্য বা গন্তব্য মোক্ষসুখ। পাশ্চাত্য **Humanitarianism**-এর প্রতিষ্ঠা ঐহিকতার ভিত্তিভূমির উপর। স্বর্গ নয়, নির্বাণ নয়, ধূলিমাটির পৃথিবীতেই মানুষের সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয়। স্বর্গের অকল্পিত সুখ লব্ধ হবে আদর্শের অনুসরণে, এখানে সমষ্টি-কল্যাণের আদর্শ গৃহীত হলেও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে সম্মান দেওয়া হয়েছে। মানুষ তার সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, দোষগুণ, দুর্বলতা-দৈন্য নিয়েই মহান। মনুষ্যত্বের সবকিছুকে অঙ্গীকার করেই পাশ্চাত্য মানবিকতাবোধের প্রতিষ্ঠা। নবীনচন্দ্রের মানবিকতা মানুষের অন্তরতম শক্তির, 'আত্মা'র আবিষ্কারে চরিতার্থ। ব্যক্তিগতভাবে নবীনচন্দ্র সন্ন্যাস-বৈরাগ্যকে প্রাধান্য না দিলেও তাঁর কাব্যত্রয়ী অনাসক্তভাবে কর্মানুষ্ঠান ও লোককল্যাণ-আদর্শের মধ্য দিয়ে 'কর্মসন্ন্যাস'-এর আদর্শই প্রচার করেছে।

এই লোককল্যাণ আদর্শ সর্বত্রই পাশ্চাত্য দর্শন প্রভাবিত এ মত যুক্তিযুক্ত নয়। 'লোকস্থিতি'র লক্ষ্য ভারতবর্ষে বহু পুরাতন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ প্রচার করেছেন লোকসংগ্রহের আদর্শ। নবীনচন্দ্রের মানবতার আদর্শ ৺গীতার অনুসারী। কুরুক্ষেত্রের একস্থানে কৃষ্ণের উক্তি,—

পিতা, মাতা, পত্নী পুত্র একটি মানব, হায়!
যদি নাহি ভালবাসিলাম
অনন্ত মানবজাতি কেমনে বাসিব ভাল,
অনন্ত অচিন্ত্য ভগবান্?

ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শ নব্যযুগের দর্শনের আলোয় প্রতিভাসিত হল নবীনকাব্যে—কাব্যত্রয়ীতে।

শরীর, ইন্দ্রিয়চয়, মানবের অদ্বিতীয়
সুখের ও শিক্ষার সোপান।
কামনা ইন্দ্রিয়-জাত মানবের সুখ পথে
অদ্বিতীয় কর্মের নিদান।

কিন্তু এই কামনার স্বরূপ হল -

কামনা জগৎ-হিত, সাধনা জগৎ-হিত
বুঝিলাম প্রকৃত সন্ন্যাস।

গীতার কর্মসন্ন্যাসের আদর্শই এক্ষেত্রে প্রচারিত—

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩।৪

প্রভাসে নবীনচন্দ্রের মানব-চরিত্রের আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবান,—

যেজন যে ভাবে চায়, সে ভাবে আমাকে পায়,
স্বভাবে মানব করে মম অনুসার!

শ্রীকৃষ্ণের এই ঘোষণায় তাঁর ঈশ্বরত্বে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি 'প্রভাসে'র নবম সর্গ থেকে গৃহীত। ঐ সর্গেই শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের প্রতিষ্ঠা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আয়োজন, তার সব পরিণামকে, সমস্ত কর্ম, দ্বন্দ্ব, অশান্তিকে তাঁর লীলা বলে উল্লেখ করেছেন।—'এই ঘাত প্রতিঘাত আমার শক্তির ক্রীড়া'—বলেই ঘোষণা করলেন,—

আমি এই মহাবিশ্ব, এই বিশ্ব মমরূপ
শক্তির নীতির মম মহাআবর্তন।
এই আবর্তন—সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশন।

যে শ্রীকৃষ্ণ 'রৈবতকে', প্রথম সর্গে ও তৃতীয় সর্গে 'মানব চেতনাযুক্ত, বিবেকী, স্বাধীন উপলব্ধি করেছেন, খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ভারতের দুর্দশায় যিনি ব্যাকুলচিত্ত তিনিই এখানে বিশ্বরূপ দেখিয়ে বললেন,—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

যে নবীনচন্দ্র মানবরূপে অবতারদের দেখতে ইচ্ছুক, যিনি মানবতার জয়গান করতে আবির্ভূত 'প্রভাসে' তিনি কৃষ্ণভক্তিবিহ্বল সাধক। তাঁর ভক্তিবিহ্বলতা মন্দাকিনীর প্রমত্ত স্রোতধারার মত এখানে মানবতাবাদের ঐরাবতকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

নব্যযুগের মহাভারত রচনার পেছনে নবীনচন্দ্রের অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল হিন্দুধর্মের সংস্কার-সাধন এবং শাস্ত্রপ্রণয়ন। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস

রচনার পূর্বে নবীনচন্দ্র যখন শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা ও মহাভারত পাঠ করে হিন্দুধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তখন তিনি হিন্দুধর্মের একটি দার্শনিক ইতিহাস (Philosophical History) রচনার জন্যে বঙ্কিমকে অনুরোধ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সে বৃদ্ধবয়সে এজাতীয় গুরুদায়িত্ব পালনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলে, নবীনচন্দ্র নিজেই সে কর্মে ব্রতী হন। তারই ফল হল এই কাব্যত্রয়ী। গিরিশচন্দ্র একটি পত্রে নবীনচন্দ্রকে লিখেছিলেন,—

'মহাভারতের যে রূপ প্রকৃতব্যাখ্যা তোমার কুরুক্ষেত্রে হয়েছে তা যদি সাধারণে বুঝতে পারে তাহলে প্রকৃত নীতিশিক্ষা ও কর্তব্য অনুষ্ঠান সুরু হতো। বুঝতো ধর্মপ্রাণ হিন্দুর ধর্ম ব্যতীত উপায় নাই।' (গিরিশচন্দ্রের পত্র থেকে উদ্ধৃত।)

- 'গিরিশচন্দ্র', অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৬৩৩

নব্যসংস্কৃত হিন্দুধর্মের শাস্ত্র-প্রণয়ন জন্য এই যে গ্রন্থ, তাতে প্রধান 'সাধন' নির্দেশিত হল কর্মযোগ। গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের এক নব যুগোপযোগী ভাষ্য রচিত হল। বিভিন্ন অবতারের জীবনী রচনার মধ্যে নবযুগের ধর্ম-সমন্বয়ের যে আদর্শের প্রচাব, 'ত্রয়ী'তে তারই পূর্ণবিকশিত রূপ দেখি। 'রৈবতকে' যার সূত্রপাত হয়েছিল, 'প্রভাস' ত্রয়োদশ সর্গে তারই উপসংহার। — খ্রীষ্ট ও মহম্মদ কৃষ্ণের অবতার ও শ্রদ্ধার্হ রূপে কথিত এবং পূজিত হলেন।

নবীনচন্দ্রের এবং নবযুগের উপাস্য বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। নবীনচন্দ্র ধর্মের ইতিহাস প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণলীলা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে চাইলেন। অবশেষে কবিব অন্য সমস্ত উদ্দেশ্য গৌণ হয়ে কৃষ্ণলীলার অনুধ্যান ও শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্য ব্যাখ্যানই প্রধান হয়ে উঠল। মহাভারত প্রতিষ্ঠার উদ্যম, আদর্শ মানবচরিত্র অঙ্কনের ইচ্ছা, নব্যসংস্কৃত ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রণয়ন, এজাতীয় সব প্রয়োজন-বিস্মৃত কবি কৃষ্ণধ্যানে আবিষ্টচিত্ত হয়ে পড়েছেন। অবশেষে কৃষ্ণপ্রাপ্তির আনন্দে বিহ্বল হয়ে, দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা, চৌদ্দবছরের প্রযত্ন-প্রচেষ্টার অবসান ঘটিয়ে কাব্যরচনা সমাপ্ত হল। কবির দৃষ্টি এখন পৃথিবীর দিকে নিবদ্ধ নেই। শুধু অনুভব—

গীত শেষ অপরাহ্নে, সন্ধ্যা আসিতেছে ধীরে !
বসি ধ্যানমগ্ন এই জীবন-প্রভাস-তীরে।"

সম্মুখে অজ্ঞাত সিন্ধু, ভাসে কৃষ্ণ-পদতরী !
এই তীরে সন্ধ্যা ; ঊষা অন্য তীরে মুক্তকরী !

কাব্যশেষে কবির অন্য কোন অভিপ্রায় ছিল না। 'সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্' কাব্যত্রয়ী রচনা সমাপ্ত হল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি অনুসারে এই সত্য—

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে।
কাম ছাড়ি দাস হইতে হয় অভিলাষে॥

নবীনচন্দ্রের পক্ষে এক্ষেত্রে সর্বাংশে প্রযোজ্য। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে স্বচরণামৃত দিয়ে আকৃষ্ট করেছেন। কবির কাছে তখন একমাত্র উপলব্ধ সত্য ও প্রাপ্তি বাসুদেব।

বাসুদেব পরংজ্ঞানং বাসুদেব পরন্তপঃ।
বাসুদেব পরোধর্মো বাসুদেব পরাগতিঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১।২।২৯

গিরিশচন্দ্র একটি পত্রে নবীনচন্দ্রকে লিখেছিলেন, 'তুমি একজন প্রকৃত বৈষ্ণব।' (গিরিশচন্দ্র—অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়।) বহু সমালোচকই এ জাতীয় মন্তব্য করেছিলেন। দীর্ঘকাল পরে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীনচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত সভায় শ্রীকালিদাস রায়ও একই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন,—

'ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবীনচন্দ্রই আসল বৈষ্ণব কবি। কবি দীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণের ভাবে আবিষ্ট ছিলেন বলিয়া এত দীর্ঘ বৈষ্ণবকাব্য রচনা করিতে পারিয়াছিলেন।' —আনন্দবাজার পত্রিকা ১৮৮২, ১১ই ফেব্রুয়ারী

নবীনচন্দ্রের আত্মজীবনী গ্রন্থে দেখি, কবি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৬ পর্যন্ত 'দীর্ঘ চতুর্দশ' বৎসর শ্রীভগবানের মহাভারতীয় লীলা ধ্যান করেছিলেন। একদিকে শ্রীকৃষ্ণের মহাভারতীয় লীলা, অন্যদিকে শ্রীচৈতন্যের লীলাকাব্যসমূহ পাঠ করে একটি বিশেষ ভক্তি-আবেশে নিমগ্ন থেকে কাব্যত্রয়ী রচনা করেছিলেন।

এই ঘটনার পূর্বেও ইতিহাস আছে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি কর্মোপলক্ষে পুরীতে ছিলেন তখনই শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে তাঁর হৃদয়ে প্রথম কৃষ্ণভক্তির উন্মেষ হয়েছিল,—একথা অধ্যায়ান্তরে উল্লেখিত। বিস্তারে

অবস্থানকালে তিনি মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেছেন। উপলব্ধি হল—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। অবশেষে কাব্যত্রয়ীর পরিকল্পনা ও রচনা। উদ্দেশ্য—শ্রীকৃষ্ণ-স্থাপিত ধর্মরাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। প্রধানতঃ কবি অবলম্বন করলেন মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে, যদিও প্রেরণা এসেছিল ভাগবত থেকেও। যশোহরে যখন ছিলেন তখন থেকেই শিশিরকুমার ঘোষের সঙ্গে সৌহার্দ্য, সৌভ্রাত্র্য গড়ে উঠেছিল। শিশিরকুমারের রচিত 'অমিয় নিমাইচরিত' পাঠে নবীনচন্দ্র মুগ্ধ বিহ্বল হয়েছিলেন। 'অমিতাভে'র ভূমিকায় কবি অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। নবীনচন্দ্র শুধু শ্রীকৃষ্ণ নয়, শ্রীগৌরাঙ্গেও সমর্পিতপ্রাণ। শ্রীচৈতন্যের আনীত উচ্ছ্বসিত কৃষ্ণপ্রেমধারা 'প্রভাস' কাব্যের ছত্রে ছত্রে প্রবাহিত। এই ভক্তিরস-বন্যায় নবীনচন্দ্রের কাব্যের মহাকাব্যিক উদ্দেশ্য ভেসে গিয়েছে।

শ্রীসুকুমার সেন নবীনকাব্যের এই ভক্তি-উচ্ছ্বাস গিরিশচন্দ্রের প্রভাবজাত বলে মনে করেন।[১] গিরিশচন্দ্রের সঙ্গেও নবীনচন্দ্রের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বের। গিরিশচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের অভিনবত্বের জন্যে, কাব্যোৎকর্ষের জন্যে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু নবীনচন্দ্রের সুবৃহৎ আত্মজীবনীগ্রন্থে এমন একটি অংশ পাই না যা থেকে মনে করা যায়, নবীনকাব্যের এই ভক্তি-উচ্ছ্বাস গিরিশসাহিত্যের প্রভাবপুষ্ট। গিরিশচন্দ্রের কাব্যে ও নাটকে নায়ক-নায়িকার ও অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের ভক্তি-বিহ্বলতার সঙ্গে নবীনচন্দ্রের কাব্যের পাত্রপাত্রীদের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এই সাদৃশ্য কৃত্রিম অনুসরণ বা পরোক্ষভাবে আগন্তুক সাদৃশ্য নয়। নবীনচন্দ্রের কাব্যে সৃষ্ট পাত্রপাত্রীদের মধ্যে যে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ তাতে নবীনহৃদয়েরই প্ররোচন ছিল। আর, নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণভক্তি একান্তভাবে ব্যক্তিহৃদয়ের গভীর উপলব্ধিসঞ্জাত, সহজাত। 'আমার জীবনে' কবি জানিয়েছেন,—

"কি 'যাত্রা'য়, কি 'থিয়েটারে' কৃষ্ণ সাজিয়াছে দেখিলে আমার অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া যাইত।" —আমার জীবন, ৫ম খণ্ড, নবীনচন্দ্র রচনাবলী ৩।৩১১

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের যখন রাণাঘাটে সাক্ষাৎ হয়েছিল 'ভাগবত'

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, পৃ. ৩০২

আলোচনা প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র বলেছিলেন,—'উহা রূপক মনে করিয়া যদি আপনার তৃপ্তি হয়, ক্ষতি নাই। আপনি সেই ভাবে দেখুন। কিন্তু আমি যে যাত্রার গানে কৃষ্ণ সাজিয়া আসিলে দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না, আমার সেই কালো পুতুলটি ভাঙ্গিবেন না। আমার জন্য উহা রাখিয়া দিউন।' — আমার জীবন, ৫ম খণ্ড, নবীনচন্দ্র রচনাবলী ৩।৬৪

নবীনচন্দ্রের দীর্ঘকালের কৃষ্ণলীলা অনুধ্যানই তাঁকে শিশিরকুমার ও গিরিশচন্দ্রের মানস ও কায়িক সান্নিধ্যে এনেছিল—এ মন্তব্য না করেও বলা যায়, রুচির সাজাত্য তাঁদের ছিল। এ কারণেই পরস্পরের প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিলেন। শিশিরকুমারের 'অমিয় নিমাইচরিত' যে তাঁকে মুগ্ধ করেছিল নবীনচন্দ্রের আত্মজীবনীতে তার উল্লেখ আছে। তবে গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে সমালোচকের অনুমানই একমাত্র নির্ভর। বলা চলে, 'কৃষ্ণভক্তি' ছিল এই যুগেরই বৈশিষ্ট্য। হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের কালে যে দেবতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে লক্ষ্যে পৌছানোর চেষ্টা চলেছিল—তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণ। মননশীল, যুক্তিপন্থী, অপৌত্তলিক, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসকরা একে একে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের ভক্তরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচণ্ড ও অনিবার্য আকর্ষণ, তাঁর লোকোত্তর চরিত্রের প্রভাব ও প্রেরণা বহু ব্রাহ্মভক্তকে হিন্দুধর্মের কেন্দ্রস্থলে ফিরিয়ে এনেছে। এই কেন্দ্রবিন্দুর অধিষ্ঠাতা হলেন 'কৃষ্ণ'। কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিশিরকুমার ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এঁরা প্রায় সর্বত্যাগী বৈষ্ণবভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। অনিবার্য যুগপ্রভাবে কবি নবীনচন্দ্রও রূপান্তরিত হলেন ভক্ত নবীনচন্দ্রে।

নবীনচন্দ্র বৈষ্ণব কবি। তাঁর ধর্ম—বৈষ্ণব ধর্ম। 'কৃষ্ণ'ই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে 'ভগবান স্বয়ং' রূপে উপাস্য। উপরোক্ত আলোচনায় নবীনচন্দ্রের এই প্রকার বৈষ্ণবত্ব স্থিরীকৃত হয়েছে। অমিল হল এই যে, প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মের রাধাতত্ত্বকে কবি একেবারেই কাব্যে স্থান দেন নি। শক্তিতত্ত্ব বা রাধাতত্ত্বকে স্বীকার না করায় নবীনচন্দ্রকে যথার্থতঃ সাম্প্রদায়িক প্রকৃত বৈষ্ণব বলা যায় কি? কাব্যত্রয়ীতে এবং অন্যত্রও গোপীপ্রেম, রাসলীলা, ব্রজলীলার উল্লেখ দেখা গেলেও নবীনচন্দ্র শ্রীমতী রাধা সম্পর্কে একান্তভাবেই নীরব থেকেছেন। প্রকৃত বৈষ্ণবের কাছে কান্তাশক্তি, অখণ্ড রসবল্লভা রাধা হলেন—

জগৎমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ৪।৮২

রাধাতত্বকে স্বীকার না করায় নবীনচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক ভাবে বৈষ্ণব বলা চলে না। এবং নবীনের এ জাতীয় আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি বিধিবদ্ধ অনুশাসন একান্ত করে মান্য করার পক্ষপাতী ছিলেন না।

নবীন-কাব্যে শ্রীরাধার প্রাধান্য না থাকলেও রাধার প্রেমব্যাকুলতা সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষীভূত। কাব্যত্রয়ীতে জরৎকারুর প্রেম আধুনিক জীবনের জটিলতা ও যন্ত্রণায় বিশিষ্ট। তার রূপবিহ্বল, ইন্দ্রিয়সর্বস্ব প্রেমের সর্বধ্বংসী তৃষ্ণার সঙ্গে ব্রজগোপীর 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' স্বরূপ প্রেমের পার্থক্য অনেক। তবুও তার আত্মবিস্মৃত কৃষ্ণপ্রেম ব্রজরমণীর আর্তিকেই মনে পড়িয়ে দেয় অনেক সময়। ব্রজাঙ্গনার মতই সে বলেছে,—

না জানি কি নারায়ণ, পতিতপাবন কিবা,
এই জানি—তুমি মম জীবন-মরণ!
তুমি নয়নের আভা,—তুমি রসনার সুধা,
তুমি মম শ্রবণের সঙ্গীত কেবল!
তুমি মম চির সুখ, তুমি মম চির দুঃখ,
সুখ দুঃখ মন্থনের অমৃত শীতল!

'প্রভাস' কাব্যের শেষের দিকে 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেমের প্রতিফলন হয়েছে বাসুকির চরিত্রে। মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমব্যাকুলতা স্মরণেই বৈষ্ণব কবি শ্রীরাধার আর্তিকে রূপায়িত করলেন বাসুকির জীবনে। দেখি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ—

পুলকিত, রোমাঞ্চিত, হইতেছে কলেবর,
হইতেছে স্বেদোদ্গম, দু' নয়নে দরদর
বহিতেছে প্রেমধারা কি যেন আনন্দনীরে
হইতেছে সিক্ত অঙ্গ, প্রাণ পরিপূর্ণ ধীরে।

—প্রভাস, একাদশ সর্গ

বৈষ্ণব সাধক ও কবি অভিন্ন। কবির সাধনা তাঁর কাব্য-সৃষ্টি।

এক্ষেত্রেও নবীনচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের সাদৃশ্য আছে। নবীন কলা-কৈবল্যবাদী হলেন না। কৃষ্ণলীলা কাব্য রচনা করেছেন, নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে মগ্ন থেকেছেন দীর্ঘকাল।

চতুর্দশ বর্ষ বসি একধ্যানে
দেখিয়াছি সেই লীলা চিন্তাতীত ;
পাইয়াছি শান্তি মরুদগ্ধ প্রাণে,
হয় নাই তবু তৃষ্ণা নির্বাপিত।
উদ্ধব! আমারে লও বৃন্দাবনে!
সেই ব্রজলীলা দেখিয়া মধুর
জুড়াইব প্রাণ, - মরুদগ্ধ প্রাণ
বড়ই কাতর, বড় তৃষ্ণাতুর।

—প্রভাস, পঞ্চম সর্গ

এই আকুলতা কবি-সাধক নবীনচন্দ্র সেনেরই।

বৈষ্ণবধর্ম তার আবির্ভাব কাল থেকেই 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ঋগ্বেদে বিষ্ণুসূক্তে পাই প্রার্থনা—'হে স্তোতৃবৃন্দের কামনাপূরক বিষ্ণু, আমাকে সেই সুমতি প্রদান কর যা দিয়ে আমি সকলজনের হিত করতে সমর্থ হই। হে বিষ্ণু, বহুজনের প্রীতিপ্রদ প্রভূত অশ্বাদিযুক্ত এমন ধনসম্পদ যেন আমার হয়, যা দিয়ে আমি বহুজনের সেবা করতে সমর্থ হই।' পরকে সুখী করার জন্যে ত্যাগস্বীকার বৈষ্ণবধর্মের সাধনার অঙ্গ। 'পরদুঃখ গ্রহণেচ্ছা, এবং নিজে সকল দুঃখ বহনেচ্ছা, ইহাই হইল প্রকৃত বৈষ্ণবতা।' —বাঙলার বৈষ্ণব ধর্ম, পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ভূমিকা পৃ ।৴

বৈষ্ণবধর্মের এই বিশেষত্বই নবীনচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল। নবীনচন্দ্র এই ধর্মকেই ভারতবর্ষের জাতীয় ধর্মের মর্যাদা দিলেন। নবযুগের দার্শনিক মত—**Positivism** বা **Utilitarianism**-এর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে—সমষ্টি কল্যাণাদর্শের ক্ষেত্রে। এ কারণেই নবীনকাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব অন্বেষণের ব্যাপারে এই যুক্তি দেখা যায়। বস্তুতঃ—এ বৈশিষ্ট্য পাশ্চাত্য বিশেষণীয় নয়—একান্তভাবেই ভারতীয়। নবীনচন্দ্রের সমন্বয়-সন্ধানী দৃষ্টি বৈষ্ণবধর্মের মানব-কল্যাণের আদর্শের সঙ্গে খুঁজে পেয়েছিল পাশ্চাত্য মানবহিতবাদের কিছু মিল। ক্রমশ পাশ্চাত্য সংযোগকে ত্যাগ করে তিনি ভারতীয় দর্শন ও

ধর্মশাস্ত্র অবলম্বন করলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতই বর্ণাশ্রমধর্ম তথা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর ছিল না। 'ত্রয়ী'তে ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্রেই ভারতের দুর্দশা, তা নিবারণের জন্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ।

আরও একটি কারণে নবীনচন্দ্র বৈষ্ণবধর্মকে যুগধর্ম, জাতীয় ধর্ম রূপে গ্রহণ করেছিলেন। বৈষ্ণব সাধকেরা 'আনন্দরূপমমৃতম্' ঈশ্বরের উপাসক। বেদান্তের 'নেতি নেতি' মতবাদের মধ্যে কোন চরিতার্থতা তাঁরা খুঁজে পান নি। তাঁদের উপাস্য সেই ব্রহ্ম, যিনি সর্বব্যাপী ভগবান বাসুদেব, নির্গুণ হয়েও, প্রথমতঃ কার্যকারণাত্মিকা ত্রিগুণময়ী আত্মমায়া দ্বারাই এই বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি করেছেন।[১] এবং—

যথা হ্যবহিতো বহ্নির্দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্॥[২]

অর্থাৎ—'অগ্নি যেমন স্বাভিব্যঞ্জক কাষ্ঠাদিতে অবস্থিত হয়েও তাদের ভেদবশত নানারূপে পরিদৃষ্ট হন, সেরকম একমাত্র বিশ্বাত্মা পরমপুরুষ (পরমেশ্বর) প্রাণিগণের অন্তরস্থ হয়েও আধারের নানাত্ব প্রযুক্ত নানারূপে প্রকাশ পেয়ে থাকেন।' নবীনচন্দ্রও এই লীলাময় বাসুদেব কৃষ্ণের ভক্ত—সমর্পিতপ্রাণ। এখানেই নবীনচন্দ্রের সঙ্গে বৈষ্ণব সাধকদের সাদৃশ্য। বৈষ্ণব সাধকের মত তাঁরও আরাধনা রসস্বরূপ ঈশ্বরের। বিশ্বমুখীনতা এখানে এঁদের সকলেরই বৈশিষ্ট্য। বিশ্বাভিসারী এই মতবাদ ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু চিন্তাশীল, বিদগ্ধ ব্যক্তির কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। যুগের বৈশিষ্ট্য—যুগপ্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয় সন্ধান করেছিল।

নবীনচন্দ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতই চতুর্বর্গের উপর পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমকে স্থান দিয়েছিলেন। কখনও এ প্রেম প্রাকৃত প্রেম; এবং প্রায়শই কৃষ্ণপ্রেম। বাসুকি, জরৎকারু, শৈলজা, অর্জুন সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল। কৃষ্ণের প্রতি সর্বগ্রাসী ভালবাসা ছাড়া তাঁদের কাম্য ছিল না কিছুই।

নবীনচন্দ্র কৃষ্ণকে স্বয়ং ঈশ্বর এবং অন্যান্য সমস্ত আবির্ভাবকে তাঁর অবতার ও অংশ রূপে মত প্রকাশ করেছেন 'আমার জীবনে'।

১. শ্রীমদ্ভাগবতম্, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপালভক্তেন সম্পাদিতম্ ১।২।৩০
২. ঐ ১।২।৩২

"এই জন্যই ভারতীয় শাস্ত্রে অন্য সকলে অবতার, আর 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'।" অন্য সকলে অবতার,—কারণ, তাঁহারা এক এক সংস্কারকার্য সাধন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সর্বপ্রকার সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন, পৃথিবীর কোনও অবতার বা ধর্মপ্রচারক তাহা করেন নাই। তাই তিনি পূর্ণ ভগবান্।

কাব্যত্রয়ীত—'প্রভাস', দশম সর্গে সুভদ্রার কণ্ঠে কবির গভীর বিশ্বাসের ঘোষণা।

…যিনি মঙ্গল-নিদান
জগতের, যিনি সর্বমঙ্গলমঙ্গল,
সম্ভবে কি অমঙ্গল তাঁহার কখন ?
মঙ্গল ও অমঙ্গল সুখ দুঃখ আর,
জন্ম মৃত্যু, শোক শান্তি, লীলামাত্র তাঁর,—
অনন্ত মঙ্গলপূর্ণ নিয়তি তাঁহার।

বৈষ্ণব সাধকের বিশ্বাস—তাঁর উপাস্য 'পরব্যোম নারায়ণ', এবং—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্বকারণঃ কারণম্ ॥

—ব্রহ্মসংহিতা, ৫।১

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন,—অন্যান্য অবতারগণ এবং কৃষ্ণ হলেন—

দীপ হইতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করয়ে গণন ॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ২।৭৫, ৭৬

নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণপ্রত্যয়ে এঁদের সঙ্গে কোনও বৈসাদৃশ্য ছিল না।

নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণভক্তি-বিহ্বলতা 'রৈবতকে' অন্য দুটি কাব্য থেকে তুলনা-মূলকভাবে অনেক কম। 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যে এই ভাবোচ্ছ্বাসের সূত্রপাত, 'প্রভাসে' প্রবল বন্যা। 'প্রভাসে' নামাশ্রয়ী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণ দেখানো হয়েছে—

যুগধর্ম প্রবর্তাইমু নাম সংকীর্তন।
চারিভাবে ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১।৩।১৭

প্রভাসে দেখি,—

গায় বৃদ্ধ কৃষ্ণনাম, গায় যুবা কৃষ্ণনাম,
কৃষ্ণনাম যুবতীর মুখে,
গায় কৃষ্ণনাম শিশু, নাচিয়া মায়ের কোলে,
লুকাইয়া মুখ মা'র বুকে !

একাদশ সর্গে বাসুকির নামসংকীর্তন-বিহ্বলতা শ্রীচৈতন্যের এবং ভক্ত-সম্প্রদায়ের কথাই স্মরণ করায়। কবি স্বয়ং এই নামকীর্তনে যোগ দিয়েছেন অন্তরে অন্তরে, এই প্রেমবিহ্বলতার চিত্র অঙ্কন অপরোক্ষ অনুভূতি ব্যতীত দুর্লভ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ'—'আমি একমাত্র ভক্তি দ্বারাই প্রাপ্য'। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও সর্বসাধন গরীয়সী ভক্তিকে কর্ম, জ্ঞানের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' অথবা 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—প্রভৃতি ঘোষণায় ভক্তিপথের প্রাধান্যই সূচিত। নবযুগের আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিকে সর্বত্র-গামিনী বলে প্রাধান্য দিয়েছেন। নবীনচন্দ্র পতিত ভারতবর্ষের মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছিলেন সমষ্টিকল্যাণাদর্শে উদ্বুদ্ধ মানবহিতবাদে এবং নিষ্কাম কর্মযোগে। কিন্তু ক্রমশই কবির সর্ববিধ লৌকিক বাসনা দূরীভূত হয়েছে। 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'—তাঁকে লাভ করে সর্ব কর্ম, অভীষ্ট বিস্মৃত কবি নিজেরই অপরোক্ষ উপলব্ধিকে প্রকাশ করলেন—

বুঝিয়াছি তুমি জ্ঞানের অতীত,
ভক্তির অতীত নহ ভগবান !

কোথায় সেই ভারতবর্ষের একজাতি একপ্রাণের লক্ষ্য? কোথায় সমস্যা-জর্জরিত দেশ ও জাতির জন্য স্বদেশপ্রেমিক কবির আকুলতা? সর্ব-তৃষ্ণার অবসান, সকল দ্বন্দ্বের মীমাংসা হল 'কৃষ্ণ' প্রাপ্তিতে। 'প্রভাসে' কুরুক্ষেত্রের পাত্রপাত্রীরা সকলেই একই স্বর্গে উপনীত হলেন—হরিনাম সম্বল করে—শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়। কবিও কবিধর্ম, মানবধর্ম, হিন্দুধর্মের সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করে, প্রতিষ্ঠিত হলেন বৈষ্ণবের বৈকুণ্ঠে।

পঞ্চম অধ্যায়

নবীন-কাব্যের ছন্দ-ভাষা-অলঙ্কার

কবি-হৃদয়ের বিভিন্নমুখী ভাব ও ভাবনা নব নব ছন্দের দোলায় বহুবিচিত্র কাব্যরূপের সৃষ্টি করে। কবির ভাষায়—

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।

কবির অন্তরতম প্রকৃতি ও কাব্যের বিষয়বস্তু বাঞ্ছিত রূপের মধ্যে যথোপযোগী ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারের আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। ভাব যখন চিরায়ত সাহিত্যের উপযোগী মহান, উত্তুঙ্গ, দেশকালের মধ্যে প্রসারিত, কাব্যাঙ্গিক তখন কঠিন, ওজস্বী, সযত্ন-পরিকল্পিত হয়। আবার ভাবোদ্বেল কবির অস্ফুট গীতিউচ্ছ্বাস স্বচ্ছ সহজ ভাষা ও ছন্দে অবাধ গতিতে প্রবাহিত হতে চায়।

নবীনচন্দ্র ছিলেন স্বভাবসিদ্ধ কবিপ্রতিভার অধিকারী। একদিকে ছিল তাঁর গীতিকবিসুলভ ভাবতন্ময়তা, অন্যদিকে ছিল মহাকবি-সুলভ দেশ-কালাতীত জীবনবোধ। এই বিপরীত গুণের সমাবেশে সমকালীন কাব্যজগতে ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কবির সহজাত ছন্দনৈপুণ্যে দুই আপাত-বিরোধী গুণের মধ্যে সেতুবন্ধন কৌতূহলোদ্দীপক।

নবীনচন্দ্র আঙ্গিক-সচেতন কবি ছিলেন না। তাঁর কাব্যানুশীলনে যত্ন-আরাধিত শিল্পনৈপুণ্যের প্রয়োগ কদাচিৎ-ই দৃষ্ট হয়। কাব্যকলার অনুশীলনে আন্তরিক আগ্রহের পরিচয় কবির আত্মজীবনীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। কাব্যেও তার প্রমাণ নেই। মধুসূদনের মত প্রতিভা ও নৈপুণ্য এবং অনুশীলন তাঁর ছিল না। এ সব ত্রুটি স্বীকার করেও মানতে হয়, নবীনচন্দ্রের সহজ, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী ছন্দ এবং সমকালীন কাব্যে দুর্লভ অলঙ্কার প্রয়োগ ও স্বচ্ছ, সহজ ভাষা তৎকালীন ও আধুনিক পাঠক-সমালোচকের কাছে সমাদৃত হয়েছে।

'নবীনচন্দ্রের কাব্যে একটা সচেতন ছন্দ প্রয়োগের পরিচয় মেলে না। তবে সাবলীল ছন্দোবদ্ধ পদ্য রচনায় তিনি স্বভাবদত্ত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতিতে যতিপ্রান্তিক পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দবদ্ধ এবং প্রবহমান পয়ার বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই ব্যবহার করেছেন। ভাবানুযায়ী ভাষার উপর তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। মধুসূদন পাশ্চাত্যের ক্লাসিক আদর্শের ভাব ও ছন্দ পরিস্ফুট করতে গিয়ে ভাষাকে অনেকাংশে দুরূহ, সচেতন প্রয়াসলব্ধ করেছিলেন। হেমচন্দ্র অতিমাত্রায় ছন্দসচেতন হতে গিয়ে অনেক সময় ভাষাকে কুণ্ঠিত করে তুলেছেন। নবীনচন্দ্রের ভাষা ও ছন্দ সে তুলনায় স্বচ্ছ, সহজ, স্বতোৎসারিত ধারায় প্রবাহিত।'[১]

নবীনচন্দ্রের কাব্যে মধুসূদনের অনুসৃতি পূর্ব-সংস্কার বশেই ঘটেছে। কোন কবি বা কাব্যই স্বয়ম্ভু হতে পারে না। কোন কবির কাব্যই দেশকাল-নিরপেক্ষ, পূর্বজ কবিদের সংস্পর্শশূন্য হয় না। নবীনচন্দ্রের কবিপ্রাণ যেখানে মধুসূদনের সমধর্মী সেখানে কাব্যাঙ্গিকেও দেখি মধুসূদনের অনুবর্তন। যদিও ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রে মধুসূদন ছিলেন অননুকরণীয়। একমাত্র রঙ্গমতী কাব্যে তিনি সচেতন ভাবে অল্পক্ষণ মধুসূদনের ছন্দ ও বাক্‌বৈভবের অনুসরণ করেছিলেন। এখানেও অবশ্য সমিল ও অমিল প্রবহমান পয়ারে নবীনচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। পংক্তি-শেষে একটি যতি নবীনচন্দ্র অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। মধুসূদনের প্রবর্তিত ছন্দে যে পরিমাণ তিনি স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন, সেই পরিমাণেই তিনি রবীন্দ্রযুগের ছন্দের উদ্যোক্তা। ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের মন্তব্যের আলোয় আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট হবে।

'প্রাক্‌রবীন্দ্র কবিরা ··· পূর্ব সংস্কার বশেই যৌগিক ছন্দকে অক্ষর-প্রতিষ্ঠ মনে করতেন। তাদের কান অর্থাৎ স্বাভাবিক ধ্বনিরসবোধ অনেক সময়ই সম্ভবত তাদের অজ্ঞাতসারেই ওই সংস্কারকে লঙ্ঘন করে গিয়েছে। আর ঐ লঙ্ঘনের ফলেই ওই ছন্দের স্বরূপ মাঝে মাঝে উদ্ঘাটিত হয়েছে। যেমন অন্ধকারের মধ্যেও হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে পথিকের সম্মুখবর্তী পথের রেখা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।'[২]

১. আধুনিক বাংলা ছন্দ, নীলরতন সেন পৃ. ১২৫
২. ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, প্রবোধচন্দ্র সেন পৃ. ৩৮

নবীনচন্দ্রের স্বাভাবিক ধ্বনিরসবোধ আগামী যুগের কাব্যের সঙ্গে তাঁর কাব্যের একটি যোগসূত্র রচনা করেছিল। প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে রবীন্দ্রপূর্ব বাংলাকাব্যে যুগ্মধ্বনির লীলা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবীন-কাব্যে যুগ্মধ্বনির দ্বৈতরূপের লীলা কেমনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, কুরুক্ষেত্র কাব্যের উদাহরণ সহ তার আলোচনা করেছেন।

নবীনচন্দ্রের কাব্যে প্রধানত একটি রীতির ছন্দই ব্যবহৃত। এই রীতি হল—বিশিষ্ট কলামাত্রিক বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন—সাধুরীতির বা পয়ারজাতীয় ছন্দ। সাধুরীতির ছন্দই এযাবৎ বাংলা সাহিত্যের একমাত্র ছন্দ বললে অত্যুক্তি হয় না। নবীনচন্দ্র এই বিশিষ্ট কলামাত্রিক বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সহজাত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কবি ছিলেন চট্টগ্রামের অধিবাসী। প্রাকৃতরীতির ছন্দ ছিল তাঁর অনায়ত্ত। প্রাকৃত-রীতির বা লৌকিক ছন্দের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে ধরার মত তাঁর কান ছিল না। বাংলাভাষায় এই ছন্দ বহুপরিমাণে পশ্চিমবঙ্গীয় কথ্যভাষার উচ্চারণ রীতির উপর নির্ভরশীল। যদিও নবীনচন্দ্র তাঁর 'আমার জীবন'-এ চট্টগ্রামদুর্লভ কলকাতার ভাষায় অনায়াসদক্ষতার জন্য আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করেছেন, তবুও স্বীকার্য, খাঁটি পশ্চিমবঙ্গীয় কথ্যভাষার নিখুঁত বাগ্‌শৈলীর সঙ্গে একাত্মতার অভাবেই লৌকিকরীতির ছন্দ তিনি সৃষ্টি করতে পারেন নি।

সুবোধরঞ্জন রায় তাঁর 'নবীনচন্দ্রের কবিকৃতি' গ্রন্থে রঙ্গমতীকাব্যের মাঝিদের গানটি স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দে রচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আবার গ্রন্থের ভূমিকাংশে তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধের পরীক্ষক প্রবোধচন্দ্র সেনের নির্দেশে—"এটি স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ নয়, ধ্বনিপ্রধান ছন্দ"—এই মন্তব্য-সহ ত্রুটি সংশোধনও করেছেন। এখানে বক্তব্য হল—বাংলাছন্দকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। (১) দলবৃত্ত বা Syllabic ছন্দ :—রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দের নাম দিয়েছেন বাংলা প্রাকৃত ছন্দ, প্রবোধচন্দ্র বলেন, স্বরবৃত্ত বা লৌকিক, অমূল্যধনের মত শ্বাসাঘাত প্রধান; (২) কলাবৃত্ত বা Moric ছন্দ :—রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম—সংস্কৃত ভাঙা, প্রবোধচন্দ্র—মাত্রাবৃত্ত—অমূল্যধন—ধ্বনি প্রধান; (৩) মিশ্রকলাবৃত্ত বা Mixed Moric :—সাধু বা পয়ার জাতীয় ছন্দ বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, প্রবোধচন্দ্র অক্ষরবৃত্ত বা যৌগিক, অমূল্যধন বলেন তানপ্রধান ছন্দ।

মাঝিদের গানটি যেমন স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত ছন্দের রচনা নয়, তেমনি কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও রচিত হয় নি। এটি বাংলাভাষার নিজস্ব ছন্দ, বিশিষ্ট কলামাত্রিক বা অক্ষরবৃত্ত বা পয়ারজাতীয় ছন্দের নমুনা। প্রাকৃত-রীতির ছন্দের একটা আমেজ এর মধ্যে আছে। গীতটির কিয়দংশ উদ্ধৃত হল।

১

একবার—একবার,
বঁধু মোর—কণ্ঠহার !

২

একবার—দুইবার,
বঁধু মোর— চন্দ্রহার

৩

একবার—তিনবার,
প্রাণবঁধু—অবলার।…

ইত্যাদি।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা—'ছিপখান্ তিনদাঁড়্ তিনজন্ মাল্লা'-র সঙ্গে উপরোক্ত গীতের ধ্বনিঝঙ্কারের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এখানে বক্তব্য এই যে,—সত্যেন্দ্রনাথ কবিতাটি সংস্কৃত বিদ্যুন্মালা ছন্দে রচনা করেছেন—যার সঙ্গে বাংলা মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত ছন্দের একাত্মতা আছে। নবীনচন্দ্রের উপরোক্ত গীতটি যদি মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত বা কলামাত্রিক (একই ছন্দের নাম) রীতিতে মাত্রা গণনা করি, তাহলে রুদ্ধদল দুই কলা, মুক্তদল এক কলা এই হিসাবে মাত্রা-সংখ্যা দাঁড়ায় দুইপর্বে প্রতি পংক্তিতে ৪+৪, ৪+৫, ৪+৪, ৪+৫ ; ৪+৪, ৪+৪। শেষ পংক্তিতে শেষ পর্বে ৫-এর স্থলে ৪ মাত্রা এসেছে। পর্বগুলিতে, অতএব, মাত্রাসংখ্যার সমতা নেই। তৃতীয় স্তবকের শেষ ছত্রেই তার উদাহরণ আছে। সত্যেন্দ্রনাথের উপরোক্ত কবিতাটিতে প্রতি পংক্তিতে দুটি পদ ; চারটি পর্ব এবং শেষের পর্বটি অপূর্ণ এবং তিন মাত্রার। প্রথম তিনটি পর্বে প্রতিটিতে চারটি করে মাত্রা আছে। বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতি অনুসারে নবীনচন্দ্রের উল্লিখিত রচনাটির মাত্রা বিচার হবে—৩+৩, ৪+৪ ; ৩+৩, ৪+৪ ; ৩+৩, ৪+৪। 'প্রাণবঁধু' এশব্দে 'প্রা'র উপর টান দিয়ে এক মাত্রা বৃদ্ধি হয়েছে।

নবীনচন্দ্রের কবিতায় শ্বাসাঘাতপ্রধান বা ধ্বনিপ্রধান অর্থাৎ দলবৃত্ত বা দলমাত্রিক এবং কলাবৃত্ত বা কলামাত্রিক ছন্দ ব্যবহৃত হয় নি। যদিও এই যুগের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লৌকিক, শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন এবং নিপুণতাও প্রদর্শন করেছেন। এর প্রধান কারণ এই রচনাভঙ্গীর সঙ্গে গুপ্ত কবির আবাল্য পরিচয় ছিল। নবীনচন্দ্রে ছিল যার অভাব।

নবীনচন্দ্র প্রধানতই সাধুরীতির বিশিষ্ট কলামাত্রিক ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর সহজাত ছন্দবোধ 'বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ, জোড়ে গাঁথ জোড়'—বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতির এই মাত্রাবিভাগ পদ্ধতিকে অনুসরণ করে গেছে। পর্বগুলির মাত্রা-সংখ্যা প্রায়শই দেখি ৩+৩+২, এবং ৩+৩; অথবা ৪+৪, এবং ২+৩। এভাবে চতুর্দশ মাত্রার পংক্তিতে ৮+৬ বিভাগ অক্ষুন্ন থেকেছে সহজেই। কখনও কখনও চৌদ্দ মাত্রার পয়ারবন্ধে চলে এসেছে পনেরো মাত্রা। তবে মাত্রাভিত্তিক ছন্দোপতনের দৃষ্টান্ত নবীনচন্দ্রের খুব বেশী নেই।

নবীনচন্দ্রের অধিকাংশ কাব্যই রচিত পয়ারবন্ধে। কখনও সে পয়ার সমিল, কখনও অমিল। কখনও প্রবহমান, কখনও দুই ছত্রের বাঁধনে বাঁধা। প্রবহমান পয়ারে অন্ত্যমিলের ব্যবহার থেকেছে প্রায়শই। কিন্তু অন্ত্যমিল প্রবহমানতায় ব্যাঘাত জন্মায় নি। পলাশির যুদ্ধ-এ প্রবহমান পয়ারে মিল হল—ক খ ক খ এই রীতিতে। অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয়, দ্বিতীয়-চতুর্থ পংক্তির মিল।

নবীনচন্দ্র পয়ার ব্যতীত দীর্ঘ ত্রিপদী এবং মিশ্ররীতির ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করেছেন। লঘু ত্রিপদীর ব্যবহার মাত্রাবৃত্ত ছাড়া অন্য ছন্দে সুললিত হয় না। নবীনচন্দ্রের স্বাভাবিক ছন্দবোধ এ কারণেই লঘুত্রিপদীর ব্যবহারে অনুপ্রেরণা পায় নি। 'রঙ্গমতীর' চন্দ্রকলার গীতি দীর্ঘত্রিপদী ছন্দে রচিত। অবকাশরঞ্জিনী, কাব্যত্রয়ী ও অন্যান্য কাব্যেও এই ত্রিপদীবন্ধের রচনা আছে। নবীনচন্দ্রের মিশ্ররীতির ত্রিপদী রচনার উদাহরণ—

প্রচণ্ড তপন-ত্রাস কালের তিমিরে হায়,
এই ক্ষীণালোক
হয়ে ক্রমে ক্ষীণতর হতেছিল নির্বাপিত,

কেন অকরুণ প্রাণে,
জ্বালাইলে পুনরায় ?[১]

এখানে মাত্রা-সংখ্যা ৮+৮+৬, ৮+৮+৮+৮। 'একদিন', 'জুমিয়া-জীবন', 'অনন্ত দুঃখ' প্রভৃতি অবকাশরঞ্জিনীর কবিতায় ৮+৬, ৮+৮ এই মাত্রা-বিভাগ আছে—মিশ্ররীতির ত্রিপদীবন্ধে। 'পলাশির যুদ্ধ' এবং 'রঙ্গমতী'-তে যুদ্ধের বর্ণনায় এই মিশ্ররীতির ত্রিপদী ব্যবহৃত হয়েছে। 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাসে', তার ব্যতিক্রম হয় নি।

নবীনচন্দ্রের লঘুত্রিপদী রচনার প্রয়াস রূপে 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী' কবিতা এবং 'রঙ্গমতী'র পঞ্চম সর্গের গীতটি উল্লেখযোগ্য।

সখিরে !—
পরম আদরে, অন্তরে আমার,
রোপিনু প্রণয়লতা ;
বিষময় ফল, ফলিল এখন,
বাসনা হইল বৃথা।

'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী'—এই কবিতার মাত্রা-বিন্যাস ৬+৬+৮, ৬+৬+৮— লঘুত্রিপদীবন্ধের বৈশিষ্ট্য।

'রঙ্গমতী'-র পঞ্চম সর্গের গীতটিতে কিছু নূতনত্ব আছে।

জীবন না যায় রে !
যায় দিন যায়, দিনমণি যায়,
নিবিয়া নিবিয়া রে !
সাগর নীলিমে, বাড়ব অনল,
মিশিয়া মিশিয়া রে !
যায় দিন যায়, দেখিতে দেখিতে
ছায়াতে মিশায় রে !
সকলি তো যায়, কেবল দুখের
জীবন না যায় রে !

১. 'উত্তর', অবকাশরঞ্জিনী ২য় ভাগ

দ্ব্যক্ষর রুদ্ধদল 'যায়', 'দিন' প্রভৃতির দুই মাত্রা গণনা হবে। 'রে'-এর উচ্চারণও দীর্ঘ এবং দুই মাত্রার। গীতাংশটি বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতির লঘু ত্রিপদীর উদাহরণ। মাত্রা বিন্যাস হয়েছে ৬+৬+৮ মাত্রা হিসাবে প্রতি পংক্তিতে।

রৈবতক কাব্যে এ জাতীয় ত্রিপদীবন্ধ পাওয়া যায়।

রৈবতক শৃঙ্গে বিচিত্র কানন
বিচিত্র পাদপচয়,
স্বভাবে রোপিত, স্বভাবে বর্ধিত,
স্বভাবের শোভাময়।

তবে এ জাতীয় ছন্দ তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত হয়েছে।

নবীনচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন অবকাশরঞ্জিনী, দ্বিতীয় ভাগের কবিতা 'অশোক বনে সীতা', 'কে তুমি', প্রভৃতিতে এবং 'রঙ্গমতী' ও কাব্যত্রয়ীতে। তবে, মধুসূদনের ভাব ও ভাষার গাঢ়বন্ধতা, ওজস্বিতা নবীনচন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। বিশেষত কবির ভাবাতিরেক, গীতি-উচ্ছ্বাস অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপযোগী ছিল না। মহাকাব্যোচিত ওজস্বী, ভাবসমৃদ্ধ বাগ্‌বৈভব, ছন্দের সেই সুকঠিন আয়াসসাধ্য ভঙ্গী নবীনচন্দ্র আয়ত্ত করতে সক্ষম হন নি। নবীনচন্দ্রের প্রতিভা ছিল গীতিকবির। প্রবণতাও ছিল গীতিকবিতা রচনার, অথচ মহাকবির ভাবপ্রেরণা ছিল সহজাত ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। যুগপ্রয়োজনে উনবিংশ শতাব্দীর কর্মযজ্ঞের ঋত্বিক্ হয়ে গীতি-কবিতার শান্তশ্যামল বনভূমি ত্যাগ করে মহাকাব্যের রাজসূয় যজ্ঞের পৌরোহিত্য করেছেন। রাজসিকতা পুরা আয়ত্ত হল না। গীতিকাব্যের সহজসুরে মহাকাব্যের তান-লয় ভালো শোনালো না। তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দ মূলতই ব্যর্থ হল। তবু কখনও কখনও, যখন কবি কোন গূঢ়, গভীর কথা বা আদর্শ ব্যক্ত করেছেন, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দবৈভব সেই মুহূর্তে ধরা পড়েছে তাঁর কবিতায়। 'কুরুক্ষেত্র'-এর ত্রয়োদশ সর্গে মধুসূদনের অনুবৃত্তি নয়, প্রেরণারই কার্যকরী। অপ্রত্যক্ষভাবে মধুসূদনের ছন্দ নবীন-কবির আপন ছন্দকে পরিস্ফুট করেছিল।

নীচে নীরব, নিদ্রিত
কুরুক্ষেত্র ;—কি বিরাট মূর্তি অশান্তির !
বিরাট রাক্ষস-মূর্তি বীরত্ব ভীষণ
ভারতের, দিবসেতে জীমূত নির্ঘোষে
গরজি অসংখ্য কণ্ঠে, সংখ্যাতীত ভুজে
প্রহারি অসংখ্য বজ্র, অসংখ্য চরণে
বীরদর্পে বসুন্ধরা করিয়া কম্পিত,
যোজন যোজনান্তর বিরাট শরীরে
ব্যাপি আত্মঘাতী এবে নীরব নিদ্রিত,—
ঝটিকান্তে সুপ্ত মহা পারাবার মত !

—কুরুক্ষেত্র. ত্রয়োদশ সর্গ

রঙ্গমতী কাব্যের সূচনায় মধুসূদনের অনুবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়—

নবীন নিদাঘ আভা, প্রখর উজ্জ্বল,
পড়িয়াছে বসন্তের কম-কলেবরে, —
ভাঙ্গিল বিলাস-স্বপ্ন ; ঋতুকুলপতি
জাগিলা ফাল্গুন-শেষে কুসুমশয্যায়
প্রণয়িণী-উরঃস্বর্গে, প্রভাতে যেমতি,
জাগিলা প্রেমিক, নিশি-বিলাসে বিহ্বল।

কবি এখানে যথাসাধ্য মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুসরণ করেছেন। যথা-পরিমিত মুক্তদল ও রুদ্ধদল শব্দ ব্যবহার পংক্তিশেষে অমিল শব্দ প্রয়োগ—অমিত্রাক্ষর ছন্দের রীতি। রঙ্গমতীতে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ অচিরেই মিলহীন প্রবহমান পয়ারে পরিণত হল—ভাবের গাঢবদ্ধতা ও ভাষার গাম্ভীর্যের অভাবে। এক বিষয়ে নবীনচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্বের দাবীদার। তা হল, ছন্দের অন্তর্নিহিত সৌষম্য রক্ষার মত তাঁর একটি সহজাত ক্ষমতা ছিল। মধুসূদন বহু সময়ই পংক্তিশেষে লঘু যতি ব্যবহার করেন নি। এরই জন্যে ছন্দ কখনও কখনও দুর্বল বা আড়ষ্ট হয়েছে। নবীনচন্দ্র অনুভব করেছিলেন পংক্তি-শেষে একটু বিরাম বাঞ্ছনীয়। তাই, তাঁর কাব্যে পংক্তিশেষে সর্বদা তিনি একটি যতি ব্যবহার করেছেন। কবিতায় অর্থযতি যেখানেই পড়ুক পংক্তির

শেষে পর্ব বা পদযতি তাঁর অক্ষুণ্ণ ছিল। পূর্বোক্ত কাব্যাংশেই তার নিদর্শন মেলে। অক্ষরবৃত্ত বা বিশিষ্ট কলামাত্রিক ছন্দের উপযোগী মাত্রাবিভাগ-রীতি মধুসূদন সব সময় নির্ভুলভাবে ব্যবহার করেন নি। তাঁর কাব্যে বহু সময় মাত্রাবিন্যস্ত হয়ে ৩+২+৩— এই হিসাবে পর্ব ও পদ গঠিত। এতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের স্বাভাবিক চাল বজায় থাকে নি। এদিক থেকে নবীনচন্দ্র মধুসূদনের চাইতে অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

নবীনচন্দ্রের কাব্যে পরবর্তী 'মুক্তক' ছন্দের পূর্বাভাস পাই। এ প্রসঙ্গে 'অবকাশরঞ্জিনীর' 'স্বপ্ন উন্মত্ততা' কবিতা উল্লেখযোগ্য। কবিতাটি প্রধানত ৮+৬, ৮+৬, ৮+৮, ৮+৬, ৮+৬ মাত্রার পংক্তিতে রচিত। ছয়টি লাইন বা ছত্রের স্তবক। যদি তৃতীয় চতুর্থ ছত্রকে এক পংক্তি গণনা করি তাহলে পাঁচ পংক্তির এক একটি স্তবক আছে। কিন্তু কবি নিয়মিত মাত্রা-বিন্যাস বজায় রেখে, একই জাতীয় পর্ব ও পদে পংক্তি রচনা করে কবিতাটি শেষ করলেন না। চূড়ান্ত অনিয়ম হল একাদশ স্তবকে।—

দাও, সখে! সুরাপাত্র, ওই বিষবারি,
নিবাই স্মৃতির জ্বালা;
তুমি মূর্খ!
নিষ্ঠুর হৃদয় তব,
নাহি কর অনুভব,
সুরাপাত্র, হায়! কত সন্তাপসংহারী!

এখানে অসমমাত্রার অনিয়মিত পংক্তি রচনায় ভবিষ্যতের[১] মুক্তক ছন্দের আভাস পাই।

গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে একদা নবীনচন্দ্রের পত্রালাপ হয়েছিল। তাতে দেখি নবীনচন্দ্র গিরিশ-প্রবর্তিত এই নূতন ছন্দ সম্বন্ধে নীরব থেকেছেন। এক্ষেত্রে অনুমান, সম্ভবত কৌতূহলবশত ভাবের টানে নবীনচন্দ্র 'স্বপ্ন উন্মত্ততা' কবিতায় এই স্তবকটি লিখে ফেলেছেন, যার মধ্যে গৈরিশছন্দের প্রভাব রয়ে গেছে।

প্রবহমান অমিল পয়ারে ৮+৬ মাত্রা ভাগ বজায় রেখে নবীনচন্দ্র অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে 'রৈবতক,' 'কুরুক্ষেত্র,' 'প্রভাস'-এ নাট্যধর্মী সংলাপ রচনা করেছেন। এখানেও মুক্তকাভাস ছন্দের অভ্রান্ত পদসঞ্চার ধরা পড়ে।

শুনিয়াছ তুমি কৃষ্ণ! দুরন্ত কংসের
অত্যাচার ?

আমি

শুনিয়াছি।

অসুর

এস তবে মিলি
শার্দূলের রক্তভৃষা করি নিবারণ।

আমি

কংস মথুরার পতি ; গোরক্ষক আমি ,
পতঙ্গ হিমাদ্রি কাছে।

অসুর

যেই পরাক্রম
কাননের অঙ্কে অঙ্কে হয়েছে অঙ্কিত,
নাগেন্দ্র কালীয়বক্ষে, অসুর হৃদয়ে,—
নহে পতঙ্গের তাহা।

এই অংশে দেখছি, পয়ারের ৮+৬ মাত্রা ভাগ নিয়মিত রেখেও অতি সহজে কথোপকথনের ভঙ্গীটি সহজেই রক্ষিত হয়েছে। রীতিমত চৌদ্দ অক্ষরের পংক্তিতে অনায়াসে এটি সাজানো যায় এভাবে—

শুনিয়াছ তুমি কৃষ্ণ দুরন্ত কংসের
অত্যাচার ? শুনিয়াছি। এসো তবে মিলি
শার্দূলের রক্তভৃষা করি নিবারণ।
কংস মথুরার পতি ; গো রক্ষক আমি ; —
পতঙ্গ হিমাদ্রিকাছে। যেই পরাক্রম
কাননের অঙ্কে অঙ্কে হয়েছে অঙ্কিত,
নাগেন্দ্র কালীয় বক্ষে, অসুর হৃদয়ে,—
নহে পতঙ্গের তাহা।

সংলাপধর্মী এই প্রবহমান পয়ারে ভবিষ্যৎ আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দবৈচিত্র্য, ছন্দৈশ্বর্য ছন্দমুক্তির পথ প্রদর্শিত হল।

নবীনচন্দ্রের কাব্যের ভাষা একদা সাহিত্যরসিক মহলে প্রশংসিত ছিল।

'প্রৌঢ় শরতের শেফালী বর্ষার ন্যায় তাঁহার ভাষা আপনি আসে, আপনি ফুটে, আর আপন সৌরভে দশদিক আমোদিত করিয়া দেয়। তাই তাঁহার এই তিনখানি কাব্য উদ্দেশ্যমূলক ও সিদ্ধান্ত-বিন্যাসক হইলেও তাহার গুণে অনেকের আদরের হইয়াছে।'[১]

এ উক্তি কাব্যত্রয়ী সম্পর্কে হলেও, সমগ্রভাবে নবীন-সাহিত্য সম্পর্কেই প্রযোজ্য। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস মহাকাব্যরূপে পরিচিত। মহাকাব্যের শিল্পকলা যত্নসাধ্য। অথচ লেখকের এই মন্তব্যের মধ্যে নবীনচন্দ্রের ভাষায় স্বচ্ছন্দতার প্রতি, সাবলীল গতি ও অনায়াসলব্ধতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাস্তবিকই নবীনচন্দ্রের কাব্যে ভাষার স্বতোৎসারিত প্রবাহ তাঁর কাব্যকে সরস, সুখপাঠ্য, গীতধর্মী এবং হৃদ্য করেছে। ভাষার জন্যে কবিকে শব্দ খুঁজে নিতে হয় নি। ভাবের জোয়ারের সঙ্গে আপনি ধরা দিয়েছে তারা। তাই নবীন-কাব্যে আভিধানিক অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার নেই।

নবীনচন্দ্র যখন মহাকাব্য-রচয়িতা অথবা যখন অন্যত্রও কাব্যাঙ্গিকে মধুসূদনের অনুবর্তী, তখন তাঁর মধ্যে মধুসূদনের বাক্‌শৈলীর অনুপ্রেরণা লক্ষ্য করি। এই প্রেরণা অনুকরণ ছিল না কখনই। প্রভাবিত এ ভাষা ছিল একান্তভাবেই নবীনচন্দ্রের নিজস্ব।

চিত্র নভঃ কিরীটিনী সচন্দ্ররজনী,
চিত্রি বিকসিত নৈশ কুসুমমালায়
উদ্যান, সরসী নীর ; অযুত রতনে
চিত্রি' সচঞ্চল চির-নীল নীরনিধি,
ভাসিছে নিদাঘাকাশে। —অশোকবনে সীতা, অবকাশরঞ্জিনী ২য়

এখানে তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ, দৃঢ়পিনদ্ধ রচনারীতি অমিত্রাক্ষরের স্বভাবটি আয়ত্ত করেছে। কিন্তু সহজ কবিপ্রাণ এই প্রসারিত কাব্যকলাকে বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারে নি। কিছু পরেই দেখি,—

কেবল কোথায় কোন উচ্চ তরুবর
অরণ্য হইতে তুলি' উচ্চতর শির,

---

১. 'নবীনচন্দ্র', পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য ১৩১৫

করিতেছে আকাশের সীমা নিরূপণ।
চিত্রিত আকাশ— চন্দ্র—ভূধর—সাগর
চিত্ত বিমোহিনী শোভা ! মরি কি সুন্দর !

—অশোকবনে সীতা, অবকাশরঞ্জিনী ২য়

কবির ভাষা এখানে স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত। এ স্বধাম গীতিকবিতার জগতে প্রতিষ্ঠিত। একটু শিথিল—একটু প্রাণমনের কাছাকাছি। সহজবোধ্য, সহজলব্ধ বাংলাভাষা গীতিকবিতার সুরটিকে স্পষ্ট করেছে।

নবীন-কাব্যে মাঝেমাঝেই নামধাতুর প্রয়োগ-আতিশয্য মধুসূদনের কথা স্মরণ করায়। 'বিশ্রামিছে', 'বিদাইয়া' ইত্যাদি নামধাতুর ব্যবহার কাব্য-ছন্দের প্রয়োজনেই হয়েছে।

নবীনচন্দ্রের কাব্যে শব্দ-প্রয়োগে কবির অন্যমনস্কতা এবং অযত্ন-প্রয়োগ মাঝে মাঝেই পীড়াদায়ক হয়েছে। মহাকাব্যের মধ্যে এ জাতীয় ত্রুটি বা শৈথিল্য আরো দোষবহ। যেমন দুর্বাসার চরিত্র উপযোগী হলেও মহাকাব্যের মধ্যে নিতান্ত ঘরোয়া শব্দ ও শৈলীর প্রয়োগ কাব্যের ওজস্বিতা খর্ব করেছে।

ব্যাধির মন্দির দেহ— থক্ থক্ থকাথক্—
কিন্তু কি যে বলিতেছিলাম—

—রৈবতক, ত্রয়োদশ সর্গ।

আবার জরৎকারু যখন বলে,—

যে প্রেম হৃদয়ে মম পারে পারাবার সম
প্লাবিবারে বিশ্বচরাচর,—

তখন মহাকাব্যের মধ্যে গীতিকবিতার স্নিগ্ধ দ্যুতি একটি বিশেষ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। কিছু পরেই দেখি জরৎকারুর উক্তি···-

সখীরে অবস্থা যারে গড়িয়াছে, গড়িবারে
পারে সেই রূপ অন্য জন,

তখনও গীতিকবিতার আত্মগত আবেগের স্পর্শ মুগ্ধ করে। কিন্তু পরবর্তী পংক্তিতেই যখন পড়ি—

গাধা পিটে হয় ঘোড়া যষ্টিভরে চলে খোঁড়া
ভেলা করে সমুদ্র লঙ্ঘন।

তখন ভাব ও ভাষার আকস্মিক পদস্খলনে রসবোধ আহত হয়। জরৎকারুর প্রেমের বেদনা, দহনজ্বালা, আন্তরিকতা, তীব্রতা হারিয়ে হাস্তকর হয়ে ওঠে।

এ জাতীয় অনবধানতার নিদর্শন নবীন-কাব্যে অজস্র। কাব্যত্রয়ীতেই 'পোড়ামুখী', 'ঠোন্‌কা', 'কানা চোখে কুটা পড়ে' প্রভৃতি শব্দও বিশিষ্টার্থক প্রয়োগে বাস্তব পরিবেশ হয়ত সৃষ্টি হয়েছে—কিন্তু এক্ষেত্রে মহাকাব্যের আবহসঙ্গীতে ছন্দপতন অস্বীকার করা যায় না। 'কুরুক্ষেত্র'-এর শিবিরে উত্তরা-অভিমন্যুর মুখে 'বাবা' 'মামা' ইত্যাদি শব্দগুলি এ কারণেই পীড়াদায়ক।

অনবধানতা ও অনুশীলনের কোথাও কোথাও অভাব থাকলেও নবীন-সাহিত্যে প্রায় সর্বত্রই কবির লেখনীর অব্যাহত গতি, বিষয়ানুরূপ শব্দচয়ন-দক্ষতা, বাক্যের অন্তর্নিহিত ধ্বনিপ্রবাহে সাবলীলতা নবীনচন্দ্রের স্বভাবগত কবিত্বের পরিচায়ক। নবীন-কবির প্রতিভা ছিল গীতিকবির। তাঁর বাক্-সম্পদ ছিল তদনুযায়ী। শুধু মহাকাব্যের জগতেই নয়, অন্যত্রও যখন তিনি কাব্যরচনা করেছেন, বিশেষতঃ যখন তিনি মহাকবির দায়িত্ব বিস্মৃত হয়েছেন, তখন তাঁর ভাষার স্নিগ্ধতা, উজ্জ্বলতা, মাধুর্য ও অর্থবহতা প্রশংসনীয়। এ সব ক্ষেত্রে তাঁর স্বভাবগত নৈপুণ্য আমাদের মুগ্ধ করে।

ভাষা ও ছন্দের মত অলঙ্কার প্রয়োগেও নবীনচন্দ্রের সহজাত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। আলঙ্কারিক বিচারে দেখি, শব্দালঙ্কারের প্রয়োগ তাঁর কাব্যে অল্প। নবীনচন্দ্র বাল্যকালে এবং প্রথম যৌবনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুকরণে কবিতা লিখতে পছন্দ করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পদ্য পাঠ করতেও ভালবাসতেন। তবু ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ প্রভৃতি শব্দালঙ্কারের ব্যবহার তাঁর কাব্যে সামান্য। কবিতা মাত্রেই অনুপ্রাস অল্পবিস্তর থাকেই ছন্দস্পন্দের প্রয়োজনে। অনুপ্রাস-বাহুল্যই কাব্যসৌন্দর্যের পরিপন্থী হয়। এজাতীয় ত্রুটি নবীনকাব্যে ঘটে নি। ঈশ্বর গুপ্তের যমক প্রভৃতি শব্দালঙ্কারের প্রভাব নবীনচন্দ্রের প্রথম জীবনে রচিত কবিতায় কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়। যেমন,—

তবু তুমি সুখে আছ করিলে শ্রবণ,
শব-দেহে সব সবে, বিদায় এখন।

—প্রতিমাবিসর্জন, অবকাশরঞ্জিনী ১ম

অর্থালঙ্কারের মধ্যে উপমার পর্যাপ্ত প্রয়োগ ছাড়াও, সমাসোক্তি, উৎপ্রেক্ষা, রূপক অলঙ্কারের প্রচুর ব্যবহার দেখি। রামায়ণ-মহাভারত থেকে, বঙ্কিমচন্দ্র-শেকস্‌পীয়রের রচনা থেকে, পর্বত-অরণ্য সমুদ্র থেকে কবি উপমা সংগ্রহ করেছেন। রামায়ণ থেকে উপমা—

বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীর করেতে ধরিয়া,
আনিলেন সগৌরবে; ধনুক ভাঙ্গিয়া
নৃপতি-সমাজে, যথা জানকী-জীবন
আনিলেন জনকের দুহিতা রতন।

—অপ্রকৃত স্বপ্ন, অবকাশরঞ্জিনী ১ম

সমাসোক্তি, উৎপ্রেক্ষা, রূপক অলঙ্কারের অজস্র প্রয়োগ তাঁর কাব্যে পাই। কখনও একই বর্ণনাংশে দুটি অলঙ্কারের সমাবেশ হয়েছে। পলাশির যুদ্ধ-এ—

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর,
শোণিত আরক্তকায়,
অস্ত গেল রবি হায়!
অস্ত গেল যবনের গৌরব-ভাস্কর।

এই স্তবকে একত্রে দুটি অলঙ্কার—উৎপ্রেক্ষা ও রূপক রয়েছে। প্রথম তিন ছত্রে উৎপ্রেক্ষা, শেষ পংক্তিতে রূপক। এমনিভাবে কখনও কখনও উপমা ও রূপক এক ইংরেজি Allusion বা উল্লেখন অলঙ্কারের একত্র অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

নবীনচন্দ্র ছিলেন সমুদ্রবেষ্টিত চট্টগ্রামের অধিবাসী। কাব্যে তাই কবি উপমা এনেছেন সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য খুঁজে। অলঙ্কার-প্রয়োগে কবির এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্বের সঞ্চার করেছে। যেমন সমুদ্র থেকে—

ক। শৈশব যখন
খেলিনু মনের সুখে; সাগর-কপোতে
খেলে সেই মতে শান্ত সুনীল সাগরে,
প্রসারিয়া পক্ষপুট জলধি উপরে।

খ।　　　দুঃখের আবর্ত্তশ্রেণী আসিতেছে বেগে
　　　ডুবাইতে জীর্ণতরী ভীষণ প্রহারে ;

গ।　　　থামিল উৎসব-সিন্ধু কল্লোল নিমিষে।

ঘ।　　　সে সমুদ্র-ভালবাসা শুকাল কেমনে !

ঙ।　　　　　　　নিম্নে তরঙ্গিত
　　　চতুরঙ্গে, রণরঙ্গে ভীম উদ্বেলিত,
　　　গর্জিতেছে রক্তসিন্ধু মহাভারতের
　　　মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র !

সমুদ্রের মতই পর্বতের উপমান আছে পর্যাপ্ত। কখনও পার্বত্য নির্ঝরিণীর কথা এসেছে স্মরণে। শুধু উপমান নয়, উপমেয় হয়ে।

যেমন,　ক।　　　　　　…দেখিলা বিস্ময়ে
　　　সম্মুখে বিরাটমূর্তি ! একি অকস্মাৎ
　　　ধবলা গিরির চূড়া পড়িল কি খসি !

খ।　　　　　　…দেখিতে দেখিতে
　　　শ্যামল পর্বত-অঙ্গে রবিকরোজ্জ্বল
　　　স্ফটিক সলিল-ধারা,—ধবল-উত্তরী
　　　মাধব উরসে যেন, …　…
　　　হইলাম হৃতমনা।

গ।　　　ঝরিছে সহস্রধারা স্রোত মনোহর,
　　　উচ্চ-ভীম—শৃঙ্গ হতে সহস্র ধারায়,
　　　মরি যেন গিরিমূলে অনন্ত বরিষা !

নবীনচন্দ্রের কাব্য পড়তে গিয়ে সমতল বঙ্গভূমির অধিবাসী আমরা অপরিচিত পরিবেশে লালিত এক কবির সন্ধান পাই। বিদেশী সাহিত্য থেকে ধার করা নয় এসব বর্ণনা ও অলঙ্কার। কবির অতি পরিচিত জন্মভূমি সাগরমেখলা, ভূধর-কুন্তলা চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আহৃত। আলঙ্কারিক চাতুর্য নয়, আলঙ্কারিক বৈভব এবং মৌলিকতাই নবীনচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। এই মৌলিকতা স্ব-কালে তাঁকে জনপ্রিয়তার উচ্চ শিখরে তুলেছিল।

নবীনচন্দ্রের কাব্যালঙ্কার সযত্ন প্রয়াসলব্ধ নয় বলেই অনবদ্য সৌন্দর্যের আধার হয়েছে। যেমন—

ক। চেয়ে আছে অভাগিনী,—নিদাঘ-বিদগ্ধ ধরা
কাতরা পিপাসাতুরা চাহি নবঘনে।

খ। ···দেখিলা অদূরে
দুইজনে নিরানন্দ পাণ্ডব-শিবির
আভাহীন শোভাহীন, বিজয়া-প্রদোষে
যেন শূন্য পূজাগৃহ নিরানন্দময়।

গ। বালিকার অবসন্ন প্রাণে ধীরে ধীরে
ক্লান্ত বিশ্বে প্রদোষের ছায়ার মতন,
সুকোমল নিদ্রা যেন করিছে প্রবেশ।

ঘ। সুরা নয়ন কোণায়
তীব্রতর ; তীব্রতম অলক্ত অধরে।

ঙ। বর্ণ নহে, স্বপ্ন স্বর্ণচম্পকের।

প্রকৃতির পরম আনুগুণ্যেই নবীনচন্দ্র কবি। তাই অত্যন্ত সহজে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। যেখানে তিনি আপন স্বভাবকে অনুসরণ করেছেন, সেখানে তিনি যথার্থ শিল্পী। যেখানে অন্যকে অনুসরণের চেষ্টা সেখানে স্বচ্ছন্দগতি ব্যাহত হয়েছে। মূলতই নবীনচন্দ্র সেন গীতিকবি। অথচ মহাকাব্যের ভাগীরথীধারার আহ্বায়ক হতে হল—মৃতপ্রায় জাতিকে সঞ্জীবনী মন্ত্র শোনাবার জন্যে। মহাকাব্যোচিত ভাব ও কল্পনাকে তিনি সহজাতভাবেই লাভ করেছিলেন। যখন মহাকাব্য রচনা করলেন তখন গীতমুগ্ধ কবিপ্রাণে কদাচিৎ অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হয়েছিল, তাই কখনও কখনও সেখানে শিথিলতা এল, কখনও ঈষৎ চপলতা। এসব ত্রুটি স্বীকার করেও বলি, নবীনচন্দ্রের কাব্যের রূপ ও আঙ্গিকে মৌলিকতা তাঁকে একটি বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী করেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নবীনচন্দ্রের গদ্যরচনা

'আমার জীবন'

কবিরূপেই নবীনচন্দ্র সাহিত্যরসিক সমাজে পরিচিত। নবীনচন্দ্র যে একজন কুশলী গদ্যশিল্পী ছিলেন এ তথ্য বহু জনেরই জানা নেই। নবীনচন্দ্রের গদ্য রচনাসমূহ দোষত্রুটি বর্জিত নয়। যে অসংযম ও শিল্পচাতুর্যের অভাবের উল্লেখে নবীনচন্দ্রের কাব্যগুলিকে অপাংক্তেয় করে রাখার চেষ্টা হয়, সে জাতীয় ত্রুটিবিচ্যুতি তাঁর গদ্যসৃষ্টির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কবি তাঁর বিপুলায়তন আত্মজীবনী গ্রন্থ .'আমার জীবন'-এ নিছক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এছাড়া গদ্যে পদ্যে মিশিয়ে লিখেছেন ভানুমতী উপন্যাস। 'প্রবাসের পত্র' নবীনচন্দ্রের পত্র-সাহিত্যের নিদর্শন। আর গদ্য রচনার মধ্যে আছে 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'র 'আভাষ' অংশটুকু। কিছু পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাকে এই আলোচনার অংশীভূত করছি না। সে প্রসঙ্গ অধ্যায়ান্তরে হবে।

নবীনচন্দ্র সেনের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা তাঁর পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত 'আমার জীবন' নামের আত্মজীবনীটি। অনেকের মতে এটি নবীনচন্দ্রের সৃষ্ট সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। প্রমথ বিশী বলেন,—"নবীন সেনের সবচেয়ে সুখপাঠ্য গ্রন্থ কাব্য নয়, পঞ্চ খণ্ডে সমাপ্ত 'আমার জীবন'।···শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ একাধারে চিত্তাকর্ষক ও চিন্তাকর্ষক। 'আমার জীবন' চিত্তাকর্ষক, তাহা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের খসড়া। এই সব কারণে তাহা বাংলা সাহিত্যের একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ এবং নবীন সেনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া আমার ধারণা।"[১] যথার্থই নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' একটি চিত্তাকর্ষক, তথ্যসমৃদ্ধ, সাহিত্য-গুণ সম্পন্ন জীবনী গ্রন্থ।

বাংলা সাহিত্যের আত্মজীবনী শাখায় আমার জীবন একটি উল্লেখযোগ্য রচনাই নয়, মনে হয়, এটি দ্বিতীয়রহিত আত্মজীবনী। বাংলাসাহিত্যে

১. চিত্রচরিত্র, প্রমথনাথ বিশী, পৃ. ৯।

আদি যুগ থেকেই, অর্থাৎ চর্যাপদ থেকে আরম্ভ করে আধুনিককাল পর্যন্ত আত্মপরিচয় দানের রীতি কবিসমাজে প্রচলিত আছে। প্রাচীন মধ্যযুগে যা ছিল ভণিতা আকারে—একালে তাই রূপ নিয়েছে স্বতন্ত্র আত্মজীবনীর। আধুনিক যুগের সূচনায় রাজা রামমোহন রায়ের ক্ষুদ্রায়তন আত্মজীবনীটি বাংলা ভাষায় রচিত না হলেও প্রথম কৃতী বাঙালীর আত্মজীবনী। অবশ্য এটি প্রকৃতই রামমোহনের রচনা কি না—এ সন্দেহ অনেকেই প্রকাশ করেছেন। সে যুগে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিদ্যাসাগর, রাজ-নারায়ণ বসু প্রমুখ অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন। নবীনচন্দ্রের অব্যবহিত পরবর্তীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' সর্বজনপরিচিত জীবনীগ্রন্থ। এ সমস্ত আত্মজীবনীর মধ্যে কয়েকটিই উৎকৃষ্ট রচনা। সাহিত্যিক মানদণ্ডে 'জীবনস্মৃতি' অতুলনীয় গ্রন্থ। এ তথ্য স্বীকার করেও বলতে হবে—নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' অনেক বিশদ, পূর্ণাঙ্গ, এবং স্বকালের একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল। শুধু তথ্যগত দিক দিয়েই নয়—সাহিত্যিক মূল্যায়নেও নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' উৎকৃষ্ট সৃষ্টি।

নবীনচন্দ্র দীর্ঘকাল ধরে পাঁচখণ্ডে 'আমার জীবন' রচনা করেছিলেন। আনুমানিক ১৮৯৩।৯৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনার কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তখন তাঁর মধ্য বয়স। সজনীকান্ত দাস নবীনচন্দ্রের রচনাবলীর প্রথম ভাগের[১] ভূমিকায় এই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। আমার মনে হয় গ্রন্থটির রচনারম্ভকাল অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতা প্রকাশের পর 'আমার জীবন' প্রথমভাগে নবীনচন্দ্র 'নৌযাত্রা' অধ্যায়ে 'রবিবাবু'র সোনার তরীর উল্লেখ করেছেন। সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ কাল ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ, বাংলা ১৩০০ সাল। অতএব অনুমানে বাধা নেই যে এরই কিছুকালের মধ্যে বা অব্যবহিত পরে 'আমার জীবন' প্রথমভাগ কবি রচনা করেছেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল ১৩১৪ বঙ্গাব্দে, ইংরেজি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী।

'আমার জীবন' দ্বিতীয়ভাগ রচনা শেষ হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। এর প্রকাশকাল ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ। ১৯০১ থেকে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'আমার জীবন' তৃতীয় ও

১. নবীনচন্দ্রের রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ।

চতুর্থ খণ্ড রচনা শেষ হল। প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ১৯১০ এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। চতুর্থভাগ 'আমার জীবন' সমাপ্ত হবার পূর্বে কবি কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। এ গ্রন্থে নবীনচন্দ্র লিখলেন—

"আমি আজ পেনসন লইয়া বঙ্গদেশের পূর্বপ্রান্তস্থিত চট্টগ্রাম জেলার পূর্বপ্রান্তে একটি পল্লীগ্রামের শান্তিছায়ায় একটি মৃন্ময়কুটীরে বসিয়া এই 'ম্যালিরিয়া মাহাত্ম্য' ও 'কলিকাতা কলঙ্ক' রচনা করিতেছি।"

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে অবসর গ্রহণ করে পুত্রের কর্মস্থল রেঙ্গুনে যান। সুতরাং পূর্বোক্ত গ্রন্থটির রচনাকাল ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের পর। পঞ্চম ভাগের রচনা-কাল ১৮ই আগষ্ট ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ। পাণ্ডুলিপিতে এই তারিখ দেওয়া আছে।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'আমার জীবন' প্রথম ভাগ প্রকাশের পরে অবশিষ্ট চারটি খণ্ড নবীনচন্দ্রের দেহাবসানের পর গ্রন্থাকারে প্রকাশ হল। পঞ্চমখণ্ড গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করল ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে।

বাংলা সাহিত্যের আত্মজীবনী শাখায় নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' একটি দুর্লভ নিদর্শন বলা চলে। গ্রন্থটি আকারে-প্রকারে যেমন বৃহত্তম, বৈচিত্র্য ও তথ্য সম্ভারের দিক থেকেও তেমনি সমৃদ্ধ। কবির জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যুর চার বৎসর পূর্বের ইতিহাস এতে স্থান পেয়েছে। বিপুল প্রসর এই আত্মজীবনীর পটভূমিকা একটি যুগ ও সমাজ। আত্মকাহিনীর অবসরে নবীনচন্দ্র সেই যুগকে, তার সামাজিক পরিবেশকে রাজনৈতিক অবস্থা ও ধর্মীয় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে যথাযথরূপে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। পর্বত-বেষ্টিতা, অরণ্যসমাকুলা চট্টগ্রামের নৈসর্গিক শোভা, পূর্বপুরুষদের ইতিহাস সমান আগ্রহে বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী বলেন, 'তৎকালীন সামাজিক দলিল হিসাবে ঐ গ্রন্থ স্মরণীয়।'[১] শুধু সামাজিক দলিল নয়, মহাকাব্যের মত বিপুলায়তন এই আত্মজীবনী বর্ণনা ও রচনাভঙ্গীতে মহাকাব্যের মত বিশাল, উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। এ প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশীরই অন্য একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।

"নবীনচন্দ্র যদি মধুসূদনকে অনুসরণ করিয়া কাব্য না লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে

১. চিত্রচরিত্র, প্রমথনাথ বিশী পৃ. ৯৬

অনুসরণ করিয়া উপন্যাস লিখিতেন হয়ত তাঁহার কীর্তি সময়ের বিচারে অনেক টেঁকসই হইত।"[১]

শ্রীসুবোধরঞ্জন রায় তাঁর নবীনচন্দ্রের কবিকৃতি গ্রন্থে উপন্যাস রচনায় নবীনচন্দ্রের ব্যর্থতা প্রমাণ করেছেন। নবীনচন্দ্রের উপন্যাস ভানুমতী প্রসঙ্গে এ মত যথার্থ সন্দেহ নেই। কিন্তু 'আমার জীবনের' আলোচনা কালে তাঁর মন্তব্য—"উহার অধিকাংশই উচ্চ রাজপদে সমাসীন ডেপুটি নবীনচন্দ্রের রাজকর্ম ও তাহার আনুষঙ্গিকের রোজনামচা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"[২] —মেনে নেওয়া চলে না। আমার জীবন রচনার সময় নিছক একটি আত্মজীবনী রচনা নবীনচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি পদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। প্রসঙ্গত কর্মজীবনের অনেক কথা এখানে এসে গেছে। এবং একটি ক্লান্তিকর 'রোজ-নামচা'য় তা পর্যবসিত হয় নি। তিনি তৎকালীন ইংরেজ শাসক ও শাসনের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। এই ইতিবৃত্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের আলোচনায় বিশেষ মূল্যবান তথ্য যোগাবে এবং এ বর্ণনা নিতান্ত 'চিত্তাকর্ষক ও চিন্তাকর্ষক'—সন্দেহ নেই।

'আমার জীবন' উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, প্রচারধর্মী সৃষ্টি নয়। কোন আদর্শ চরিত্র সৃষ্টির বাসনা তাঁর তখন ছিল না। কোন দার্শনিক, নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয় মতবাদের প্রাচীরে তাঁর সৃজনীশক্তি বাধা পায় নি। সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য কোন বিশেষ রূপনির্মিতির জন্য ব্যস্ত হতে হয় নি। অতি স্বচ্ছন্দে, সহজ গতিতে, ভারমুক্ত হয়ে এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এটি নবীনচন্দ্রের একটি যথার্থ সাহিত্য-সৃষ্টিরূপে সম্মানিত। এই গ্রন্থটিই নবীনচন্দ্র রচিত একটি উপন্যাসের নিদর্শন হতে পারে।

"এই বইখানি সেন মহাশয়ের জীবনচরিত হলেও একখানি নভেল বিশেষ। আর সেন মহাশয় হচ্ছেন এ নভেলের একমাত্র নায়ক।"[৩]

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতা কেশবচন্দ্রের প্রভাব প্রতিপত্তি, লালবিহারী দে ও কেশবচন্দ্রের মতবিরোধ, ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্বিরোধ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রসমাজ, শশধর-পন্থী হিন্দুধর্মান্দোলন,

১. কাব্যবিতান— ভূমিকায় লিখিত, পৃ. ছ

২. নবীনচন্দ্রের কবিকৃতি, সুবোধরঞ্জন রায়, পৃ. ২৮১

৩. আত্মকথা, প্রমথ চৌধুরী, পৃ. ভূমিকা ৸৹

কংগ্রেসের দলাদলি, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বিনয়কৃষ্ণ দেবের মনোমালিন্য এবং চট্টগ্রামের চা-বাগানের মোকদ্দমার নিখুঁত বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন নবীনচন্দ্র তাঁর আমার জীবন গ্রন্থে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ সরকার, কৃষ্ণদাস পাল, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হেমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সেকালের মনীষীদের সম্পর্কে বহু নূতন তথ্য এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। অথচ 'আমার জীবন' তথ্যভারাক্রান্ত নীরস রচনায় পর্যবসিত হয় নি। বাস্তব রস, পরিহাস সরস বাগ্‌ভঙ্গী পুস্তকটিকে সুখপাঠ্য, হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। স্ব-জীবন ও সমসাময়িক সমাজজীবনকে এত বাস্তব প্রাণচঞ্চলরূপে চিত্রায়িত করেছেন, যা বিস্ময়কর।

গদ্য রচনারীতিতে নবীনচন্দ্রের পারদর্শিতা ও নৈপুণ্য বঙ্কিমচন্দ্রের কথা স্মরণ করায় কখনও কখনও। এক এক জায়গায় লেখক সমসাময়িক সমাজের অসঙ্গতি, অশিক্ষা, কুসংস্কারের ছবি এঁকেছেন ও অনাবিল হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। নবীনচন্দ্রের পরিহাস নিপুণতার পরিচয়াত্মক কিছু অংশ 'আমার জীবন' থেকে উদ্ধৃত হল। –

"শেষে অনেক শিষ্টাচারবহির্ভূত বাগ্‌বিতণ্ডার পর একটা বেতন স্থির হইলে তিনি বলিলেন—'কিন্তু আমার পোলারে তিনটা কথা শিখাইতে পারিবে না।'

১। আমাদের দেবদেবী-মূর্তিগুলি মাটি ও খড়ের পুতুল। ২। আমি মরিয়া গেলে 'মরা গরু আর ঘাস খায় না' বলিয়া আমার শ্রাদ্ধ না করা। ৩। আর আমার পূর্বপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছে পৃথিবী তিনকুণে, তুমি গোল বলিয়া শিক্ষা দিবা না। তুমি এই তিন কথা যদি স্বীকার কর, তবে তোমাকে রাখিব।" শিক্ষক তাহাই করিলেন। শিক্ষক যদিও ছাত্রকে নিয়মিতরূপে ভূগোল শিক্ষা দিতেছিলেন, কিন্তু তাহার পিতা পূর্বোক্ত তিন বিষয়ে প্রশ্ন করিলে কিরূপ সদুত্তর দিতে হইবে, তাহা তালিম দিয়া রাখিয়াছিলেন। জমিদার মহাশয় মধ্যে মধ্যে তাহার পরীক্ষা লইতেন।—

প্র। কহ দিনি আমাদের দেবদেবীগুলিন কি ?

উ। দেব দেবী মাটি খড় নহে।

প্র। মরা গরু ঘাস খায় কি না ?

উ। খায়।

প্র। পৃথিবী কিরূপ?

উ। তিনকুণে।[১]

স্রষ্টারূপেই নয় দ্রষ্টারূপেও নবীনচন্দ্রের বহুমুখী বিচিত্রতা তাঁর আত্মজীবনীতে প্রকাশমান। বহুস্থলে স্নিগ্ধ সরস জীবনচিত্র রচনা করেছেন যা তাঁর রসদৃষ্টির পরিচয়বাহী।

"আম্রকাননের অনতিদূরে গ্রাম। গ্রামে গৃহের উপর গৃহ, তাহার উপর গৃহ। গৃহাবলী মৃন্ময়; পুরু খাপরা ও খড়। দেখিতে অতি কদর্য। গ্রামের প্রান্তভাগে জমিদারের ইষ্টকালয়। তাহার সম্মুখ দিক মাত্র-ইষ্টক, পশ্চাৎভাগ কর্দম-নির্মিত। দীনকুঠীরমালার পার্শ্বে এই অট্টালিকা এক অপূর্ব তুলনা-ব্যঞ্জক। দরিদ্রতার মধ্যে যেন কি এক ঐশ্বর্য্যের গর্ব! যেখানে জমিদারের 'মোকামে'র অভাব, অর্থাৎ স্থানীয় জমিদার নাই, সেখানে সামান্ত একটুক প্রাঙ্গণযুক্ত জমিদারের কাচারি আছে, গ্রামের কোনও স্থানে একটি ইষ্টক-নির্মিত 'ইঁদারা' এবং তাহার পার্শ্বে একটি বিশাল-ছায় পিপ্পলতরু। গ্রামখানি একটি ক্ষুদ্রজগৎ। ইহাতে গ্রামখানির প্রয়োজনীয় সকলই আছে। সূত্রধর আছে, কর্মকার আছে, চর্মকার আছে, ধোপা, নাপিত, কুমার, কাচারিতে জল তুলিবার কাঁধু এবং 'চামাইন' (ধাত্রী) পর্যন্ত আছে। এমন কি, প্রত্যেক গ্রামে এক একটি 'ডাইন' (ডাকিনী) পর্যন্ত আছে। কাহারও ছেলে মারা গেলে তাহারই কার্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয় ও তজ্জন্য তাহাকে সময়ে সময়ে বড়ই লাঞ্ছিত হইতে হয়।"[২]

নবীনচন্দ্রের সহানুভূতির স্পর্শে বিহারী গ্রাম জীবনরস-সমৃদ্ধ ও মধুর হয়ে উঠেছে। এভাবেই শান্তিপুরের রাস, ঘোষপাড়ার মেলা, ফুলিয়ার মেলা, সাহিত্যতীর্থ ফুলিয়া, হালিশহর, হরিদাসের পাট ও কাঁচড়াপাড়ায় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পৈতৃক ভিটার ভগ্নাবশেষের বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খ, নিখুঁত এবং উপভোগ্য রকমের সজীব।

ইতিহাস-আলোচনায় নবীনচন্দ্রের একটি স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল। তুলনামূলক ধর্মালোচনাও ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। যখনই নবীনচন্দ্র কোন

১. আমার জীবন, নবীনচন্দ্র রচনাবলী ১।২৭০

২. ঐ. ঐ পৃ. ১।৩০৮-৩০৯

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বা পুরাণে উল্লিখিত স্থানে গমন করেছেন, সেখানকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণই তিনি লিপিবদ্ধ করেন নি, অতীত-বর্তমান মিলিয়ে তার অখণ্ড একটি স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন। অতীতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে বর্তমানের পথ নির্দেশ দিয়েছেন। আত্মজীবনীর এই সব অংশগুলি অধিকাংশ সময়ই পাঠকের কাছে মনোহর ও মূল্যবান মনে হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের তুলনামূলক আলোচনা যুক্তিবিচারে সব পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য—সর্বত্র না মনে হলেও, চিন্তা উদ্রেককারী বহু তথ্য এতে সন্নিবেশিত। শ্রীক্ষেত্র, বিহার, রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, নালন্দা, মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগের বর্ণনাপ্রসঙ্গে এবং অন্যত্রও তিনি গভীর ঐতিহাসিক অনোচিত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। ভাবুক কবির মানস-সান্নিধ্যে সেই দূরগত ইতিহাস পাঠকের কাছে অত্যন্ত জীবননিষ্ঠ, মনোরম, বর্তমানবৎ প্রত্যক্ষ মনে হয়। নবীনচন্দ্রের আপন অভিজ্ঞতার স্পর্শে এই সব নীরস বর্ণনাংশও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

গ্রন্থটি ব্যক্তিবিশেষের আত্মজীবন-কাহিনী রচনার উদ্দেশ্যে লেখা হলেও একটি বিস্তৃত ভূখণ্ডের, একটি জাতির, একটি যুগের ইতিহাস রূপে গণ্য হবার যোগ্য। এই মহাকাব্যিক বিস্তৃতির জন্যে 'আমার জীবন' অনন্যসাধারণ মর্যাদার দাবীদার।

সমালোচকের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে 'আমার জীবন'-এর দোষত্রুটি গোপন থাকে নি। সমালোচকের মতে "দন্তবর্ম-পরিহিত 'ডেপুটি'র অবতারণায় প্রথমভাগ ব্যতীত আমার জীবনের অপরাপর খণ্ডগুলি সুখপাঠ্য হয়নি। অস্বীকার করা যায় না যে নবীনচন্দ্রের আত্মজীবনীতে বহুসময়েই 'আমি'র প্রকট আত্মপ্রকাশ পীড়াদায়ক। সুখেদুঃখে বিহ্বল, আবেগপ্রবণ কবিচিত্ত আত্মসম্পর্কিত বিষয়ে বালকের মত দ্বিধাহীনভাবে ও উৎফুল্লচিত্তে রূপগুণ, নামযশ, বিত্তবৈভবের উল্লেখ করেছে। বহুক্ষেত্রে তাঁর কবিত্বের, উচ্চরাজ-কর্মপদপ্রাপ্তির অহংকার বিনয়ের ছদ্মবেশে প্রকাশিত। কখনও বা বিনয়েরই অহংকার।

"তখন শিশিরবাবু বলিলেন,-নবীন! তোমার মুখে মাইকেল, বঙ্কিম, হেম, রবি, সকলেরই প্রশংসা শুনি। অথচ তুমিও একজন তাহাদের সমকক্ষ কবি। তুমি কেমন করিয়া এরূপ বিনয় শিক্ষা করিলে, এবং হৃদয় এরূপ

অভিমানহীন করিলে, তাহা বলিতে পার কি? তোমার পায়ের ধূলা লইতে ইচ্ছা করে।" আমি বলিলাম—"না দাদা। আমি তোমার একটি পায়ের ধূলার তুল্যও নহি। আমি বোধ হয়, সম্পূর্ণরূপে অভিমানের মোহ হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই।" ...এজাতীয় বহু অংশ আমার জীবন থেকে উদ্ধৃত করা যায়।

নবীনচন্দ্র কেবলমাত্র আত্মগুণ কীর্তনই করেন নি। আত্মদোষের অকপট উল্লেখ আমাদের বিস্মিত করে। লেখক অসঙ্কোচে আপনার পানাসক্তির কথা বা বাইনাচের আসরে হাজিরা দেবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এজাতীয় অকপট স্বীকারোক্তি আত্মজীবনীতে দুর্লভ। একদা বন্ধুদের প্ররোচনায় পতিতালয়েও গমন করেছিলেন—তাঁর 'আমার জীবনে'ই এ তথ্য পাই। গান্ধীজীর আত্মজীবনীর সঙ্গে এবিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মহাত্মার আত্মজীবনীতে নিজের দোষগুণ এমনিই স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত।

নবীনচন্দ্রের মুক্তকণ্ঠে আত্মদোষকথন অভিনব ঘটনা। অবশ্য দোষও গুণের মত ব্যাখ্যাত কখনও কখনও। মদ্যপান প্রসঙ্গে যেমন লেখক আপন অপরিমিত মদ্যপান করেও নির্বিকার থাকার গৌরব জ্ঞাপন করেছেন, তেমনি পতিতালয়ে গমন করেছেন পতিতা-উদ্ধারের জন্যেই। আত্মপ্রশংসার দুর্বলতা স্বীকার্য হলেও সত্যভাষণের সংসাহস প্রশংসনীয় এবং বাংলা আত্মজীবনী-শাখায় দুর্লভ। লেখক অনায়াসে লিখলেন..."তখন আমি একটা গ্লাস ঠুকিয়া, বেশ একটু উত্তেজনা লাভ করিয়া, তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলাম।" এজাতীয় স্বীকারোক্তি কোথাও পাওয়া যায় না। নবীনচন্দ্র নিজের সম্বন্ধে সব কথাই বলেছেন দ্বিধামুক্ত হয়ে—এটাই তাঁর অসাধারণত্ব। নানারকম ভান-ভণ্ডামির মধ্যে থেকে, এত সত্যভাষণ যদি কারো কাছে দুষ্পাচ্য মনে হয়, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

বাংলাসাহিত্যে অনাবিল হাস্যরসের অবতারণার জন্যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে অভিনন্দিত করেছেন। মাঝে মাঝে নবীনচন্দ্রের গদ্যরচনার ভাষা ও ভঙ্গী যেমন বঙ্কিম-প্রভাবিত, তেমনি স্বচ্ছ, সহজ পরিহাসেও কখনও কখনও বঙ্কিমের অনুস্মৃতি লক্ষ্য করি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নবীনচন্দ্রের কাব্যরচনা 'রীতি'র মত তাঁর গদ্যশৈলীও একান্তই তাঁর নিজস্ব। সহজ, সাবলীল, প্রবহমান বর্ণনা ও ভাষা নবীনচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। পূর্বজ লেখক এবং

বাংলা লেখক সম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্যে-অলক্ষ্যে সকলের ওপরেই দৃষ্ট হয়। নবীনচন্দ্রের রচনায় তার বেশী কিছু অনুকরণ প্রচেষ্টা দেখি না। এবং রসিকতাবোধও কোন ব্যক্তির স্বভাবগতই, হতে পারে, অনুকরণের সাহায্যে পরিহাসচেষ্টা বড়ই মর্মান্তিক। পরিহাসপ্রিয়তা নবীনচন্দ্রের সহজাত গুণ ছিল। যখন গুরুগম্ভীর বিষয়ে কাব্যসৃষ্টি করেছেন, তখনও হাসির বন্যায় নিজে ভেসে গিয়ে অপরকেও ভাসাতে চেয়েছেন। রঙ্গমতী, কাব্যত্রয়ীতে এর প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। তবু অনেক সময় নবীনচন্দ্রের রসিকতা যে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিহাস-রসসমৃদ্ধ রচনার কথা স্মরণ করায় তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন -"তিনি সেখানকার সেটেল্‌মেণ্টের ডেপুটি কলেক্টর। অন্যজন আকৃতি ও প্রকৃতিতে সেখানকার কলেক্টর সাহেবের 'জলধর মন্ত্রী' ও 'মালিনী মাসী'। তিনি লেখাপড়া কিছুই জানেন না বলিলেও চলে। তিনি তাঁহার স্ত্রীর প্রশংসা করিতে গিয়া বলিতেন 'My wife is a man'—আমার স্ত্রী একটা পুরুষ। তিনি জানিতেন—man অর্থে মানুষ।'

আবার --

"ধন্য রূপচাঁদ! তোমার মাহাত্ম্য ধন্য! তুমিই—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীরূপচাঁদে নমঃ ॥"

তুমিই অখণ্ডমণ্ডলাকার। তুমিই একমেবাদ্বিতীয়ং। তুমি থাকিলে সব থাকে, অতএব তুমি সৎ। তুমি না থাকিলেই এ সংসারে চিৎ, এবং বাক্সে বিরাজ করিলেই আনন্দ। অতএব তুমিই সচ্চিদানন্দ।"

উপরের অংশটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্যের ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুলের কথা স্মরণ হয়। "মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতা বিশেষ। ··· যে এই দেবীর পুরোহিত, অথবা যাহার গৃহে ইনি অধিষ্ঠান করেন, সেই ব্যক্তি মনুষ্য মধ্যে প্রধান হয়। অন্য মনুষ্যেরা সর্বদাই তাহার নিকট যুক্ত করে স্তবস্তুতি করিতে থাকে।"

ব্যঙ্গবিদ্রূপের কশাঘাতে নবীনচন্দ্রের যেমন পটুত্ব ছিল, তেমনি সাধারণ কথাবার্তায়, বর্ণনায় জ্বালাহীন হাস্যের দীপ্তি এবং মনোরম, স্বচ্ছ, সরস বাগ্‌ভঙ্গী তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন—"তাহার সেই দীর্ঘ শ্মশ্রু ও ঘর্মাবৃত কৃষ্ণাঙ্গ। সে

যে জন্মাবধি 'আপোনারায়ণে'র কৃপালাভ করিয়াছিল, এমন বোধ হইল না।" আমার জীবন গ্রন্থে অজস্র এজাতীয় উদ্ধৃতি সংগ্রহ করা যায়।

'আমার জীবন' নবীনচন্দ্রের সমসাময়িক যুগে বিশেষ সমাদৃত হয় নি। যেখানে তাঁর কাব্যগ্রন্থের অসাধারণ সমাদর ও সম্বর্ধনা, সেখানে এই অনন্য-সাধারণ গদ্য গ্রন্থটির প্রতি এই নীরব ঔদাসীন্য কেন? এর কারণ—প্রধানত কবির আত্মশ্লাঘা। দ্বিতীয়ত, তিনি বিনাদ্বিধায় আপন বন্ধু ও পরিজনদের নিন্দা করেছেন, আঘাত করেছেন। বৃহৎ এক জনসমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। অথচ কোন সংকোচ না রেখেই নবীনচন্দ্র তাদের দোষত্রুটি উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন। যুক্তি-পারম্পর্য যতদূর সম্ভব রক্ষা করেই এ কর্মটি হয়েছিল। নবীনচন্দ্রের আপন যুগ ও যুক্তিসঙ্গত কারণেই গ্রন্থটির প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করল।

পরবর্তীকালে সমস্ত অবহেলার ক্ষতিপূরণ হল। প্রমথ চৌধুরী গ্রন্থটিকে স্বীকৃতি দিলেন। প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ সমালোচক শিরোপা দিলেন নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের। 'আমার জীবন' নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ চিত্তাকর্ষক ও চিন্তাকর্ষক গ্রন্থ।

প্রবাসের পত্র

নবীনচন্দ্রের প্রবাসের পত্র ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। স্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত এই পত্রসম্ভার প্রথমে 'সাহিত্য' পত্রিকায় ও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র শুধু কবিই নন, গদ্যেও সুলেখক। সুতরাং তাঁর পত্র রচনায় কবির আপন পরিচয়টি খুঁজে নেওয়া যায়।

পত্র-সাহিত্যের সঙ্গে সাধারণ সাহিত্যের পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—সাধারণ সাহিত্যকে টানে বিরাট পাঠককেন্দ্র, চালায় দূরদেশ দূর-কালের পথে ব্যক্তিগত জীবনের সীমা ছাড়িয়ে। আর চিঠির সাহিত্যে ধরা দেয় লেখকের কাছে-ঘেঁষা জাতের দৈনিক ছায়া প্রতিচ্ছায়া, ধ্বনি প্রতিধ্বনি, তার ক্ষণিক হাতিয়ার মর্জি, আর আলাপ প্রতিলাপ।

নবীনচন্দ্র যখন কাব্যরচনা করেছিলেন নানা চিন্তা, মতবাদ, অভিপ্রায় তাঁকে পরিচালিত, সজাগ, সন্ত্রস্ত করেছিল। দেশভ্রমণ উপলক্ষে যখন স্ত্রীর উদ্দেশে পত্রগুলি রচিত হল, তখন 'ভরতি মনের অবস্থায় জরুরী কথাকে

ছাপিয়েও যে মুখরতা উদ্বৃত্ত' ছিল হল তারই প্রকাশ। আর যে-ভারহীন সহজের রস—চিঠির রস, তারই উপস্থিতি ঘরোয়া চিঠিগুলিকে উন্নীত করল সাহিত্যের পর্যায়ে। নর্মদা নদী দেখে নবীনচন্দ্র স্ত্রীকে পত্রমারফৎ সেই সৌন্দর্য সম্ভোগের অংশীদার করেছেন।

"উভয় পার্শ্বে শ্বেত শৈল শ্রেণী, তাহাদের পাদমূল প্রক্ষালন করিয়া প্রস্তর-গর্ভা নর্মদা প্রবাহিতা। দেখিলেই মেঘদূতের সেই কবিত্বপূর্ণ চরণটি মনে পড়ে। রেবাং দ্রক্ষস্যুপল বিষমে বিন্ধ্যপাদ বিশীর্ণাম্। অর্থ—বিষম উপলমাঝে বিন্ধ্যপদে শীর্ণ রেখা করিও দর্শন। নর্মদা যেন অবিরাম শ্বেতকুন্দ কুসুমরাশি বর্ষণ করিয়া বিন্ধ্যপাদপূজা করিতেছেন।"

প্রবাসের পত্রে ভারতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, পুরাণ-খ্যাত স্থানগুলি দর্শন করে তারই স্মৃতিসুধা কবি সঞ্চয় করেছেন পত্রের কোষে কোষে। চিঠির ভাষা নবীনচন্দ্রের চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কখনও কাব্যময়, কখনও কৌতুকরসে উচ্ছল। কখনও বা গভীর বেদনাময়। পুষ্কর তীর্থ প্রসঙ্গে এক রকম। আবার ধ্রুবঘাট ও সীতার স্মৃতি-বিজড়িত সরযূনদীর ঘাট দেখে যে স্মৃতির উচ্ছ্বাস তা অন্যরকম। "তাহার পর, ধ্রুবঘাট দেখিতে যাই। প্রবাদ এখানে ধ্রুব তপস্যা করিয়াছিলেন। ...শেষ যে ঘাটে লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা জানকীকে বনবাসে রাখিয়া চলিয়া যান, যেখানে মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহাকে পাইয়া আশ্রমে লইয়া যান, সেই ঘাট দেখি। স্থানটি দেখিবা মাত্র—যদিও দেখিবার কিছুই নাই, একটি সামান্য ঘটনামাত্র—স্মৃতির উচ্ছ্বাসে আমার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠে।"

ভারতপথিক নবীনচন্দ্রের এই ভারত-দর্শনের অংশীদার হয় পাঠক-সমাজও। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে আশ্চর্যজনক এক মমতা লেখকের ছিল পত্রগুলির ভেতরে তারই প্রকাশ হয়েছে। আবেগ-উষ্ণ বর্ণনা ও ভাষা ব্যক্তিগত পত্রগুলিকে সর্বজনীন রসের আধার ও সুখপাঠ্য এক বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

বীরভূমি চিতোরের প্রসঙ্গে কবির পরিমিত রসিকতাবোধ হাস্যের দ্যোতনায় প্রকট করেছে বেদনাকেই। "শুনিলাম যে, এই অল্পটুকু পথে এত ভেড়িয়া নেকড়ে বাঘ যে, গলায় কামড়াইয়া তো ধরেই, তাহা ছাড়া ছোড়তা ভি নেহি। কেহ প্রাণান্তে যাইতে স্বীকার করিল না।

ইহাতেই তুমি বুঝিতে পারিবে কি বীরভূমি, কি অরণ্য কাপুরুষের বাসভূমি হইয়াছে।"

কখনও লেগেছে গভীর চিন্তার স্পর্শ। "সলিলস্বরূপা গঙ্গাদেবীর শক্তি আমাদের পুণ্যশ্লোক পূর্বপুরুষেরা বুঝিয়াছিলেন, তাই সলিল-শক্তির পূজা প্রচলিত করিয়াছিলেন। তাই বলিয়াছেন তাঁহার শক্তিপ্রভাবে ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা সে শক্তি কার্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। মাতার প্রকৃত পূজা আমরা শিখিলাম না। গীতার কর্মবাদ ঘুচিয়া দেশে বেদান্ত-দর্শনের মায়াবাদ আসিল। সংসার কিছু নহে, মায়া মাত্র। জীবন কিছুই নহে, নলিনী-দলগত জলমাত্র। পড়িয়া গেলেই ভাল।"

প্রবাসের পত্র সমকালীন এবং পরবর্তী সাহিত্য-রসিকসমাজে আদৃত হয়েছে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল সংখ্যা Calcutta Review-এর সমালোচনায় পাই—"Prabaser Patra is in its own way a highly interesting production in which the entertaining Prose of a Traveller's Story is sweetly blended with the enlivening poetry of the outpouring of a feeling heart and the flight of a fervid imagination." অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস গ্রন্থের ভূমিকায় প্রবাসের পত্রের ভাষার পরিচ্ছন্নতা ও মনোভাবের আন্তরিকতার প্রশংসা করেছেন।

নবীনচন্দ্রের বিভিন্ন পথগামী সাহিত্যিক প্রচেষ্টার নিদর্শনরূপে নয়, স্নিগ্ধ সরস পত্রসাহিত্যের নিদর্শনরূপে প্রবাসের পত্রের একটি বিশেষ স্থান আছে বাংলা-সাহিত্যের দরবারে।

ভানুমতী

রঙ্গমতী কাব্য প্রণয়নকালে নবীনচন্দ্র ইংরাজি পিরীতের ছায়া ছেড়ে রামায়ণ-মহাভারতের শিক্ষা এবং আমাদের জাতিগত লক্ষণ নিয়ে এক উপন্যাস সৃষ্টির জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে নবীনচন্দ্রের মত—"বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলি ইউরোপীয়

উপন্যাস হিসাবে উৎকৃষ্ট উপন্যাস। ভারতীয় সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট সাহিত্য নহে।"[১] নবীনচন্দ্রের মনে ভারতীয় সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে একটি বিশেষ ধারণা গড়ে উঠেছিল। সে আদর্শ কলাকৈবল্যবাদী—Art for Art's sake-এর আদর্শের অনুকূল ছিল না। উৎকৃষ্ট সাহিত্য ব্যক্তি ও জাতিকে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও উন্নতির পথে প্রেরণ করবে। রহস্যময় মানবহৃদয় মানব-জীবনকে টেনে নিয়ে চলে কোন যন্ত্রণা-বেদনা-মৃত্যুর পাতাল-লোকে। তার কথা বলে তারই ব্যাখ্যান-বর্ণনায় সেই মৃত্যুলোকে পাঠককে প্রেরণ করা ভারতীয় সাহিত্যের আদর্শানুগ নয়। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রকে নবীনচন্দ্র উপরোক্ত অনুরোধ করেছিলেন।

নবীনচন্দ্র নিজে এই উদ্দেশ্যে ভানুমতী নামে গদ্যে-পদ্যে মিশ্রমাধ্যমে উপন্যাস রচনা করলেন। ভারতীয় আদর্শ রক্ষা হল, কিন্তু গ্রন্থটি উপন্যাসরূপে স্বীকৃতি পেল না।

নবীনচন্দ্র 'একটি বালিকার আবদারে' এক সপ্তাহের মধ্যে রচনা করেছিলেন ভানুমতী উপন্যাস। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রচনার কাজ শেষ হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয়েছিল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। নবীনচন্দ্রের তুলনামূলক ধর্মালোচনা ও নিসর্গবর্ণনা গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ হলেও উপন্যাসরূপে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। ভানুমতী ও অনাথনাথের কাহিনী এতে আছে। বাস্তব-জীবন থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টাও দেখা যায়। সাইক্লোন, মহামারীর দৃশ্য এবং মোহান্তের অত্যাচার প্রভৃতি বর্ণনায় নবীনচন্দ্র নিজের অভিজ্ঞতার শরণাপন্ন হয়েছেন। তবু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের প্রেরণা কাহিনীটিকে সংবদ্ধ, সাবলীল সৃষ্টি হবার পথে বাধা দিয়েছে। 'ভানুমতী' নবীনচন্দ্রের একটি ব্যর্থ রচনা—কারণ বোধ হয় উদ্দেশ্যমূলকতা। এর মধ্যে বাঙ্গালী পাঠক উৎকৃষ্ট উপন্যাসের রস গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। 'ভানুমতী' নিতান্তই একঘরে হয়ে থাকল। সমকালীন যুগে ভানুমতী বাঙ্গালী সাহিত্যরসিক সমাজে কিছুমাত্র আলোড়ন আনল না। অসম্বদ্ধ, অকিঞ্চিৎকর কাহিনী, কয়েকটি সৎ-অসৎ মানুষের মোটা তুলিতে আঁকা চিত্র যা কোনমতেই 'চরিত্র' হয়ে ওঠেনি—তাই সম্বল করে নবীনচন্দ্র যে উপন্যাস রচনা করলেন, সুরেশচন্দ্র

১ আমার জীবন, নবীনচন্দ্র রচনাবলী ৩।৭০

সমাজপতির মতে তা হল –"বালিকার পাঠ-উপযোগী সরলভাষায় একটা সরল গ্রন্থ বিশেষ।" হিন্দু দর্শনের জটিল আলোচনায় জন্য বালিকার পাঠ-উপযোগিতাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বিদেশী একজন পাঠক ভানুমতীর প্রশংসা করেছিলেন। 'আমার জীবন' পঞ্চমভাগে নবীনচন্দ্র সে দীর্ঘ পত্রখানি উদ্ধৃতি করেছেন।

সমুদ্র-পর্বত-অরণ্যের নিসর্গ সৌন্দর্যের বর্ণনায় ভানুমতীর স্রষ্টা একদা Swinburne এবং Scott-এর সঙ্গে একই সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন, বিদেশী সাহিত্য-সমালোচকের বিচারে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনায় প্রকৃতির দুলাল গীতিকবি নবীনচন্দ্রের এক সহজাত স্ফূর্তি ছিল। ভানুমতী গ্রন্থেও সেই নৈসর্গিক সৌন্দর্যের রসোদ্গার দৃষ্ট হয়।

—"শরৎকাল। প্রকৃতির লীলাভূমি চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল প্রাতঃ সূর্যের মৃদুল কিরণে হাসিতেছিল, পশ্চিমে অনন্ত সাগরের নীলাম্বুরাশি, পূর্বে বৃক্ষপল্লব সমাচ্ছন্ন শ্যামল পর্বতমালা। উভয়ের মধ্যে নাতিবিস্তৃত হরিৎ শস্যক্ষেত্র খচিত তটভূমি।"

সপ্তম অধ্যায়

নবীনচন্দ্রের সাহিত্য ও সাধনা

'কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক'—কুরুক্ষেত্র কাব্যের ভীষ্মের এই উক্তি সমস্ত যুগের কবি ও সাহিত্যিকদের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য। যথার্থ কবি একদিকে আপন দেশ ও কালের স্বাক্ষর বহন করেন, অন্যদিকে দেশ ও কালাতিশয়তার মানদণ্ডেই তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়ন হয়ে থাকে। নবীনচন্দ্র ছিলেন সে যুগের একজন প্রতিনিধি স্থানীয় কবি। এক বিশেষ যুগের, বৃহত্তর এক সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তাধারা, প্রবণতা তাঁর কাব্যে প্রকাশিত। জাতির প্রধান সমস্যা ও সমাধানের উপায় সন্ধানের ব্যাকুলতা তাঁর কাব্যে পরিদৃষ্ট হয়। এখানে তিনি কালের সাক্ষী। আবার যেখানে নবীন কবি আপন যুগকে অতিক্রম করে ভবিষ্যৎ যুগজীবনকে, ভবিষ্যৎ লক্ষ্যকে আভাসিত করেছেন সেখানে তিনি কালজয়ী, কালের শিক্ষক। বাংলা সাহিত্যে নবীনচন্দ্রের যথার্থ স্থান নির্দেশের জন্যে কালের সাক্ষী ও কালের শিক্ষকরূপে নবীনচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ বিচার্য।

মহাকাব্যধারার, বা বীরযুগের কনিষ্ঠ কবিরূপে বাংলা সাহিত্যে নবীনচন্দ্রের পরিচয়। রঙ্গলাল-মধুসূদন প্রবর্তিত আখ্যায়িকা এবং মহাকাব্যধারার অনুবর্তনেই তাঁর কবি-খ্যাতির প্রতিষ্ঠা। নবীনচন্দ্রের প্রভাস কাব্য প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা কাব্যে একটি যুগের অবসান হল। অবশ্য অন্যধারা অর্থাৎ আধুনিক গীতিকবিতার সুপ্রতিষ্ঠা ঘটে গেছে এর পূর্বেই। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দেখি, 'নবীনতম' কবি রবীন্দ্রনাথ যশস্বী, কীর্তিমান, অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারীরূপে পাঠক সমাজে স্বীকৃত।

নবীনচন্দ্র যে যুগে কাব্যরচনা করেছিলেন, সে যুগের প্রধান কবি মধুসূদন। পরবর্তী যুগটি রবীন্দ্রযুগ নামে খ্যাত—যার পথিকৃৎ ছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী—এটি গীতিকাব্যের যুগ। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের বাংলা সাহিত্যের অবস্থা বর্ণনা করে যে সংস্কৃত কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন,

নবীনচন্দ্রের কাল নির্দেশেও এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও সেটি খুবই সুপ্রযুক্ত হবে, মনে হয়।—

যত্যেকতোস্তশিখরং পতিরোষধীনাং
আবিষ্কৃতারুণ পুরঃসর একতোর্কঃ ॥

"একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন, অপরদিকে অরুণকে অগ্রসর করিয়া দিবাকর দেখা দিতেছেন।" মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ—এই দুই চন্দ্র-সূর্যের অস্ত-উদয় কালে বাংলা সাহিত্যের এক সন্ধিক্ষণে নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব। এখানে আমরা নবীনচন্দ্রের প্রতিভাকে শুকতারার স্নিগ্ধ দীপ্তির সঙ্গে তুলনা করতে পারি। তাঁর তিরোধানে এক অধ্যায়ের অবসান এবং তারই সমকালে নবপ্রভাতের সূচনা।

কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন মধুসূদন ও ররীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী, চিন্তাধারার ক্ষেত্রে—জাতীয়তাবোধ ও ধর্মসমন্বয়ের ক্ষেত্রে তিনি রামমোহন, কেশবচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর যুগের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন। সমগ্র নবযুগের পটভূমিতে স্থাপন করেই তাঁর সাহিত্য ও সাধনার মূল্য নিরূপণ ও গুরুত্ব সম্বন্ধে ধারণা সম্ভব হবে। তখনই হবে তাঁর কাব্যের মূল্য বিচার। অন্যথায় কাব্যকলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে এবং রসতাত্ত্বিক ত্রুটি-বিচ্যুতির হিসাব-নিকাশের প্রাধান্যে তাঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হতে পারেন, এমন আশঙ্কা স্বাভাবিক। প্রসঙ্গত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। -

"এই যুগের কবিদের কাব্যসাধনাকে ঠিক রসসাধনা বলা যায় না, ইহা জাতীয় আদর্শের সাধনা। যে শক্তি জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে নবযুগের বীজ বপন করিয়াছে, সেই শক্তিই ভাবের ক্ষেত্রেও ঠিক একই কাজ করিয়াছে। জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে যে শক্তি প্রত্যক্ষ ভাবের ক্ষেত্রে সেই শক্তি প্রচ্ছন্ন, এই যুগের কর্মযোগীদেরই পরিপূরক অংশ। সুতরাং কেবলমাত্র রসের মানদণ্ডে নয়, যুগ-পরিবেশের সহিত মিলাইয়া লইয়া এই কাব্যপর্বের গুরুত্ব ও মূল্যবিচার করিতে হইবে।"[১]

মধুসূদনের উত্তরসাধক, বঙ্কিমচন্দ্র-হেমচন্দ্র-বিহারীলালের সমকালীন

১. আধুনিক বাংলা কাব্য, তারাপদ মুখোপাধ্যায় ; ভূমিকা. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ।

এই কবির সাহিত্য বিচারে পূর্বোক্ত বিষয়ে সচেতন থেকে তাঁর যথার্থ স্থান নির্ণয় সম্ভব সাহিত্যের দিক থেকে বিগত যুগের বৈশিষ্ট্য ও আগামী যুগের ইঙ্গিত তাঁর কাব্যে যেমন পরিস্ফুট, নবযুগের অর্থাৎ কবির স্ব-কালের ভাব ও ভাবনার বিবর্তনের ইতিহাসেও তাঁর একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। এখানেই তাঁর কাব্যের যথার্থ মূল্যায়ন।

নবীনচন্দ্র ও সমকালীন যুগ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে যুগ Neo-Classical age রূপে চিহ্নিত নবীনচন্দ্র সেই চিরায়ত কবিদের অন্যতম। রঙ্গলালের প্রবর্তিত ঐতিহাসিক রোমান্টিক আখ্যায়িকা কাব্য এবং মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক অজ্ঞাতপূর্ব অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। ভারতীয় পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকায়, প্রতীচ্য কাব্যাঙ্গিকের আশ্রয়ে নবচেতনা প্রবুদ্ধ জাতির আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে। এখানে আধুনিকতার নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা হল। নব আদর্শ ও নূতন প্রেরণা সাহিত্য সংস্কৃতিতে, সমাজ-ধর্মে নবমূল্যমানের প্রয়োগে আধুনিক যুগকে প্রতিষ্ঠিত করল—মধ্যযুগকে বিদায় দিয়ে। মধুসূদন-সাহিত্যে দেখি জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী এখন আমূল পরিবর্তিত। পাপ-পুণ্য, দুঃখ-সুখ, প্রেয় ও শ্রেয়োবোধের ধারণা পূর্ববর্তী যুগ থেকে কত পৃথক! অতীতের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে নূতন বর্তমান ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জাতির সংঘবদ্ধতার কারণ হল। এ যুগের আধুনিকতম কবি মধুসূদনের সৃষ্টিতে যুগমানসের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে।

বাংলা কাব্যের এই বিশেষ পর্বের শেষ কবি নবীনচন্দ্রের পরিচয়—"তিনি মধুসূদনের নিকট হইতে মহাকাব্যের বিরাট আঙ্গিক ও পরিকল্পনা ও হিন্দুধর্মের গূঢ়ত্ব উদ্‌ঘাটন রূপ রচনাশৈলী ও বিষয় নির্বাচন গ্রহণ করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।"[১]

রঙ্গলাল ভারত-ইতিহাসের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কাহিনী অবলম্বনে পদ্মিনী-উপাখ্যান প্রভৃতি কাব্য রচনা করেছেন। এই কাব্যে দেশের স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষার্থে ভারতবাসীর শৌর্য-বীর্য, আত্মসম্মান ও আত্মোৎসর্গের মর্মস্পর্শী

১. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২০৪

বর্ণনা আছে। রঙ্গলালের এই প্রথম কাব্যটিতেই সচেতনভাবে ইংরেজি কাব্যাদর্শ অনুসরণের চেষ্টা প্রত্যক্ষ করা যায়। গ্রন্থের ভূমিকায় স্বয়ং কবিই এ তথ্য পরিবেশন করেছেন।

মধুসূদনের মেঘনাদবধ মহাকাব্যে পৌরাণিক কাহিনীই নবযুগের জীবন-মহিমাবোধে রঞ্জিত হয়ে নবরূপ লাভ করেছে। সাহিত্যাদর্শের অনুসরণে মধুসূদন দ্বন্দ্বাতীতভাবে যুগান্তর এনেছিলেন—একদিকে ভাবের জগতে মিল্টন, টাসো, ভার্জিলের অনুবর্তনে! অন্যদিকে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন—দুটি যুগের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টেনেছে। নব নব কাব্যরীতির ও তদুপযোগী নূতন, প্রাণধর্মী, ওজস্বী ভাষার ব্যবহারে মধুসূদনের কাব্য অভিনব। মধুসূদন বাংলা কাব্যের প্রথম—বহু সমালোচকের মতে একমাত্র মহাকবি অর্থাৎ মহাকাব্যকার।

মধুসূদনের কাব্যের অনুবৃত্তি লক্ষ্য করি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মধ্যে। হেমচন্দ্রের কাব্যে অতীতাভিমুখী কৌতূহল বর্তমানের জীবনজিজ্ঞাসার আলোকে উদ্ভাসিত। মধুসূদন যেমন বিদেশীয় সাহিত্যাদর্শের অনুসরণ করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যে নূতন প্রাণসঞ্চার করেছেন, হেমচন্দ্র তেমনি ছিলেন সংস্কৃত ছন্দ ও বাক্যরীতির পুনঃপ্রবর্তনায় বাংলা কাব্যের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধনে আগ্রহী। বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ বিকাশের পথানুসন্ধান প্রয়াস হেমচন্দ্রেও লক্ষিত হয়।

যুগের প্রেরণায় নবীনকাব্যে ও সাহিত্যে অতীতাভিমুখী কৌতূহল দৃষ্ট হয়। তবে নবীনচন্দ্রের মৌলিকতা তাঁর রচিত প্রথম গাথা কাব্য পলাশির যুদ্ধেই চোখে পড়ে। বঙ্গ ইতিহাস মণিপূর্ণ খনির সুগভীর তলদেশে অবতরণ করলেন না। অপেক্ষাকৃত অনেক উপর থেকে অবিদ্ধ রতন সংগৃহীত হল। এই কাব্যে কবি সদ্য অপহৃত স্বাধীনতার জন্যে অশ্রু বিসর্জন করলেন। এই কাব্যে কবির কোন তত্ত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা নেই। কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার বাসনা ছিল না। শুধুমাত্র কাব্যসৃষ্টির প্রেরণায় কবির ব্যথাহত চিত্তের প্রকাশ পলাশির যুদ্ধ কাব্যকে শিল্পসম্মত সাহিত্যের মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

নবীনচন্দ্রের রঙ্গমতীতে দেখি, স্বদেশের মুক্তি-পথানুসন্ধানের ব্যাকুলতা মধুসূদনের কাব্যকলার আশ্রয়ে প্রকাশিত। রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসে

কবি পথভ্রষ্ট ভারতবাসীর উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করলেন শ্রীকৃষ্ণ স্থাপিত মহাভারতের আদর্শ অনুবর্তনে নিষ্কাম কর্মযোগের মধ্যে। ফিরে এলেন আপন ঘরে। মহাভারতীয় কৃষ্ণলীলার বর্ণনায় আধুনিক জীবনের ভাব ও চিন্তার প্রতিফলনে নবীন কবি যে কাব্যের সৃষ্টি করলেন তা হল উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত। স্পষ্টতই রামায়ণ-মহাভারতের মানসিকতা সে যুগে অর্জন করা ছিল অসম্ভব। এখানে কবি যা সৃষ্টি করবেন, তাতে যুগজীবনের ব্যঞ্জনা অবশ্যম্ভাবী। নবীনচন্দ্রের সার্থকতা এখানেই যে, তিনি যথার্থ মহাকবির ন্যায় একটি যুগ ও জাতির হৃৎস্পন্দন আপন কাব্যে সঞ্চারিত করেছেন। তিনি যে উনবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্যের প্রণেতা - এটা অল্প সম্মানের ছিল না। যুগের বাণীর বাহকরূপে তিনি যথার্থ মহাকবি—তা Aristotle বা বিশ্বনাথের অনুমোদন না পেলেও।

মধুসূদনের কাব্যের ছন্দঃস্পন্দ ও ধ্বনিগাম্ভীর্য এবং ভাবের ওজস্বিতা অনুকরণ-যোগ্য নয়। স্বীকরণের মধ্য দিয়ে নবীনচন্দ্র মধুসূদনের দানকে গ্রহণ করেছেন। নবীনচন্দ্রের সহজ ও সাবলীল ছন্দে মধুসূদনের অনুপ্রেরণা একটি বিশেষ সৌন্দর্য দান করেছে। নবীনচন্দ্রের রঙ্গমতী কাব্যে মধুসূদনের অনুবৃত্তি ভাষা ও ছন্দের দিক থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট। নবীনচন্দ্রের এই কাব্যের বর্ণনাংশও কখনও কখনও মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। যেমন মেঘনাদবধের বর্ণনা মনে পড়ে রঙ্গমতী কাব্যের প্রারম্ভেই—

নবীন নিদাঘ আভা, প্রখর উজ্জ্বল,
পড়িয়াছে বসন্তের কম-কলেবরে,—
ভাঙ্গিলা বিলাস-স্বপ্ন; ঋতু কুলপতি
জাগিলা ফাল্গুন শেষে কুসুম শয্যায়
প্রণয়িনী-উরঃ-স্বর্গে, প্রভাতে যেমতি,
জাগিলা প্রেমিক, নিশি-বিলাসে বিহ্বল।

বীরেন্দ্র নদীবক্ষে নিমজ্জমান, তখন কবির তটিনীকে তিরস্কার—

ধিক্ দেব বায়ুগতি,—
নিষ্ঠুর, নির্দয়, ভীরু! বাসনা তোমার
দেখাতে বিক্রম যদি, যাও বীর ভরে

যথায় হিমাদ্রি চূড়া,—অটল, অচল,—
বসি অহঙ্কারে ; তব রণ-যোগ্য বীর !

এখানে মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গে সিন্ধুর প্রতি রাবণের তিরস্কার অংশের তুলনা দেওয়া যায়। বিশেষ সাদৃশ্য আছে দুটি কাব্যাংশের মধ্যে। আবার রঙ্গমতীর তৃতীয় সর্গে –

অশ্রুত সঙ্গীত ধ্বনি ধ্বনিল শ্রবণে,—
অনাঘ্রাত পরিমল ভাসিল চৌদিকে
আকুলিয়া প্রাণ ; ... ...
দেখিনু সম্মুখে,—
কি দেখিনু ? নরনেত্রে দেখে নাই যাহা –
সম্মুখে গোষ্পদরূপী শিলাকুম্ভে বসি
পার্বতী শঙ্কর ! মূর্তি ত্রিদিব সুন্দর !
পদ্মাসনে আলিঙ্গনে বসিয়া দম্পতি,
প্রেমোন্মত্ত অবশাঙ্গ আনন্দে বিহ্বল।

স্মরণ হয় মেঘনাদ বধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের হরপার্বতীর মিলন দৃশ্য।

... ... অমনি চৌদিকে
প্রফুল্লিল ফুলকুল, মকরন্দ লোভে
মাতী শিলীমুখীবৃন্দ আইল ধাইয়া ;
বহিল মলয় বায়ু ... ...। ইত্যাদি অংশ।

মেঘনাদবধের ইন্দ্রজিতের শৌর্যবীর্যের বর্ণনা নবীনচন্দ্রের কল্পনাকে উত্তেজিত করেছিল। বীরেন্দ্র এবং অভিমন্যুর চরিত্রে দেখি তারই প্রতিফলন। মেঘনাদবধ কাব্যের কেন্দ্রগত করুণরস কুরুক্ষেত্র কাব্যের মূল আখ্যানরূপে অভিমন্যুবধকে নির্বাচনে সহায়তা করেছে। অভিমন্যুর বীর্যদীপ্তি, তার সংগ্রাম কৌশল ইন্দ্রজিতের মতই অনন্যসাধারণ। অদৃষ্টের নির্দেশে চক্রীর চক্রান্তে সেই অপরাজেয় শৌর্যের অবসান মেঘনাদের মৃত্যু দৃশ্যের মতই সকরুণ মহান। এখানে নবীনচন্দ্র মধুসূদনের বাগভঙ্গীকে এমনভাবে আত্মসাৎ করেছেন যে, অগ্রজ কবির প্রভাব প্রকট নয়, অথচ তাঁরই দুর্লক্ষ্য প্রেরণায় এই শোকাহত, গম্ভীর দৃশ্যটি রচিত হয়েছে—অস্বীকার করা যায় না।

উদাত্ত ও বিলম্বিত ছন্দের প্রবাহ ধীরে ধীরে সেই শোকদৃশ্যের জন্য পাঠকের মনকে প্রস্তুত করেছে যখন, সেখানে মধুসূদনের প্রেরণা ছিল।

ভারতের—জগতের—এবে অবসান
মহাদিবা! কি শোকের, কি সুখের দিন! ..
সংহারিয়া সংশপ্তক কপিধ্বজ রথ
ফিরিতেছে ধীরে ধীরে ; শোকভারে রথ
ভারাক্রান্ত, ভারাক্রান্ত রথীর হৃদয়।

—কুরুক্ষেত্র, পঞ্চদশ সর্গ

মধুসূদনের প্রেরণা অলক্ষ্যে নবীনচন্দ্রের কাব্যে পুষ্টি সঞ্চার করেছিল। ইংরেজিতে একে বলা যায় creative assimilation।

মধুসূদনের তিরোধানে নবীনচন্দ্র যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন সেখানেও ছিল মধুসূদনের প্রবর্তনা।

যাও তবে কবিবর! কীর্ত্তিরথে চড়ি'
বঙ্গ আঁধারিয়া,
যথায় বাল্মিকী, ব্যাস ভবভূতি, কালিদাস,
রহিয়াছে সিংহাসন তোমার লাগিয়া।
যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া,
কবিতা ভাণ্ডারে ;
অনন্ত কালের তরে, গৌড়-মন-মধুকরে
পান করি, করিবেক যশস্বী তোমারে।

—অবকাশরঞ্জিনী (২), '৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত'

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন সেক্‌স্‌পিয়র, মিলটন, বায়রণ। ইহাদের লেখার ভিতরকার যে জিনিসটা আমাদিগকে খুব নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা।" এই হৃদয়াবেগের প্রবলতায় নবীনচন্দ্র বায়রণের সমধর্মী। তাঁর কবিখ্যাতিলাভের প্রথম পর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার বায়রণের মর্যাদায় নবীনচন্দ্রকে ভূষিত করেছিলেন। কবি হৃদয়ের অকপট প্রকাশে নবীনচন্দ্র সেন ছিলেন একজন সার্থক গীতিকবি। এখানেই ছিল বায়রণের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য।

মধুসূদন হেমচন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্যের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে নবীনচন্দ্রের

যেমন যোগ ছিল, তেমনি বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর যোগসূত্রটি অনতিলক্ষ্য নয়। নবীনচন্দ্রের সহজাত গীতিপ্রাণতা, আবেগোচ্ছ্বাস, আত্মমগ্নতা এবং রোমান্টিক সৌন্দর্যদৃষ্টি অবকাশরঞ্জিনীতে কিছু উপভোগ্য গীতিকবিতা উপহার দিয়েছে বাঙালী পাঠককে। যুগ প্রয়োজনে তিনি মহাকবির ভূমিকা গ্রহণ করলেও, তাঁর প্রকৃতিভাবনা, নারীর সৌন্দর্য ও প্রণয়বিহ্বলতা, রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রমুখ কবির কাব্যের সঙ্গে একটি যোগসূত্র রচনা করেছেন। যে গীতিকবিতার ধারা ভবিষ্যৎ বাংলা কাব্যে একমাত্র প্রাধান্য লাভ করে, তার আরম্ভ এই যুগে। গীতিকবিতার সেই নব প্রভাতে নবীন কবিও অস্ফুট কলকাকলীতে বঙ্গবাসীর বন্দনা গেয়েছিলেন, বঙ্গবাসীর সভায় স্বাগত জানিয়েছিলেন নূতন যুগকে।

সমকালীন সাহিত্যের মত চিন্তার ক্ষেত্রেও নবীনচন্দ্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার প্রয়াস দেখি। অতীত ও বর্তমান—এই দুই যুগের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন, ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন আদর্শ, লক্ষ্য ও ভাব-কল্পনার ক্ষেত্রে। নবযুগের ভাবধারার বাহকরূপে তিনি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্রের উত্তরসাধক। বঙ্কিমচন্দ্রের, রাজনারায়ণের, বিবেকানন্দের সহকর্মী ও সহযোগী। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজীর অগ্রজ। প্রসঙ্গত প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। "ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর মনীষা ভারতবর্ষকে এক ও অখণ্ডরূপে, একটি সুমহৎ আইডিয়ারূপে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিল। যুগের সেই দৃষ্টি নবীনচন্দ্রের ত্রিধা কাব্যে বর্তমান। দৃষ্টির এই ব্যাপকতা সেই যুগেরই বিশেষ লক্ষণ। প্রায় সাধারণ লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সেইজন্য নবীন সেন প্রতিভায় রামমোহন বঙ্কিমচন্দ্রের সমতুল্য না হইয়াও যুগদৃষ্টিকে লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।" ১

ভারতপথিক রামমোহনের মধ্যেই প্রথম এক ও অখণ্ড ভারতবর্ষের পরিকল্পনার অঙ্কুরিত রূপটি প্রত্যক্ষ হয়। তাঁর সমাজসংস্কার ও ধর্মান্দোলনের পটভূমি এই বিশাল দেশ। তাঁর ভারতচিন্তার প্রকাশ দেখি, তাঁর বেদান্ত প্রতিপাদ্য হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠায়, বেদান্ত উপনিষদের পুনঃপ্রচার প্রচেষ্টায়।

১. চিত্রচরিত্র, প্রমথনাথ বিশী, পৃ. ৯৭

এরই সঙ্গে ছিল রামমোহনের এক বিশ্বাভিমুখী কল্যাণাদর্শে আস্থা। স্বদেশের কল্যার্ণব্রতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ রামমোহনের বিশ্বাত্মীয়তাবোধ ছিল সেযুগে একান্ত অভিনব। শতধা বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম সোপান ধর্মীয় সমদৃষ্টির সাধনা—রামমোহনই প্রথম এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। ধর্মপ্রবণ জাতিকে ঐক্যাদর্শে বিশ্বাসী করতে হলে, সেই ঐক্যচেতনা হবে অধ্যাত্মচেতনার বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত।—

"I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political system.

The distinction of castes, introducing innumerable divisions and subdivisions among them has entirely deprived them of patriotic feeling, and the Laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprize. · · · It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort."১ হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ছিল তাঁর শ্রদ্ধা। সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে তিনি স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

পরবর্তী কালে রামমোহনের এই ভারতচিন্তা, বিশ্বমানবতা ও সমন্বয়দৃষ্টির সাধনায় কেশবচন্দ্র সিদ্ধিলাভ করলেন। ঐক্যধর্মের ভিত্তিতে অখণ্ড জাতি গঠনের প্রয়াস রামমোহনের উত্তরসাধক কেশবচন্দ্রে আরো স্পষ্ট। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সংস্কার সভার প্রতিষ্ঠা এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠায় কেশবচন্দ্রের অখণ্ড ভারতবর্ষের ধারণা রূপলাভ করেছে।—আধুনিক যুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঐক্যবোধের উন্মেষে বাঙালী নেতৃবৃন্দ এগিয়ে আসেন। ব্যক্তিগত কারণ ব্যতিরেকেও সমষ্টির মহৎ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে

১. উদ্ধৃতি—Letter dated 18th January 1828, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, রামমোহন রায়, পৃ. ১২২

ভারত পরিকল্পনায় তাঁরা লিপ্ত হন। বর্তমান কালে কেশবচন্দ্রই সর্বপ্রথম এর পথ দেখান।[১] এখানে পূর্ব সূত্র অনুসরণ করে বলা যায়, রামমোহনে যে ভারত চিন্তার অভ্যুদয় হয়েছিল, কেশবচন্দ্রে তার বিকশিত রূপটাই দেখা গেল।

কেশবচন্দ্রের ভারতীয় ঐক্যচেতনার ক্রমপরিণতির সূত্রে রাজনারায়ণ বসু জাতীয় জাগরণে, নব হিন্দু জাতীয়তার প্রতিষ্ঠায় এক নূতন দিগন্তের আবিষ্কার করেছিলেন। 'Grandfather of Indian Nationalism'—উপাধি-ভূষিত রাজনারায়ণ বসু একদিকে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদী হিন্দুদের সম্মিলনে এক হিন্দু জাতীয়তার উদ্বোধনে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। অন্যদিকে তাঁর 'জাতীয়-গৌরব সম্পাদনী সভা'র পরিকল্পনায়, হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা উদ্যোগে নবজাগ্রত জাতির আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসই জয়যুক্ত হল।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদেশিকতা ও ধর্মচিন্তায় জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আহ্বান শোনা গেল। ভারতের সুখ-দুঃখ, তার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বঙ্কিমচন্দ্র একান্ত আপনার সামগ্রী বলে গ্রহণ করলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস ও কৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থে অখণ্ড, এক ভারতবর্ষ তাঁর কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছিল। তথাপি আনন্দমঠের বন্দে মাতরম্ স্তোত্রে যে মাতৃভূমির অর্চনা করলেন তিনি সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশ। মৃনালিনী প্রভৃতি উপন্যাসে, কমলাকান্তের দপ্তরে, বঙ্গদর্শনের বিবিধ প্রবন্ধে বঙ্কিমের স্বদেশচেতনায় বিশেষভাবে বাংলাদেশের প্রেরণা ও প্রীতি লক্ষ্য করি। তবুও একথাও সত্য 'ভারত'বোধ তাঁর চিত্তে সদাজাগ্রত ছিল। বঙ্গভূমির প্রতিমায় তিনি আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের পূজা করেছেন। জন্মভূমি ভারতবর্ষই। তবু লক্ষ লক্ষ বাঙালীর মতই একটি দুর্বলতা পোষণ করতেন—বঙ্গদেশ প্রসঙ্গে।

নবীনচন্দ্র আবির্ভূত হলেন ভারতের জাতীয় জাগরণের যুগে এক বিশেষ ক্ষণে, বিশেষ পর্বে, বিশেষ ভূমিকায়। রামমোহন-কেশবচন্দ্রের ভারত ভাবনা নূতনভাবে, নূতন প্রকাশ মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করল নবীন সাহিত্যে। এক ও অখণ্ড ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ব্যাকুল করে তুলেছিল নবীনচন্দ্র সেনকে। আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষ তার নানা সম্প্রদায়, ধর্ম, ভাষা ও শ্রেণী-বর্ণ নিয়েও একটিমাত্র জাতি—একমাত্র দেশ বলে ধরা দিয়েছে কবির উপলব্ধিতে।

১. দ্রষ্টব্য, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, কেশবচন্দ্র সেন, পৃ. ৪৬

বাংলাদেশ মাত্র তাঁর জন্মভূমি নয়। বহু জাতি-ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছিল যে ভারতীয়তার, এই ভারতীয়তার প্রতিষ্ঠা—যে বিশাল দেশে, সেই ভারতবর্ষই কবির মাতৃভূমি। তার সুখ-সম্পদ সম্মানের মত দুঃখ-দৈন্য-গ্লানি এবং তার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সবই কবির আপন সামগ্রী। রৈবতকে কবির এই মনোভাব প্রকাশিত স্পষ্টভাবে। পূর্বরচিত কাব্যেও এ চিন্তার উপস্থিতি লক্ষণীয়। ভারতের ঐতিহ্য, অতীত গৌরব, বর্তমান দুর্গতি ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন ব্যাকুল করে তুলেছিল নবীন কবিকে। কৃষ্ণের উক্তিতে কবির আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হল—রৈবতকে।

হে মাতঃ ভারতভূমি! সৃজিলা বিধাতা
মহারাজ্য উপযোগী করিয়া তোমায়।
তুষার-কিরীট-শীর্ষ, বিরাট-মূরতি,
অভ্রভেদী হিমাচল বসিয়া শিয়রে,
প্রসারিত ভুজদ্বয় করি সম্মিলিত
পদতলে কুমারীতে ভীষণ মূর্তিতে,
আপনি ভারতবর্ষ করেন রক্ষণ।
ভীষণ ভুজাগ্রদ্বয় মহেন্দ্র, মলয়,—
তুচ্ছ মানবের কথা, সমুদ্র আপনি
না পারে লঙ্ঘিতে বলে মানি পরাজয়,
দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকাররূপে শোভিছে কেমন
ভারতের পদতল করি প্রক্ষালন!
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যচয় করি সম্মিলিত
এই শৈলপ্রাচীরের মধ্য পুণ্যভূমে
এক মহারাজ্য, প্রভু! হয় না স্থাপিত,—
এক ধর্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন?

কৃষ্ণের মত কবি নবীনচন্দ্রও যেন শপথ করেছিলেন,

শিখাব একত্ব-মর্ম,—
এক জাতি, এক ধর্ম;
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,—
সমগ্র মানব প্রজা, রাজা নারায়ণ!

এমন অজস্র উদ্ধৃতি ও প্রমাণ উপস্থিত করে বলা যায়—রামমোহন রায়ের যুগের সূচনা পর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজীর যুগ পর্যন্ত পরিণতিকাল সীমায় ভারত ভাবনা · অখণ্ড ভারতবর্ষের পরিকল্পনা ও গঠনের কাজে নবীনচন্দ্রের এক ভূমিকা ছিল—বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পূর্ববর্তীদের অপেক্ষা নবীনচন্দ্রের চিন্তা ও উপলব্ধি ছিল অনেক পরিণত—সুস্পষ্ট।

রামমোহন-কেশবচন্দ্রের সমদৃষ্টির সাধনা নবীনচন্দ্রেও পরিস্ফুট দেখা গেল। খ্রীষ্ট, বুদ্ধ-মহম্মদ সকলকে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। আবার ধর্মগত ঐক্য স্থাপনার উদ্দেশ্যে রাজনারায়ণ বসু যে একেশ্বরবাদী ও পৌরাণিক হিন্দুদের মিলনের সূত্রপাত করেছিলেন নবীনচন্দ্র সেই পন্থার অনুবর্তনে আরো অগ্রসর হয়েছেন। কৃষ্ণচরিত্রের পরিকল্পনায় ও নবসংস্কৃত হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগী। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের উপক্রমণিকায় দেখি, শ্রীকৃষ্ণ লেখকের অভিমত হল,—"জানিয়াছি - ঈদৃশ সর্বগুণান্বিত, সর্বপাপ সংস্পর্শশূন্য, আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নাই।" এবং "ধর্মান্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে কৃষ্ণচরিত্রের সবিস্তারে সমালোচনা প্রয়োজনীয়। যদি পুরাতন বজায় রাখিতে হয়, তবে এখানে বজায় রাখিবার কি আছে না আছে, তাহা দেখিয়া লইতে হয়।"[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গী, হিন্দুধর্মের নবমূল্যায়ন প্রচেষ্টা নবীনচন্দ্রেও পরিলক্ষিত হয়। সমন্বয়ের সাধনা ও প্রাচীনের বিচার বিশ্লেষণ, যুগের পটভূমিকায় তাকে প্রতিষ্ঠার আগ্রহ নবীনচন্দ্রের বিশেষত্ব ছিল।—"এই ভারতের আসমুদ্র গিরি, আচট্টল গান্ধার, যে অসংখ্য লোক বাস করিতেছে, ইহাদের বিশ্বাস এক নহে, আচার এক নহে, আহার এক নহে, ভাষা এক নহে, অথচ সকলেই হিন্দু।"[২] এই প্রসঙ্গেই লেখকের মন্তব্য—"এমন কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস পর্যন্ত হিন্দুধর্মের মূল নহে।" প্রসঙ্গত জানাই, সে যুগের বহু মনীষীর মতই নবীনচন্দ্রের কাছে ভারতীয় ও হিন্দু শব্দ দুটি সমার্থক ছিল। নবীনচন্দ্র মনে করতেন, যদি সমস্ত জাতিকে সাধারণভাবে এক উপাস্য দেবতা এবং আদর্শের অধীনে আনতে হয়, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ হবেন উপাস্য এবং গীতা

১. কৃষ্ণচরিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. উপক্রমণিকা

২. ভানুমতী, নবীনচন্দ্র সেন, পৃ. ১৭৩

হবে ধর্মশাস্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ কথিত নিষ্কাম কর্মযোগের পথেই স্বদেশ কল্যাণরূপ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে। বিভিন্ন প্রসঙ্গেই আমাদের এ তথ্য স্মরণীয়।

নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

মধুসূদনের প্রবর্তিত কাব্যধারার অনুবর্তক কবি নবীনচন্দ্র কাব্যজগতে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ। এ তথ্য শুধু কালানুক্রমের বিচারে প্রতিপন্ন নয়, স্বয়ং কবিগুরুর প্রদত্ত শিরোপা। একদা নবীনচন্দ্রকে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "কৃত্তিবাসের বিজ্ঞাপনপত্রে আপনার নিম্নে আমার নাম স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়া আপনি কেন আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন? যদিও আমি বয়সে আপনার অপেক্ষা অনেক ছোট হইব, তথাপি দৈবক্রমে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে আপনার নামের নিম্নে আমারই নাম পড়িয়াছে—আপনি নবীন কবি, আমি নবীনতর। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেও ঐতিহাসিক পর্যায় রক্ষা করিয়া আপনার নিম্নে আমার নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্বসম্মতিক্রমে আপনার নামের নিম্নে নাম স্বাক্ষর করিবার অধিকার আমি প্রাপ্ত হইয়াছি—আশা করি, ইতিহাসের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত এই অধিকারটি রক্ষা করিতে পারিব।"[১] নবীনচন্দ্রের কাব্যে রবীন্দ্রযুগের অশ্রুত পদসঞ্চার টের পাওয়া গেল—একথা বল্‌লে তথ্যের সঠিক উপস্থাপনা হয় না। নবীনকাব্যে রবীন্দ্রকাব্যের স্পষ্ট পূর্বাভাস পাওয়া গেল অনেক ক্ষেত্রে। এ প্রসঙ্গে মনস্বী অধ্যাপক-সমালোচক লিখেছেন, "নবীনচন্দ্রের কাব্যে আমরা প্রথম অতি শক্তিমান মানবিকতার সাক্ষাৎ পাই। বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এই শেষোক্ত কবির রচনায় যে রহস্যপ্রীতি ও সৌন্দর্যবোধের সমন্বিত আন্দোলন নিহিত আছে, বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে তার বিস্তারিত প্রকাশ ঘটেছে। বিহারীলালের রচনায় বাংলা কাব্যে রোমান্টিক দৃষ্টির প্রকাশ দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথের লেখায় তারই পরিবর্ধন। নবীনচন্দ্রের কাব্যের বহুস্থলে এই নব্যসৃষ্টির সূচনা চোখে পড়ে। তা ছাড়া ছন্দের ব্যবহারেও এই কবির আধুনিকতা স্বীকার্য।"[২]

১. আমার জীবন: চতুর্থভাগ

২. বাংলা কাব্যে প্রাক্ রবীন্দ্র: হরপ্রসাদ মিত্র, পৃ. ২২২

নবীনচন্দ্রের কাব্যের এই 'অতিশক্তিমান মানবিকতা বিশ্বমানবিকতা-বোধের নামান্তর মাত্র। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশ্বমানবতার উপলব্ধি প্রধান বৈশিষ্ট্য। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আধুনিক যুগে বিশ্বমানবের অভ্যুত্থানের ইতিহাসে নবীনসাহিত্যের আলোচনা অপরিহার্য। একান্তভাবে হিন্দুধর্মের—বিশেষত পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের প্রবর্তক এই কবির চোখে বুদ্ধ-খ্রীষ্ট-মহম্মদ সকলেই শ্রীভগবানের অবতাররূপে প্রতিভাত। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি তাঁর আন্তরিক প্রীতি সাহিত্যে ও জীবনে প্রকাশিত। কবি উপলব্ধি করেছেন,—

ভারত জগৎ নহে। নহে এই পারাবার
এই জগতের সীমা। অন্য পারে তার
আছে মহারাজ্য চয় অনন্ত বিস্তার।
আছে বহু পারাবার, আছে বহু হিমাচল,
আছে বহু নদনদী কানন কান্তার;
আছে বহু নরজাতি, নানাবর্ণ, নানাবেশ,
মুষ্টিমেয় এ ভারত তুলনায় তাঁর।[১]

একদিকে ভারতের মহিমময় অতীত ও ঐতিহ্যের জন্যে গর্ববোধ অন্যদিকে বর্তমানের বিচ্ছিন্নতা, দৈন্য ও পরাধীনতার জন্যে বেদনা এবং ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্যে ব্যাকুলতা যেমন প্রকট ছিল তাঁর, অন্যদিকে ছিল নিখিল মানবের জন্যে কল্যাণচিন্তা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ নবধর্মের দূত প্রেরণ করলেন বহির্ভারতে; উদ্দেশ্য—

যেই শক্তি এ হৃদয়ে, যেই ধর্ম শিরে,
হইল স্থাপিত, সুখে করিয়া গ্রহণ
সেই শক্তি-বৈজয়ন্তী, সেই পুণ্য ধর্মালোক
যাও দেশ দেশান্তরে পতিত পাবন। . ...
কর দেব! মহাযাত্রা! পাষাণী অহল্যা মত,
তব পদ পরশনে লভিবে উদ্ধার
পৃথিবী, মানবজাতি; মরু হবে জনপদ,
হবে বন মহারাজ্য সম অমরার।

১ প্রভাস : অষ্টম সর্গ

এই উদ্ধৃতিও প্রভাস কাব্যের, এবং প্রভাস কাব্য প্রকাশের পূর্বেই বিবেকানন্দের ধর্মবিজয়ে কবির এই স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করেছিল। নবীনচন্দ্রের পূর্বেকার আধুনিক যুগের বাংলাকাব্যে বিশ্বমানবতাবোধের প্রকাশ দুর্লভ। বিশ্বমৈত্রীর সাধক নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরী।

'এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত / বেঁধে দিব আমি।' রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজি-উৎসব' কবিতায় ভারতবাসীর এই যে স্বপ্ন ও সাধনার কথা ব্যক্ত করেছেন, তার বহু পূর্বেই নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ এই সংকল্পে উদ্বুদ্ধ। 'শিবাজি-উৎসব' কবিতায় কবির শপথ,—

সেদিন শুনি নি কথা আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন—
দরিদ্রের বল
'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল॥

এই এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্পই রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের কবির কল্পনাকে উদ্বেল করেছিল। শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠে কবিরই আশা ব্যক্ত!

এক ধর্ম, এক জাতি
এক রাজ্য, এক নীতি,
সকলের এক ভিত্তি—সর্বভূত-হিত;
সাধনা নিষ্কাম-কর্ম,
লক্ষ্য সে পরমব্রহ্ম,—
একমেবাদ্বিতীয়ং! করিব নিশ্চিত
ওই ধর্ম-রাজ্য মহাভারত স্থাপিত।

শুধু চিন্তার ক্ষেত্রেই নয়, সৌন্দর্যসম্ভোগের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রথম দিকের কবিতাগুলির মধ্যে প্রকৃতি ভাবনায় নবীনচন্দ্রের সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায়। অবকাশরঞ্জিনীর কিছু কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্য পর্যন্ত রচিত কবিতার ভাব ও ভঙ্গীগত কবিতার মিল

আছে। প্রকৃতির সঙ্গে নবীনচন্দ্রের এক বিশেষ সৌহার্দ্য বন্ধন ছিল। কবি প্রকৃতিকে শুধু কাব্যের পটভূমি করে রাখেন নি। তাঁর কাব্যের অন্তরঙ্গ প্রকৃতিতে নিসর্গ চেতনার প্রতিফলন এক বিশেষ রসানুভূতির সৃষ্টি করে। প্রকৃতির সঙ্গে এই একাত্মতাবোধেই নবীনচন্দ্রের কাব্য-কবিতা রবীন্দ্রপূর্বযুগের সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। রোমান্টিক প্রণয়-ভাবনায়ও নবীনকাব্য রবীন্দ্রযুগের আগমন সূচিত করেছে। তাঁর 'উত্তর', 'যাই', 'হৃদয়োচ্ছ্বাস' প্রভৃতি কবিতার Lyric সুর পরবর্তী যুগের কাব্যে একাধিপত্য লাভ করেছিল। শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে নবযুগ' গ্রন্থে 'রৈবতক' অর্জুনের সুভদ্রার প্রতি মনোভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র চিত্রাঙ্গদার প্রতি অর্জুনের আকর্ষণ অংশটি স্মরণ করেছেন। নবীনচন্দ্রের কাব্য থেকে এজাতীয় প্রচুর উদ্ধৃতি সংগ্রহ করা যায়, যা রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কবিতার প্রসঙ্গ মনে পড়ায়।

নবীনচন্দ্র ও বিবেকানন্দ

সাহিত্যের মাধ্যমে নবীনচন্দ্র যখন এক ভারতবর্ষের আদর্শকে জাতির সামনে তুলে ধরছিলেন, তখন আর একজন মহাপুরুষ, এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানব বিবেকানন্দ এক ভারতীয়তার পতাকার নিচে জাতিকে সংঘবদ্ধ করতে আমৃত্যু সংগ্রাম করছিলেন। ইউরোপ-আমেরিকার ভোগবাদী সভ্যতার মোহ থেকে দেশকে রক্ষা করতে তিনি উন্মুখ। তাৎক্ষণিক গ্লানি ও পতনকে দূরে সরিয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করলেন হিন্দুধর্ম ও ভারতবর্ষকে। ভারতবর্ষের আত্মাকে, হিন্দুর ধর্মকে শুধু স্বদেশেই ধরে রাখলেন না, বিদেশে তার গৌরবময় পরিত্রাতার ভূমিকার কথা বারবার প্রচার করলেন। পূর্ব-পশ্চিমকে মিলিয়ে সমগ্র বিশ্বকে তিনি আত্মকল্যাণ, সমষ্টিমুক্তি ও মোক্ষের পথ দেখালেন। সেকালে নবীনচন্দ্রের কাব্যস্বপ্নকে সার্থক করলেন রামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ তাঁর সারাজীবনে উপলব্ধ সত্যকে রূপ দিলেন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ প্রচার সংঘ বা মঠ ও মিশনের পরিকল্পনায়। তাঁর অভিপ্রায় ছিল, "মানবের হিতার্থে শ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্য করিয়াছেন ও কার্যে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার প্রচার

এবং মনুষ্যের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে তদ্বিষয়ে সাহায্য করা এই প্রচারের মিশনের উদ্দেশ্য।"

শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়ে জগদ্বাসীকে আকৃষ্ট করেছিলেন স্বামীজী, আর নবীনচন্দ্র ভারতকে সংঘবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পদতলে। নবীন-সাহিত্যে প্রচারিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিবেকানন্দের কর্মে প্রদত্ত প্রেরণার পার্থক্য ছিল না। তবে, স্বামীজীর মধ্যে সেই কল্পনা ও প্রেরণা বিরাট, ব্যাপক এবং বাস্তবজগতে কর্মক্ষেত্রে আপনাকে রূপায়িত করেছে, প্রসারিত করেছে। নবীনচন্দ্র সীমাবদ্ধ পরিধিতে হলেও ধর্ম ও কর্মকে একই সাধনায় নিবদ্ধ করতে উৎসুক ছিলেন। সেই সাধনা নিষ্কাম কর্মযোগের সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায়ও ছিল অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার শিক্ষা। "জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। কর্ম তো আদিকাণ্ড; জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম একটি উপায়,—উদ্দেশ্য নয়।[১] শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দের উক্তি,—" 'প্রবৃত্তি' ও 'নিবৃত্তি' উভয়ই কর্ম; প্রথমটি অসৎকর্ম, দ্বিতীয়টি সৎ কর্ম। এই নিবৃত্তিই সকল নীতি ও ধর্মের মূল ভিত্তি। উহার পূর্ণতাই সম্পূর্ণ 'আত্মত্যাগ'—পরের জন্য মন, শরীর, এমন কি সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকা। যখন এই অবস্থা লাভ হয়, তখনই মানুষ কর্মযোগে সিদ্ধি লাভ করে। সৎকর্মের ইহাই শ্রেষ্ঠ ফল। এক ব্যক্তি সমগ্র জীবনে একটি দর্শন শাস্ত্রও পাঠ করেন নাই, তিনি হয়তো কখনও কোনরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন নাই, এবং এখনও করেন না, তিনি হয়তো সারাজীবনে একবারও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন নাই; কিন্তু যদি কেবল সৎ কর্মের শক্তি তাঁহাকে এমন অবস্থায় লইয়া যায়, যেখানে তিনি পরার্থে তাঁহার জীবন ও যাহা কিছু সব ত্যাগ করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, জ্ঞানী জ্ঞানের দ্বারা এবং ভক্ত উপাসনার দ্বারা যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তিনিও সেইখানেই পৌছিয়াছেন। সুতরাং দেখি—জ্ঞানী, কর্মী ও ভক্ত সকলে একই স্থানে উপনীত হইলেন, মিলিত হইলেন। এই এক স্থান আত্মত্যাগ। ··· নিঃস্বার্থতাই ঈশ্বর।"[২] বিবেকানন্দ সংসারীকে দিলেন ত্যাগের, অনাসক্তির প্রেরণা। একই উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসীকে দিলেন 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' কর্মের আহ্বান।

১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১৩-১১৪

নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ, অর্জুন, সুভদ্রা, শৈলজার জীবনে ও কর্মে এই আদর্শেরই প্রকাশ ঘটেছে। নবীনচন্দ্রের যুগ—সমন্বয়ের যুগ। তখন ধ্যানের সঙ্গে কর্মের, দেশের সঙ্গে বিশ্বের, ঐহিকতার সঙ্গে পারত্রিকতার ভেদ দূর করে ঐক্যের সাধনায় সব সমস্যার সমাধানের আকাঙ্ক্ষা জাতীয় মানসে প্রবল হয়ে উঠেছিল। নবীনচন্দ্রের কাব্যে যার ঘোষণা, বিবেকানন্দের ফলিত বেদান্তে যার প্রতিষ্ঠা, রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নে ও সাধনায় তারই পরিণতি ও প্রতিফলন।

নবীনচন্দ্র ও পরবর্তী কবিগণ

নবীন সাহিত্যের সঙ্গে আগামী যুগের সাহিত্যের যোগসূত্রটি দুর্লক্ষ্য নয়। নবীনচন্দ্রের কবিতার অনলোদ্গারী দেশপ্রেম, তাঁর কবিতার দেহবাদ পরবর্তী বাংলা কাব্যেরও বৈশিষ্ট্য। যে বলিষ্ঠ মানবতাবাদ এবং একজাতি প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাব্যে অভিব্যক্ত, যে বর্ণবৈষম্যকে তিনি ধিকৃত করেছেন, পরবর্তী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও নজরুল ইসলামের মধ্যেও সমমনোভাবের প্রকাশ দেখি। 'জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি, সে জাতির নাম মানুষ জাতি,' অথবা 'জাতের চেয়ে মানুষ সত্য, অধিক সত্য প্রাণের টান'—এ নবীনচন্দ্রের কবিতার একটি প্রধান বক্তব্য ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যে স্বদেশই হল তাঁদের প্রেরণাদাত্রী। তাই তাঁরা সাম্যের গান গেয়েছেন কাব্যে। যে সঙ্গীত রচনা করেছেন তার মূল সুর জাতীয়তাবোধ ! এ প্রসঙ্গে নবীন সাহিত্যের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করেছি, তাতে বিশদ বিশ্লেষণে নবীনচন্দ্রের কবিতায় জাতীয়তা ও সাম্য যে অন্যতম প্রধান ভাব তার উল্লেখ আছে। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের বাংলা কাব্যে যে দেহাত্মবাদের ঘোষণা শুনি, একদা নবীনকাব্যে তার প্রকাশ নিন্দিত হয়েছিল। দেহাশ্রয়ী ভালবাসাকে, বিশেষত কাব্যে তার প্রকাশকে অনেকেই তিরস্কার করেছিলেন। আধুনিক কবি নিষ্কাম প্রেম বা আত্মিক প্রেমের ছদ্মবেশ সরিয়ে যখন অকপটে লেখেন,—

হায় দেহ ! - নাই তুমি ছাড়া কেহ—
জানি তাহা প্রাণে-প্রাণে,

মূরতি পাগল মনের মমতা
তাই ধায় তোমা পানে।
তোমারি সীমায় চেতনার শেষ,
তুমি আছ তাই আছে কাল-দেশ,
দুঃখ সুখের মহা পরিবেশ!
দেহ-লীলা অবসানে
যা থাকে তাহার বৃথা ভাগাভাগি
দর্শনে—বিজ্ঞানে।

তখন মহাকাব্যধারার অন্যতম কবি নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনীর কবিতা ও ত্রয়ী কাব্যের জরৎকারুর প্রেমবাসনার অভিব্যক্তি স্মরণ হয়। এই ইন্দ্রিয়-সচেতন দেহবাদী প্রেম এই সব কবিতা ও কাব্যাংশগুলিকে এক অপূর্ব জীবনরসে নিষিক্ত করেছে। এখানেই নবীনকাব্যে বেজেছে আগামী যুগের কাব্যের আগমনী সুর। এখানেই আধুনিক বাংলা কবি সমাজের অগ্রজ বন্দনায় নবীনচন্দ্রেরও স্মরণ প্রয়োজন।

কালের বিচারে অমরত্বের দাবিদার পৃথিবীর সাহিত্যেই কয়েকজন মাত্র। শাশ্বত কবি বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, হোমর, শেক্সপীয়র প্রমুখ। প্রতিভাবান মাত্রই অমরত্ব লাভ করেন না। নবীনচন্দ্রও অমর কবি নন। কিন্তু দেশের রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক বিশেষ পর্বে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। সেই অধ্যায়টিকে তিনি আপন অস্তিত্বের স্থির প্রমাণের দ্বারা চিহ্নিত করে গেছেন। যুগের মর্মবাণী প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। ভাবীকালের পদসঞ্চার ক্ষীণভাবে শ্রুত হয়েছে তাঁর কাব্যে। তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি প্রসঙ্গে একটি তথ্য স্মরণীয়। সাহিত্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি কাব্য সৃষ্টির চাইতে অধিক মনোযোগী হয়েছেন জাতি গঠনের কাজে। সাহিত্যের পরিণততর সৃষ্টিকর্মের দিকটি প্রতিভাবান হয়েও উপেক্ষা করেছিলেন। চিন্তার জগৎ—জাতি গঠনের প্রয়োজন, স্বদেশের সমস্যা ও তার সমাধানচিন্তা তাঁর সবটুকু মনোযোগ ও অবসর কেড়ে নিয়েছিল। অন্যথায় নবীনচন্দ্র সৃষ্টি করতে পারতেন জীবননিষ্ঠ শিল্পোত্তীর্ণ উপন্যাস ও রসোত্তীর্ণ উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। উপন্যাসের ক্ষেত্রে ভারতীয় উপন্যাস সম্বন্ধে এক নিজস্ব ধারণা তাঁর উপন্যাস 'ভানুমতী'-কে ব্যর্থ করেছিল। যদিও ঔপন্যাসিকসুলভ

জীবনবোধ, চরিত্র নির্মাণদৃষ্টি, বাস্তব বর্ণনাকুশলতা তাঁর ছিল, তবু সে সব শক্তিকে অনাদৃত রেখে তিনি আশ্রয় নিলেন মহাকাব্যের দরবারে। ঔপন্যাসিক তিনি হলেন না। নবীনচন্দ্র অন্তরে বাইরে ছিলেন একজন যথার্থ গীতিকবি। কিন্তু মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের মত মহাকাব্যই রচনা করলেন। এ ছাড়া, জীবনের এক বিশেষক্ষণে আপন অন্তরে প্রেরণা এসেছিল—যুগবাণীকে ঘোষণা করতে হবে। এই মহৎ দায়িত্বভার বহনক্ষম প্রকাশ মাধ্যম হতে পারে একমাত্র মহাকাব্যই। মহাকাব্যকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন আরও একটি কারণে। তৎকালীন গীতিকবিতার উৎকর্ষ বা জনপ্রিয়তা তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে নি। গীতিকাব্য নবীনচন্দ্রের আপনযুগে জনপ্রিয় ছিল না। বিহারীলালের আপনমনে গেয়ে যাওয়া গান অনেকেরই কর্ণগোচর হয় নি। শক্তিশালী গীতিকবি যিনি আবির্ভূত হলেন—বিধিই তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন যথাযথ পথে। নবীন সে পথ গ্রহণ করেন নি। যদিও অনেকের ধারণা, সেটাই ছিল তাঁর গন্তব্য।

আধুনিক গীতিকাব্যের আদিকবি বিহারীলাল। সাহিত্যের জগতে তিনি নবীনচন্দ্রের অগ্রজ। বিহারীলাল যখন বন্ধু বিয়োগ, প্রেম প্রবাহিনী, এবং বঙ্গসুন্দরী কাব্য রচনা করছেন নবীনচন্দ্র তখন খণ্ড কবিতাসৃষ্টিতে মগ্ন। এগুলি গীতিকবিতাই ছিল। যদিও বিহারীলাল থেকে ভাবে ও রূপে পার্থক্য ছিল প্রচুর। এবং শেষ পর্যন্ত বিহারীলাল তাঁকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলেন না। আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের বিকাশ ও পরিণতি দেখি রবীন্দ্রনাথে। আঙ্গিকে ও অন্তরঙ্গ প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ গীতিকবিতার সৃষ্টি হল এ সময়েই। অনুমান করি, নবীনচন্দ্র যদি আরো দশ বছর পরে জন্মগ্রহণ করতেন; সম্ভবত তিনি আপন সৃষ্টিশক্তিকে নিয়োজিত করতেন গীতিকাব্যে। দুর্ভাগ্য-বশত কবি প্রতিভা কর্ষিতক্ষেত্রের অভাবে যত্রতত্র আপনাকে ব্যক্ত করার প্রয়াসে বহু পরিমাণে শক্তির অপব্যয় করেছিল। এ সত্য স্বীকার্য যে, নবীনচন্দ্রের প্রতিভার তুলনায় তিনি সাহিত্যসৃষ্টি করেন নি। যে বিপুল সম্পদ তাঁর ছিল, দেশকে তার উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ দিয়ে গেলেন না। এ সব অভিযোগ মেনে নিয়েও, একটি সত্য উদ্ঘাটিত হওয়া উচিত। নবীনচন্দ্র নবযুগের একজন স্মরণীয় স্রষ্টা ও যুগের সাধনায় একজন পূজ্য পুরোহিত। বাংলা মহাকাব্যের দুর্লভ উদাহরণ দান করেছেন বলে নয়, প্রতিভাশালী কবি

স্ব-কালের সাহিত্য যা সৃষ্টি করেছেন, তা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল অক্ষয় থাকবে, এসব শিল্পসম্মত সাহিত্য বলেই। সাহিত্যে ইতিহাসের যে দিকটি আছে, মহাকাব্যের রচয়িতা—উনবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্যপ্রণেতা নবীনচন্দ্র সেনের নাম সেখানে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকবে। আর গীতিকবি নবীনচন্দ্রও ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে স্মরণীয়।

সাধনার জগতে নবীনচন্দ্র স্ব-কালের কবি ও সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সাধনা ছিল দেশহিতের, সাধনা ছিল জাতিগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার, সাধনা ছিল 'এক ধর্মরাজ্য' স্থাপনার। মর্মে তার প্রেরণা ছিল, কর্মে ছিল প্রকাশ। তাঁর জীবনদর্শন—

"এই আমি জানি—
এই হাসি-অশ্রু-পূর্ণ বিবর্তন-রথে
ছুটিছে মানব নিত্য উন্নতির পথে।"

মনে পড়ে এ যুগের স্বাদেশিকতা ও আধ্যাত্মিকতার যুগলবন্দী সাধনায় যিনি সিদ্ধিলাভ করলেন সেই শ্রীঅরবিন্দের বাণী। সাধক নবীনচন্দ্রের মূল্যায়ন এই উদ্ধৃতির কষ্টিপাথরেই হল। সাধনার গৌরবের প্রতিষ্ঠা উপলব্ধ সত্যের ভিত্তিতে। কাব্যে ও জীবনে অন্তরতম যিনি তাঁরই প্রকাশ বাসনা উপলব্ধি ও সৃষ্টিকর্মকে সফল করল।

"For man, the head of terrestrial Nature, the sole earthly frame in which her full evolution is possible, is a triple birth. He has been given a living frame in which the body is the vessel and life the dynamic means of a divine manifestation. His activity is centred in a progressive mind which aims at perfecting itself as well as the house in which it dwells and the means of life that it uses, and is capable of awaking by a progressive self-realisation to its own true nature as a form of Spirit. He culminates in what he always really was, the illumined

and beatific spirit which is intended at last to irradiate life and mind with its now concealed splendours."[1]

ভারতের চিরায়ত সাধনার উত্তরসাধক, নব মহাভারতের স্রষ্টা নবীনচন্দ্রের সাহিত্য ও সাধনা ইতিহাসে তাঁকে একটি বিশেষ স্থান দিয়েছে।

---

1. The Synthesis of Yoga, Chapter-III : Sri Aurobindo

প রি শি ষ্ট

নবীনচন্দ্রের রচনা-পরিচয়

নবীনচন্দ্রের নাটক রচনার প্রয়াস দেখা গেল 'নৈদাঘ নিশীথ স্বপ্ন' শেক্সপীয়রের "A Midsummer Night's Dream"-এর বঙ্গানুবাদে। নবীনচন্দ্র বাংলা দেশের পটভূমিকায় বাঙালী পাত্র-পাত্রীর মুখে শেক্সপীয়রের নাটকের সংলাপ বসিয়েছেন। যথাসাধ্য স্বদেশীয় পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা এখানে লক্ষণীয়। তথাপি অনুবাদের জড়তা কবি কাটিয়ে ওঠেন নি।

১৩০১ বঙ্গাব্দে 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় প্রথমে 'নৈদাঘ নিশীথ স্বপ্ন' প্রকাশিত হয়। এখানে পাঁচটি অঙ্কের মধ্যে তিনটি অঙ্ক নবীনচন্দ্রের রচিত। অবশিষ্টাংশ মোহিতগোপাল লাহিড়ী অনুবাদ করেন। ১৩১৭-১৯ বঙ্গাব্দে 'মানসী'তে নাটকটি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ হয় নি।

নবীনচন্দ্রের অন্য নাটিকাটির নাম 'শুভনির্মাল্য' পুত্রের বিবাহ-উপলক্ষে বিরচিত, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। উদ্দেশ্যমূলকতার মধ্যেও নাট্যরস সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়। শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর সম্পাদনায় নাটিকাটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

ক. নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনা

	গ্রন্থের নাম		প্রকাশকাল
১.	অবকাশরঞ্জিনী,	প্রথম ভাগ	১২৭৮ (১৮৭১)
	ঐ	ঐ দ্বিতীয় সংস্করণ	১২৮৪
	ঐ	ঐ তৃতীয় সংস্করণ	১২৯১

এই সংস্করণে পাঁচটি নূতন কবিতা সংযোজিত হয়।

২.	পলাশির যুদ্ধ	১২৮২ (১৮৭৫)

কবির জীবিতাবস্থায় দশটি, এ পর্যন্ত সতেরটিরও বেশি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। কবি দ্বিতীয় থেকে দশম সংস্করণ পর্যন্ত পরিবর্তন করে গেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত গ্রন্থে প্রথম সংস্করণের পাঠভেদ দেওয়া হয়েছে।

৩.	ভারত-উচ্ছ্বাস	১৮৭৫
৪.	ক্লিওপেট্রা	১২৮৪

গ্রন্থের নাম			প্রকাশকাল
৫. অবকাশরঞ্জিনী	২য় ভাগ		১২৮৪
ঐ	ঐ	দ্বিতীয় সংস্করণ	১২৯৫

পরে এই সংস্করণে ১১টি নূতন কবিতা সংযোজিত হয়েছে।

৬. রঙ্গমতী		১৮ই জুলাই	১৮৮০
৭. রৈবতক		২রা ফেব্রুআরি	১৮৮৭
৮. শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা		—	১৮৮৯
৯. মার্কণ্ডেয় চণ্ডী		১৩ই সেপ্টেম্বর	১৮৮৯
১০. খৃষ্ট		৪ঠা মার্চ	১৮৯১
১১. প্রবাসের পত্র		২৩শে নভেম্বর	১৮৯১
১২. কুরুক্ষেত্র		১৮ই জুলাই	১৮৯৩
১৩. অমিতাভ		৯ই অক্টোবর	১৮৯৫
১৪. প্রভাস		১৭ই ডিসেম্বর	১৮৯৬
১৫. শুভনির্মাল্য		২৭শে জানুআরি	১৯০০
১৬. ভানুমতী		২৫শে মার্চ	১৯০০
১৭. আমার জীবন : প্রথম ভাগ		১৩ই ফেব্রুআরি	১৯০৮
ঐ	দ্বিতীয় ভাগ	শ্রাবণ	১৩১৬
ঐ	তৃতীয় ভাগ	অগ্রহায়ণ	১৩১৭
ঐ	চতুর্থ ভাগ	চৈত্র	১৩১৮
ঐ	পঞ্চম ভাগ	আশ্বিন	১৩২০
১৮. অমৃতাভ		২৮শে ডিসেম্বর	১৯০৯

খ. নবীনচন্দ্রের অগ্রন্থভুক্ত রচনা

রচনার নাম	পত্রিকায় প্রকাশিত	প্রকাশকাল
নৈদাঘ নিশীথ স্বপ্ন	অনুসন্ধান	১৩০১
কর্ণেল অলকট (কবিতা)	নব্যভারত	১৩১৫ ফাল্গুন
হরিদ্বার (ভ্রমণ কাহিনী পত্র)	বঙ্গদর্শন	১৩১৬ আষাঢ়
নৈদাঘ নিশীথ স্বপ্ন	মানসী	১৩১৭-১৯
দুর্গোৎসব ষষ্ঠী (গান)	ভারতবর্ষ	১৩২১

রচনার নাম	পত্রিকায় প্রকাশিত	প্রকাশকাল
তুর্গোৎসব সপ্তমী (গান)	ভারতবর্ষ	১৩২১
মন বল আর কি ভাবনা (গান)	ঐ	১৩২৭
নবীনবাবুর বক্তৃতা, ফেণী জুবিলী বিত্মালয়ের ১৮৮৬ প্রথম বার্ষিক বিজ্ঞাপন	ঐ	১৩৪১

মহাকবি নবীনচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিক স্মৃতিতর্পণ চতুর্থ খণ্ড, প্রাচ্যবাণী প্রবন্ধাবলী, ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী-সম্পাদিত, কিছু তথ্য আছে।

পূর্বোক্ত রচনাগুলি ব্যতীত নবীনচন্দ্রের পত্রাবলী, বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষকে লিখিত কিছু পত্র অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত গিরিশচন্দ্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

শ্রীঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ভারতবর্ষে, কবি ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র ১৩৪৩ বঙ্গশ্রীতে, কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত তুটি পত্র সম্মিলন পত্রিকায়, কবি মানকুমারী বসুকে লিখিত পত্র 'বীরকুমার বধ' কাব্যের পরিশিষ্টে প্রকাশিত হয়েছে। প্রবাসের পত্র ব্যতীত আমার জীবন পাঁচ খণ্ডে কবি স্বরচিত পত্র কিছু উদ্ধৃত করেছেন।

নবীনচন্দ্রের কর্মজীবনের কালক্রম

স্থান	পদ	স্থায়ী পদে নিয়োগকাল	অস্থায়ী পদে নিয়োগকাল
	বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট	১৭ই জুলাই ১৮৬৮	
যশোহর	ডে. ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডে. কালেক্টর	—	২৪শে জুলাই ১৮৬৮
ঐ	ঐ (৭ম শ্রেণী)	১৭ মে ১৮৬৯	
শাহাবাদস্থ ভবুয়া	ঐ	৬ জুলাই ১৮৭০	—
চট্টগ্রাম	ঐ	৩ এপ্রিল ১৮৭১	—
ঐ	ঐ (৬ষ্ঠ শ্রেণী)	১১ জানুআরি ১৮৭৪	—
ঐ	কমিশনারের পার্সন্তাল অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট		১০ ফেব্রুআরি ১৮৭৬
ঐ	ঐ	১৩ আগষ্ট ১৮৭৬	

ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ১৫ জুন ১৮৭৭ হইতে ১৯ দিন।
সসপেণ্ডেড : ৪ জুলাই ১৮৭৭ হইতে ১ মাস ১৪ দিন।
ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ১৮ আগষ্ট ১৮৭৭ হইতে ৩ মাস ১ দিন।

পুরী	ডে. ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডে. কালেক্টর (৬ষ্ঠ শ্রেণী)	১৯ নভেম্বর ১৮৭৭	—

স্থান	পদ	স্থায়ী পদে নিয়োগকাল	অস্থায়ী পদে নিয়োগকাল
ফরিদপুরস্থ মাদারিপুর	ডে. ম্যাজিস্ট্রেট ও ডে. কালেক্টর (৬ষ্ঠ শ্রেণী)	২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮	—
পাটনাস্থ বেহার	ঐ (৭র্থ শ্রেণী)	২৫ সেপ্টেম্বব ১৮৮০	—
ঐ	ঐ (৫ম শ্রেণী)	১ আগষ্ট ১৮৮২	—
ভাগলপুর	ঐ (৫ম শ্রেণী)	২ নভেম্বর ১৮৮৩	—
নোয়াখালী	ঐ	৫ মে ১৮৮৪	
ফেণী, নোয়াখালী	ডে. ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডে. কালেক্টর (৫ম শ্রেণী)	২৫ নভেম্বর ১৮৮৪	—
ঐ	ঐ (৪র্থ শ্রেণী)	১৭ জানুয়ারী ১৮৮৮	—
চট্টগ্রাম	কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট	—	২৫ এপ্রিল ১৮৯১
নোয়াখালীস্থ ফেণী	ডে. ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডে. কালেক্টর	১ আগষ্ট ১৮৯১	—
ঐ	ঐ (৩য় শ্রেণী)	—	২৬ অক্টোবর ১৮৯১
ঐ	ঐ	১১ ডিসেম্বর ১৮৯২	—
নদীয়াস্থ রাণাঘাট	ডে. ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডে. কালেক্টর (৩য় শ্রেণী)	১০ মার্চ ১৮৯৩	—
ডায়মণ্ড হারবার, ২৪ পরগণা	ঐ (৩য় শ্রেণী)	২৯ এপ্রিল ১৮৯৫	—
আলিপুর	ঐ (৩য় শ্রেণী)	১৫ মে ১৮৯৫	—
ঐ	ঐ (২য় শ্রেণী)	—	৮ ডিসেম্বর ১৮৯৫
চট্টগ্রাম	কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট	২৫ জানুআরি ১৮৯৭	—
ঐ	ডে. ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডে. কালেক্টর (২য় শ্রেণী)	১৮ জুলাই ১৮৯৭	—
ময়মনসিংহ	ঐ ঐ	১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮	—
ত্রিপুরা	ঐ ঐ	৫ এপ্রিল ১৮৯৯	—
	ছুটি : ১২ মার্চ ১৯০২ হইতে ১১ মাস ২৬ দিন।		
ঐ	ডে. ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর (১ম শ্রেণী)	—	৬ জুলাই ১৯০৩
	অবসর গ্রহণ : ১ জুলাই ১৯০৩।		

নির্দেশিকা : ব্যক্তিনাম

নির্দেশিকা : সাহিত্য

নির্দেশিকা : ইংরেজী সাহিত্য

অশুদ্ধি সংশোধন

	আছে	হবে	পৃষ্ঠাঙ্ক
১.	গ্রন্থনাম 'নবীনচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য'	'নবীনচন্দ্র : সাহিত্য ও সাধনা'	১—১৬০
২.	'আদর্শে উ নব্যসমাজ দ্ধদ্ব নূতন'	'আদর্শে উদ্বুদ্ধ নব্যসমাজ নূতন'	২
৩.	'স্বামীজীর বাণী ও রচনা'	স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা	১,৫,১৫৭
৪.	'অবকাশরঞ্জিনী', দুই খণ্ডে 'পলাশির যুদ্ধ'	'অবকাশরঞ্জিনী দুই খণ্ড, পলাশির যুদ্ধ'	২১
৫.	"ভগ্নাংশ বিদেশী"	"ভগ্নাশবিদেশী"	২৬
৬.	St. Matnew	St. Mathew	৬০
৭.	গদ্যানুবাদ	পদ্যানুবাদ	৬৪
৮.	'শ্রীজাগৃতি ও জাতীয়তা'	জাগৃতি ও জাতীয়তা	৯০
৯.	'অমিতাভ'	'অমৃতাভ'	১০৪
১০.	ছন্দোপতন	ছন্দঃপতন	১১৫